ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

২ জুলাই ২০১২ □ ৩০ টাকা

কালের কষ্টিপাথর

বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

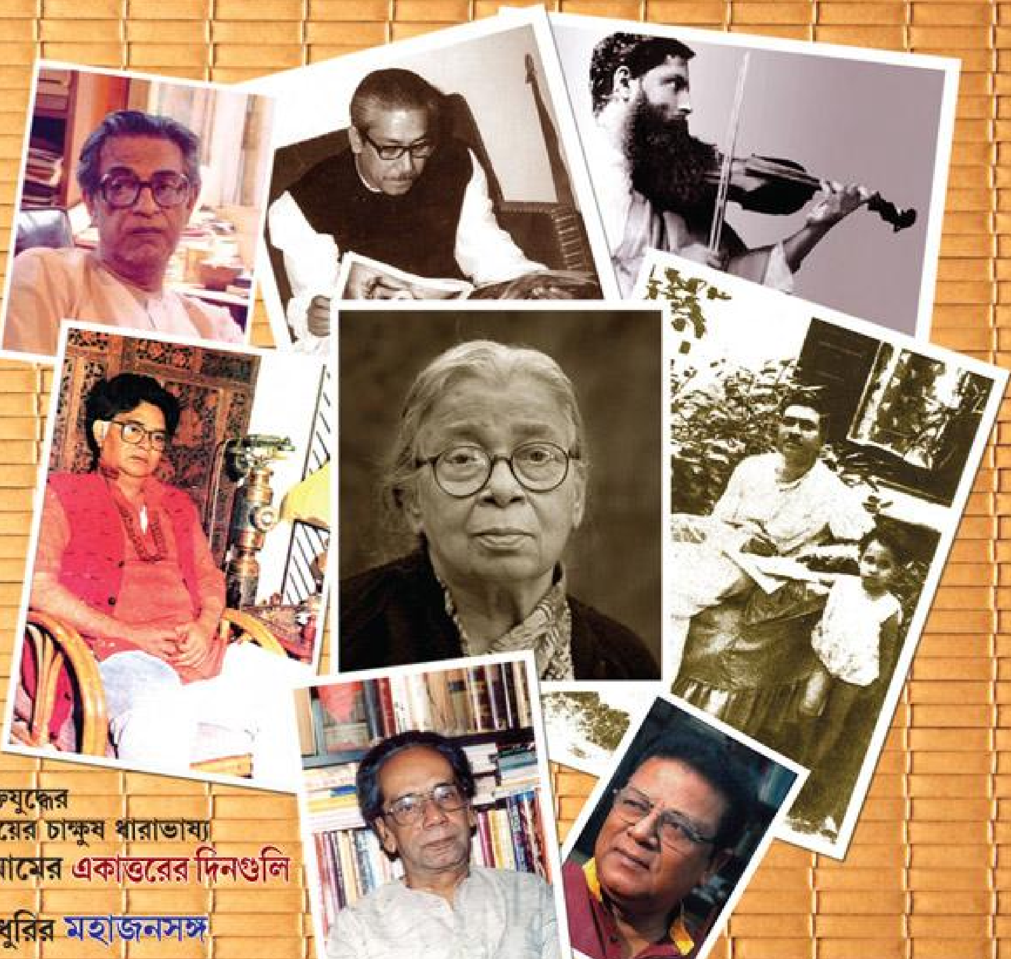

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের
আগুনঝরা সময়ের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য
জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি

অমিতাভ চৌধুরির মহাজনসঙ্গ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে
শক্তি-সন্দীপন প্রমুখ কবি-লেখকের চিঠি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের যে কথা বলা হয়নি

সাহিত্যের আড্ডায় বিভূতিভূষণ সবিতেন্দ্রনাথ রায়

সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

রমানাথ রায়ের স্বনির্বাচিত তিনটি গল্প

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ধারাবাহিক উপন্যাস বিষাদগাথা

চণ্ডী লাহিড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ

খোলা খাতা ● বই-ঠেক ● কবিতার কথা

এই সংখ্যার সঙ্গে
বিনামূল্যে বিতরিত
মহাশ্বেতা দেবীর গল্পপাঠ
ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
কবিতা পাঠের
একঘণ্টার ভিসিডি

৮ থেকে ৮০ বছরের ছোটদের জন্য

ছেলেবেলা

প্রতি মাসের ৬ তারিখে। ১০ টাকা

পুরো পত্রিকা জুড়েই লেখা ও ছবির মণিমাণিক্য

কাগজ–বিক্রেতার কাছে বা পত্রিকাস্টলে পাওয়া যায়

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
অনলাইনগ্রাহক হতে

ঘরে বসেও পাওয়া যায়

সাধারণ ডাকে পেতে হলে একবছরের ছেলেবেলা-র জন্য ১২০ টাকা ও ক্যুরিয়ারে পেতে হলে ২৪০ টাকা চেকে বা মানি অর্ডারে পাঠাতে হবে, এই নামে: **Swarnakshar Prakasani Private Limited**

এই ঠিকানায়: Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

মানি অর্ডার ফর্মের নীচে চিঠি লেখার জায়গায় কিংবা চেকের সঙ্গের চিঠিতে নিজের পুরো নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর অবশ্যই থাকা চাই।

Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: chhelebela@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ছেলেবেলা ইন্টারনেটেও পড়া যায় ► www.echhelebela.com

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

এই সংখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পপাঠ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাপাঠের ১ ঘণ্টার ভিডিও সিডি

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার বই ও পত্রিকার দোকান থেকে এই সংখ্যার কষ্টিপাথর কেনার সময় এই মূল্যবান ভিসিডি চেয়ে নিতে ভুলবেন না।

ক্যুরিয়ার খরচ ছাড়াই
ঘরে বসে নিয়মিত পেতে
অনলাইন গ্রাহক হোন:
www.swarnakshar.in

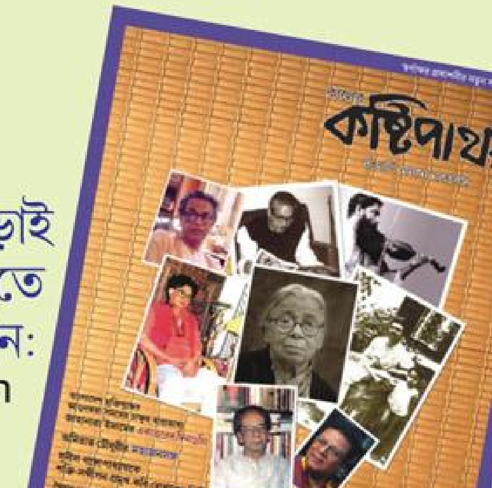

এক বছরের ২৪টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণ নিয়ে ব্যবসার সুযোগ
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: books@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রথম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। ২ জুলাই ২০১২। ১৭ আষাঢ় ১৪১৯

সূচিপত্র

মহাজনসঙ্গ ১৯ অমিতাভ চৌধুরি
মুজিবর রহমানের মুখোমুখি ■ সত্যজিতের সান্নিধ্যে

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ ২৯ সবিতেন্দ্রনাথ রায়
সাহিত্যের আড্ডায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কথা বলা হয়নি ১০ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সুনীলকে লেখা চিঠি ২৩
নীহাররঞ্জন রায় ■ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ■ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ■ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ■ মন্দাক্রান্তা সেন

সাময়িকপত্রে সেকালের লেখা ৪৮ বারিদবরণ ঘোষ
বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'

কাজের বাংলা ৭৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রকিশোর ৮১ প্রসাদরঞ্জন রায়

মেঘনাদবধ কাব্যের এক পাঠক ৫০

হা-হুতাশের ডায়েরি ৭ মৈত্রেয়ী নাগ

চণ্ডীমণ্ডপ ৯ চণ্ডী লাহিড়ী
উলোর বাঁদর

আমলাশাহি ৩৯ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
হ্যাঠা দো

হেঁয়ালির ছন্দ ৯১ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বনির্বাচিত তিনটি গল্প ৪১ রমানাথ রায়

মোঙ্গোলিয়ার কবিতা ৫১ অনুবাদ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কবিতার কথা ৫৫
কবিতা পরিচয়: গোধূলিসন্ধির নৃত্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ■ নরেশ গুহ ■ অরুণকুমার সরকার

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি ১৩ জাহানারা ইমাম

গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি ৩৩ সমরেশ মজুমদার

বিষাদগাথা ৫৯ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ভ্র ম ণ

চেঙ্গিস খানের দেশে ৯৪ প্রতাপকুমার রায়

নি য় মি ত

সম্পাদকীয় ৫। ক্ষণের বচন ১২। শব্দবক্র ১২।
পৃথিবীর প্রতিকৃতি ৫২। বই ও পত্রিকা প্রাপ্তিস্বীকার ৫৪।
খোলা খাতা ৬৮।
শমীক ঘোষ ■ উদয়ন ঘোষ ■ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী ■ পার্থপ্রতিম মণ্ডল
কণিষ্ক ভট্টাচার্য ■ চন্দ্রাণী ঘোষ ■ অরুণ চক্রবর্তী ■ সুরজিৎ ঘোষ ■ অমর মিত্র
■ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

বই পড়া ৭৭। সংস্কৃতিমঞ্চ ৮৭। পুরনো অ্যালবাম ৮৯।

প্রচ্ছদ : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় বিভাস চক্রবর্তীর 'আমাদের নাট্যচর্চা' ও 'সংবাদপত্রে একালের কথা' প্রকাশিত হল না।

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Published for Swarnakshar Prakashani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

‘একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি ‘কর্মক্ষেত্র’-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।’

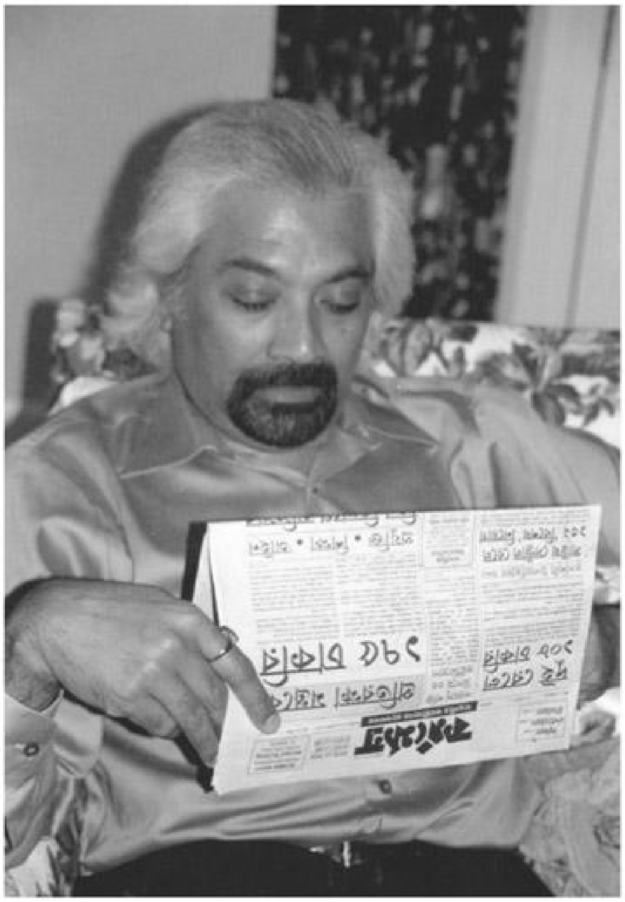

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, অঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ‘রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল’ কর্মসূচির উপদেষ্টা।

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে ‘কর্মক্ষেত্র’-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

উৎসর্গ

মহাশ্বেতা দেবীকে

কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে ইতিমধ্যেই আপনি সাহিত্যানুরাগী বাঙালির নিত্যপাঠ্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।
এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' আপনাকে উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

স ম্পা দ কী য়

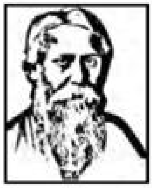

আমাদের যুগ
ক্রমেই ইতর হইয়া
আসিতেছে

অদ্ভুত আঁধার
এক এসেছে এ
পৃথিবীতে আজ

ভিন্ন প্রসঙ্গে বহুকাল আগে বলা হলেও রবীন্দ্রনাথের এই কথা এখন সারা দেশেই আরও বেশি করে সত্যি হয়ে উঠছে দেখে বিষণ্ন বোধ হয়। আবার, রবীন্দ্রোত্তর মহাকবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই প্রথম পংক্তিটি দশকের পর দশক ভারতের প্রায় যেন এক স্থায়ী দীর্ঘশ্বাস!

আমাদের অতীতের সুখ-দুঃখ, বিষাদ-বৈভব, আর আমাদের ভবিষ্যতের আশা-নিরাশা, সংগ্রাম-স্বপ্ন, আর এই দুই কালের মাঝখানে আমাদের যা চিরমধ্যক্ষণ, তার ধ্যান-ধারণা, বিচার-বিশ্লেষণ— এইসব কিছুর মধ্যেই আমাদের শিকড়, এইসব কিছুর দিকেই আমাদের বিস্তার।
মানুষের জীবন চিরকালই এক দীর্ঘ দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাত্রা, অধরা সুসময়ের উদ্দেশে। কালের সেই আলেখ্যও আমাদের আগ্রহের বিষয়।
চারদিকের অবিরাম আলোকবাজি, অট্টহাসি, উন্নয়নের বিপুল জাঁকজমক, বিজ্ঞাপনের বর্ণাঢ্য আলেয়া ফুঁড়ে-ওঠা মানবজীবনের মর্মস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস আমাদের ভাষায় কোথায় কীভাবে ছায়া ফেলছে, ফেলছে কিনা, হয়তো তা-ও ভাববার বিষয়। তাছাড়া, আমাদের কূপমণ্ডুকতার ধারাবাহিক আনন্দ ও অভ্যাস নিয়ে আত্মসমালোচনারও প্রয়োজন।
আমাদের নতুন পত্রিকা এইসব কিছুতেই জড়ানো। এইসব কিছু থেকেই সে তার নিজের গড়ন পাক।
'কালের কষ্টিপাথর' একদিকে গতকাল, সমকাল ও আগামীকালের মধ্যে এক সঞ্জীবনী সেতুবন্ধনের চেষ্টা, অন্যদিকে আমাদের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দিকে শ্রদ্ধা ও সংশয় নিয়ে তাকানো।
সেদিক থেকে 'কালের কষ্টিপাথর' আরও একটা নতুন পত্রিকা মাত্র নয়, অবশ্যম্ভাবী একটা নতুন পত্রিকা। শুধু দুই বাংলার নয়, বিশ্বজোড়া বাঙালিমনের এক নতুন মিলনমেলা। বঙ্গপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মেলনেই এর সার্থকতা।

মহাশ্বেতা দেবীর ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

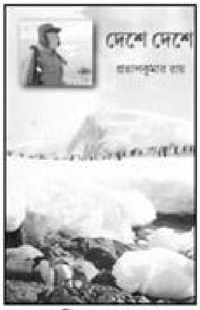

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

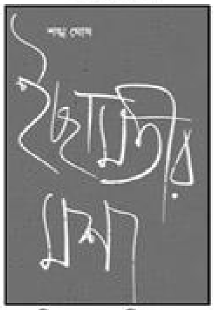

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

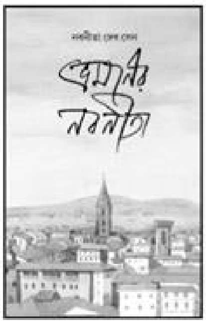

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
₹১৫০

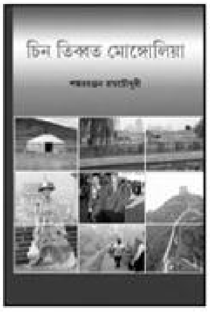

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

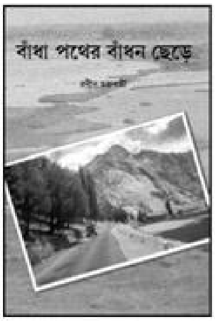

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

প্রাপ্তিস্থান: দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

হা-হুতাশের ডায়েরি

মৈত্রেয়ী নাগ

ভিড়ের মধ্যে হাঁটছি, হঠাৎ একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী, আপনি কোন দলে, রক্তচোষা না ভক্তপোষা?'

'মানে!?'

'মানে আপনি মেজরিটি না মাইনরিটি?'

'কোনওটাই না, আমার কোনও দল নেই।'

আমার কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে সে বলে ওঠে, 'আলবাৎ আছে। আপনি হলেন গিয়ে থার্ড পার্টি, অর্থাৎ কিনা শক্তখোসা!'

তারপর হাত নেড়ে ছড়া কেটে সে বলতে থাকে:

শক্তখোসা নরমমাস
কেবল খোঁজে সুবাতাস

আমি আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, এমন সময় আরেকজনের টিপ্পনি: আর কাজের মধ্যে হা-হুতাশ...

শেষ কথাটা আমার মনে ধরল। হা-হুতাশ করতে আমি খুব পারি, অনায়াসেই। অনেক উদাহরণ আছে—

হা-হুতাশ ১

একবার একটা ভয়ানক একঘেয়ে 'মিটিং'-এ জোর করে মন বসাতে গিয়ে বক্তার ওপর তো বটেই, নিজের ওপর, আমাদের এই সময়ের ওপর, তারপর গোটা জগৎসংসারের ওপর এমন বিতৃষ্ণা হল যে, নোট নেবার ভান করে কলম চালাতে লাগলাম। শেষমেশ যা দাঁড়াল, তাকে হা-হুতাশ ছাড়া আর কী বলা যায়?

রাতের স্বপ্ন দিনে নেই
উৎসবে আশ্বিনে নেই
ধুলো মাখার সিনে নেই
এই কি তোমার মানুষ?

জোড় হাতে আজ ভরসা কই
মেঘের কালোয় বর্ষা কই
ভোরের আকাশ ফর্সা কই
শুধোক লোকে, জানুক।

সন্ধানী চোখ খুঁজতে চায়
উৎসাহী মন বুঝতে চায়
বিদ্রোহী প্রাণ যুঝতে চায়
কে চায় রঙের ফানুস?

তাই তো বলি, তাকাস না
মাথার ওপর আকাশ না?
খামোখা জট পাকাস না
সময় বদল আনুক।

হা-হুতাশ ২

আরেকদিন, একটা সুন্দর দুপুরে বাগানে বসে আছি। জলের ধারের একদিকের বেঞ্চিতে আমি, আর অন্যধারে গাছতলায় শুকনো পাতার মধ্যে বসে এক শিল্পী রং তুলি দিয়ে প্রকৃতির ছবি আঁকছেন। একটু পরে রোদ কমে আসায় উনি উঠে পড়লেন, আর জলে গোলা রংগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘাসের ওপর। রাসায়নিক বর্জ্য যত্রতত্র ছড়িয়ে দেওয়া, তবে কোনও গুণ্ডা বদমাসের কাজ নয়! মনটা খারাপ হয়ে গেল। হলই যখন, হা-হুতাশ না করব কেন?

শুকনো ঝরা পাতা, তাদেরও নিশ্বাস?
তাও আবার দুনিয়ার দশা দেখে?
নিজেরই কানে শোনা, তবুও বিশ্বাস,
মনেরই ভুল টানা বসা থেকে।
বিকেল বয়ে গেল, এবারে ফেরা যাক
এখনও জলেতে কত রশ্মি!
গুলে ফেলা রংগুলো ঘাসেই মেলা থাক
ফের শুনি: হা হতোস্মি!
মরা পাতা, ঝরা পাতা, এত কী তোদের কথা?
পারবি ফিরিয়ে দিতে সে সবুজ?
গাছেদের লাগে ব্যথা, পাতাদের কথকতা
মন কেন হতে পেল না অবুঝ?

হা-হুতাশ ৩

আমার কর্মক্ষেত্রে পৌঁছতে তখন লম্বা বাসজার্নি করতে হত। অর্থাৎ নানা বাজে

বিষয়ে চিন্তা করার এক অপর্যাপ্ত সুযোগ। একদিন পরাধীন ভারতের দুঃখের কথা, সে সময়কার মানুষদের স্বাধীনতার স্বপ্নের কথা, তাদের সেই স্বপ্নের দেশের সঙ্গে আজকের ভারতবর্ষের বিবিধ ব্যবধানের কথা ভাবতে ভাবতে এমনই হাহাকার করতে ইচ্ছে হল যে, চলন্ত বাসে বসেই সেরে ফেললাম হা-হুতাশটা।

(তখন) বাগানে বড় বড় গাছ ছিল
পুকুরে ছোট বড় মাছ ছিল
দেশটা পরাধীন
তবুও বুড়ো দীন
নরেশের দিন কেটে যাচ্ছিল
(এখন) বাগানটা হয়ে গেল হাতছাড়া
পুকুরে যায় না যাওয়া রাত ছাড়া
দেশটা স্বাধীন বটে
তবু নরেশের ঘটে
কেন যে কিচ্ছু নেই জাত ছাড়া!

মাঝেমধ্যেই যখন দেখি
মেয়েদের কাজের জগতের সঙ্গে
তাল রাখতে গিয়ে বেঘোরে
প্রাণ দিতে হচ্ছে, তখন আমার মতো
থার্ডপার্টির কী-ই বা করার থাকে?

হা-হুতাশ ৪

আর রাস্তায় যেতে যেতে নিত্যকার হা-হুতাশ তো আছেই:

ওরা নাচে ওরা গায়
হাত পেতে টাকা চায়
ধুলোমাখা খুদেগুলো
সেই ফের পা-টা ছুঁলো
ওরা নাচে ওরা গায়
হাসে, ডিগবাজি খায়
বারে বারে একই খেলা
রোজ দুই তিন বেলা

ছোট হাত ভরে কমে
বড়রা কি তাতে দমে?
টাকা চায় তাড়া খায়
দিন রাত রাস্তায়

কী হবে এদের পরে?
ভাবতেও ভয় করে।

হা-হুতাশ ৫

খবরের কাগজের প্রসঙ্গ আমি সচরাচর ডায়েরিতে টেনে আনি না। কিন্তু মাঝেমধ্যেই যখন দেখি দেশের নানা শহরে নানা পেশার কমবয়সি মেয়েদের রাতকে দিন করা কাজের জগতের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে হচ্ছে, তখন আমার মতো মধ্যবয়স্ক থার্ডপার্টির আর কী-ই বা করার থাকে? শক্তখোসা নরমমাস, কাজের মধ্যে হা-হুতাশ...

তখন উপায় ছিল,
অনেক সময় ছিল হাতে
তখন সন্ধে হলে কর্মকোলাহল জাগত না

তখন তফাৎ ছিল,
কাছ, দূর, দিনে আর রাতে
সকালে পথের ধারে নিথর কর্মী পড়ে
থাকত না

এখনও আইন আছে,
সবটাই সকলের জন্য না
জাগা শহরের বুকে জোর করে প্রাণ কাড়া
এখনের চোখে আর বন্য না।

ছবি: কনিষ্ক দাশগুপ্ত

উলোর বাঁদর

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

আমাদের নদীয়া জেলার একটি ছড়া ছিল। গ্রামে গ্রামে রেষারেষি নিয়ে সেই ছড়া। শান্তিপুরের চোপা, গুপ্তিপাড়ার খোঁপা; —ত্যাঁদোর, উলোর বাঁদর। ত্যাঁদোর শব্দটির অর্থ প্যাঁচালো বুদ্ধির মানুষ। যাকে দেখতে পারি না, সহ্য করতে পারি না, সেই ব্যক্তির গ্রামের নাম বসিয়ে ত্যাঁদোর বলা হত। উলো গ্রামটি এখন বীরনগর হয়ে কৃষ্ণনগর লাইনে দাঁড়িয়ে।

এই উলোর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানের এক ডাকাত জমিদারের মেয়ের সঙ্গে। উলোর জমিদার মিত্র মুস্তাফি পরিবার বৈষ্ণব। যুদ্ধ, খুনখারাপি এসব পছন্দ করতেন না। বৈষ্ণব ভজন ও পূজন তাদের নিত্যকর্ম। ডাকাত শ্বশুর জামাইকে বলতেন— এত ভীতু কেন? বাঁদর নাকি? উলোর ছেলেদের নিন্দে রটে গেল ভীতু বলে। তাদের আর বিয়ে হয় না। ডাকাত-তাড়ানো এবং ডাকাতি করা দুটোই ছিল ভালো পাত্রের কোয়ালিফিকেশন।

একবার উলোর ছেলেরা সত্যিই ডাকাত ধরল এবং পিছমোড়া করে বেঁধে নদীয়ার মহারাজার কাছে নিয়ে গেল।

—কী চাও তোমরা? খুব বীরের মতো কাজ করেছ। মহারাজা বললেন।

—আমার ভীতু বলে দুর্নাম। আড়ালে সবাই উলোর বাঁদর বলে।

নদীয়ার মহারাজা তখনই ঘোষণা করলেন— গ্রামের নাম উলো থাকবে না। গ্রামের নাম হবে বীরনগর।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মোগলরা ভারত শাসন করেননি

—১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ এই ৩৩০ বছর ভারতশাসন করেছেন কারা?

ক্যুইজমাস্টার মিটিমিটি হেসে এই প্রশ্ন করতেই ঝটপট জবাব দিলাম— আবার কারা? মোগলরা।

—ভুল! ভুল! বিলকুল ভুল! ভারতশাসন করেছেন বর্তমান উজবেকিস্তান থেকে আগত বরলাসরা। অবাক হয়ে বললাম— বলেন কী

মশাই? সারা বিশ্বের ইতিহাসে বাবর থেকে বাহাদুরশাহ জাফর পর্যন্ত সব বাদশাহকে মোগল বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন— 'শকহুনদল পাঠানমোগল'—

ক্যুইজমাস্টার হা হা হেসে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পাগলা মেহের আলির মতো বললেন— সব ঝুট হ্যায়! ভুলটা করেছেন ঐতিহাসিকরা। ওই বাদশাহরা কি নিজেদের কখনও 'মোগল' বলেছেন? বাবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর (তাইমুর) -এর কথাই ধরুন। তাঁরও আত্মচরিত আছে। তিনি ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গোল চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র চাগতাই খানের পরবর্তী ষষ্ঠতম পুরুষ তোগলোক-তাইমুর খানের অধীনে নিতান্ত এক খুদে শাসক (আমির) ছিলেন। এই আমির অর্থাৎ খোঁড়া তাইমুরের পদবি ছিল মির্জা। ইনি, 'বরলাস'-গোষ্ঠীর তুর্কি। মোঙ্গোলবংশীয় জনৈক কাজান খানের বিধবা কন্যাকে তিনি বিয়ে করেন। তখন তাঁকে লোকে আদর করে বলত, 'কুরকান (Qurkan)। জামাইবাবু আর কী! ফারসি ভাষায় মোঙ্গোলকে বলা হত মোগল এবং তুর্কিতে মোগোল। ফারসিতে কুরকান হল গুরগান।

বাধা দিয়ে বললাম— দেখুন মশাই, ইতিহাস শুনলে কান কটকট করে।

—তা করলে তো চলবে না। ভুল ইতিহাস চাপা দিয়ে সত্যিকারটা খুঁড়ে তোলাই তো বুদ্ধিমান মানুষের বড় কাজ। মোঙ্গোলদের জামাই হয়েও তাইমুর নিজেকে মাতৃভাষায় মোগোল বা ফারসি জানলেও মোগল (রোমকে Moghul) বলেননি। পরে বিশ্বজয়ী, লুঠেরা এবং নির্মম হন্তারক হয়েও তিনি মির্জা তাইমুর থেকে খান। শেষাবধি কিন্তু বর্তমান উজবেকিস্তানের একটুখানি অঞ্চল ফরগনা ছাড়া তাঁর বংশধর মির্জা শেখ উমরের অধীনে আর কিছু ছিল না। এই উমরই বাবরের বাবা।

উইগুর ছিল চেঙ্গিস খানের মাতৃভাষা

—কী অবাক কাণ্ড!

—হ্যাঁ, সুকুমার রায়ের অবাক জলপানের মতো। তবে আবার ইতিহাসের প্যাঁচটা দেখুন! মোঙ্গোল চেঙ্গিস খান (আদি নাম তেমুজিন)-এর দ্বিতীয় পুত্র চাগতাই খানের পরবর্তী একাদশতম পুরুষ ইউনাস খানের কন্যা কুতলক-নিগার খানিম-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বাবর-জনক মির্জা শেখ উমরের। উমরও কিন্তু নিজেকে মাতৃভাষায় মোগোল বা ফারসিতে 'মোগল' বলেননি। বলা দরকার, চেঙ্গিস-নন্দন চাগতাই খান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

—তা হলেও তো বাবরের শরীরে মোঙ্গোল চেঙ্গিস খানের রক্ত আছে।

—থাক না। বংশপরিচয় দিতে এ যাবৎকালের রীতি পুরুষ-পরম্পরায় মান্য করা হয়। মির্জা উমর শেখের পুত্রের নাম ছিল মির্জা জাহির-উদ-দিন মুহাম্মদ বাবর (রোমকে Babur)। বাবর মানে, বাঘ। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বাবর ভারত জয় করেন, তখন নিজের নাম ঘোষণা করেন, 'গাজি বাদশাহ জাহির-উদ-দিন মুহাম্মদ বাবর। তাঁর আত্মচরিত 'বাবরনামা'-তে এই পরিচয়ই আছে। মোঙ্গোল/ মোগোল/মোগলদের পদবি অবশ্য-অবশ্য 'খান'। মোঙ্গলীয়দের ভাষা উইগুর (UIGHUR)-এ 'খান' মানে, নেতা/শাসক/রাজা /সম্রাট ইত্যাদি। এই উইগুর ছিল চেঙ্গিস খানের মাতৃভাষা। খ্রিস্টীয় ষোলো-সতেরো শতকে 'খান' পদবিধারীরা ছিলেন মোঙ্গোল বংশধর। লক্ষ করবেন, বাবর-হুমায়ুন-আকবর-জাহাঙ্গির (জাহানগির)-আউরঙ্গজেব থেকে ১৮৫৭-র বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত কেউ নিজেদের মোঙ্গোল মোগোল বা মোগল বলে আত্মপরিচয় দেননি এবং এঁদের কেউই 'খান' পদবি গ্রহণ করেননি। তবে তাঁদের মতো চাগতাই-বংশধররা এদেশে এসে কেউ কেউ নামের শেষে 'খান' বাদ দিয়ে শুধু 'চাগতাই' শব্দটি পদবি হিসেবে নিয়েছেন। ভারতে বাবর-বংশধরদের শাসনকালকে বলা উচিত ছিল 'বরলাস শাসনকাল'। মধ্য এশিয়ার যাযাবর একটি তুর্কি ট্রাইবের নেতা ছিলেন বরলাস (Barlas)! বাবর তাঁরই বংশধর। আর ভারতে যেসব চাগতাই পদাধিকারী এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আধুনিক যুগে (বিগত শতকের তিরিশ-চল্লিশ দশকে) দুজন চাগতাই সুপরিচিত। চিত্রশিল্পী আবদুর রহমান চাগতাই এবং মহিলা সাহিত্যিক ইসমাত চাগতাই। চিত্রশিল্পী চাগতাইয়ের ছবি বাল্যে বাংলার সেরা পত্রিকায় দেখেছি। ইসমাত লিখতেন উর্দুতে। উর্দু তুর্কি শব্দ। অর্থ সেনাশিবির।

তাঁর কথারবে চালু হয়েছিল। তাঁর বংশধররা সবাই খান-ধারী।

কুইজমাস্টার ফিক করে হেসে বললেন— শুধু খান নন, কেউ-কেউ হয়েছিলেন খান-খানান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ খান। স্বয়ং বাবর সকৌতুকে এ খবর দিয়েছেন। তারপর খানপদবি

বাবর মাতৃভাষা তুর্কিতে আত্মজীবনী লেখেন

ক্রমেক্রমে খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

—বাহ্। খানখান মানে তো বাংলা বাগধারায় কোনও জিনিস ভেঙে টুকরো-টুকরো হওয়া!

আবার তাঁর অট্টহাসি। তিনি বললেন— খান শব্দটা থেকে ফারসি, উর্দু-বাংলায় অসংখ্য শব্দ গড়ে উঠেছে। খানদান (অভিজাত), খানা (স্থান অর্থে), খানসামা (ভৃত্য)— এই থাক। তারপর দেখুন, ইংরেজ আমলে চাটুকার ধনী মুসলিমকে খান-বাহাদুর পদবি দেওয়া হত। বাহাদুর কিন্তু তুর্কি শব্দ। অর্থ হল, বীর।

বললাম— বাংলার গ্রামাঞ্চলেও খানপদবিধারীর সংখ্যা প্রচুর। তা হলে তো ধরে নিতেই হয়, এঁরা সবাই চেঙ্গিস (ফারসিতে জিঙ্গিজ) খানের বংশধর। আমাকে বলতে দিন এবার। অবিভক্ত ভারতের সারা পশ্চিম অঞ্চল থেকে আফগানিস্তান, এমনকি সাবেক বৃহত্তর পারস্য অবধি শুধু খান আর খান। আমরা যাঁদের কাবুলিওলা বলি—

থামিয়ে দিয়ে ক্যুইজমাস্টার বললেন— ওইসব 'খান' চেঙ্গিসি খান নন। দেখুন, আমরা যাঁদের কাবুলিওলা বলি, তাঁরা কেউ আফগানিস্তানের মানুষ নন। এঁরা পশতুভাষী। নিজেদের বলেন পাখতান বা পাশতান। এই শব্দটারই বিকৃতি পাঠান (ইংরেজরা Pathan বলতেন)। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে খান পদবিধারী।

—ব্যাপারটা রহস্যময় লাগছে। এত 'খান' কেন?

—চেঙ্গিস খানের খান পদবিটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের নামের ডগায় বসানোর হুজুগ। মোঙ্গোলগন্ধটা মুছে দিয়ে স্রেফ খানটুকু নিয়ে আত্মগরিমা প্রকাশ। বাবরের আত্মজীবনীতে দেখবেন, কতবার তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। আবার কতবার তাঁর সেনা বাহিনীতে মোগলদের নিয়েছেন। ভাবুন সায়বানি খানের কথা। ইনি ছিলেন যথার্থ মোঙ্গোল। চেঙ্গিস খানের বংশধর। বাবরকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ফরগনা থেকে। বাবর সপরিবার এবং কয়েকজন অনুচর নিয়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ে-কন্দরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অবশেষে নিজের বোন খানজাদা বেগমকে দূত-সহ সায়বানির কাছে পাঠান। কারণ সায়বানির শর্ত ছিল, বাবরের ওই বোনকে তিনি বিয়ে করতে চান। পরে পারস্যের শিয়া সাফাবিসম্রাট ইসমাইলের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন বাবর। ইসমাইলবাহিনী সায়বানিকে হত্যা করে। বিধবা খানজাদা বেগম ফিরে এসে বাবরের কাছে আশ্রয় নেন। তারপর—

এবার না বলে পারলাম না।— ওহ! মাথা বনবন করে ঘুরছে। মগজ খানখান। আর ইতিহাস নয়।

ক্যুইজমাস্টার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললেন— সেরা মজার কথাটা শুনে যান। পাহাড়ে-কন্দরে ঘুরে বেড়ানোর সময় একদিন একা ছদ্মবেশে বাবর এক আফগান সর্দারের বাড়িতে নাচ-গানের উৎসবে ঢুকে পড়েন। নাচ-গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। সেই আফগান সর্দারের একমাত্র কন্যা মুবারিকা বাবরের প্রেমে পড়েন। তাঁর জেদে সর্দার মেয়ের সঙ্গে বাবরের বিয়ে দেন। পরে তাঁর পরিচয় পেয়ে— সে অনেক কথা। আসল কথাটা বলি।

শ্বাস ছেড়ে বললাম— বলুন!

—বাবরের মৃত্যু হয়েছিল আগ্রা (আগ্‌রা)-তে। হুমায়ুনের মা অর্থাৎ বাবরের প্রথম স্ত্রী মাহিম বেগম বাবরের সমাধির ব্যবস্থা করেন। এখন যেখানে তাজমহল আছে, তার পূর্বে, যমুনানদীর পূর্বপারে বাবরেরই তৈরি সুরম্য উদ্যানে। সমাধির পর চল্লিশ দিন ধরে ইসলামি রীতিতে চল্লিশজন কারি (Qari) অর্থাৎ যাঁরা সুললিত কণ্ঠে কুর'আন গ্রন্থ উচ্চারণ করতে পারেন এবং হাফিজ (কুর'আন যাঁদের মুখস্থ)-কে কুর'আনপাঠে নিযুক্ত করেন মাহিম বেগম। তারপর শরিয়তি রীতি মেনে নির্জন কবর ছেড়ে সবাই চলে যান। ওদিকে নিঃসন্তান আফগান স্ত্রী মুবারিকাকে নাকি বাবর কবে বলেছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁর প্রিয়তম শহর কাবুলে তাঁর কবর হয়। মুবারিকা এক রাত্রে গোপনে আফগান অনুচরদের সাহায্যে সেই কবর থেকে বাবরের কফিনে ভরা মৃতদেহ তুলে নিয়ে কাবুলে চলে যান। সেখানেই বাবরের কবর এখনও আছে। ছবি দেখাতে পারি।

ব্যাপারটা রহস্যজনক এবং মজারও বটে। বললাম— শেষ কথাটা জানতে চাই। আপনি বলছেন মোগল। কিন্তু ইংরেজিতে সর্বত্র রোমক লিপিতে লেখা হয় Mughal এবং বাংলায় মুঘল!

হা হা হেসে ক্যুইজমাস্টার বললেন— বাবর তাঁর মাতৃভাষা তুর্কিতে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। কিন্তু লেখার হরফ আরবি ভাষায়। আরবিতে ডানদিক থেকে লেখার নিয়ম। আমি বাঁদিক থেকে বর্ণগুলি সাজিয়ে লিখছি।

'ম' ধ্বনির জন্য মিমবর্ণ, তারপর মোটা কমা-র গড়ন উয়াউ বর্ণ, যার উচ্চারণ 'u/w/O', পরের বর্ণ গাইন, যার উচ্চারণ গভীর কণ্ঠ্যবর্ণ 'গ' (Deep Gutteral) অর্থাৎ সাধারণ গ নয় — যা বোঝানোর জন্য Gh লেখা হয় এবং শেষ বর্ণটি 'লাম', যার ধ্বনি 'ল'। এখানেই সায়েবদের ভুল হয়। শ্রীমতী অ্যানেট সুসান বিভারেজ তুর্কি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করে 'বাবরনামা' (ফার্সি শব্দ নামাহ্) নাম দিয়ে তুর্কি 'মোগোল'-কে 'Mughul' করে ফেলেছেন। অন্যেরা অন্য বই দেখে অনুবাদে Mughal লেখেন। আসলে ফার্সিতে শব্দটি মিম + উয়াউ + গাইন + লাম (ফার্সি আরবি লিপিতে লেখা হয়। তাই স্বরবর্ণ কম): ম + ও + গ + ল = মোগল। যাঁরা gh দেখেই 'ঘ' লেখেন এবং পড়েন, তাঁরা আরবি বর্ণমালার উচ্চারণ সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুনই এমনটি করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শকহুনদল পাঠানমোগল' এ দেশের সুপ্রচলিত শব্দাবলি। চিন্তা করুন, ভারতে প্রায় আটশো বছর ধরে দরবারি অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। ১৮৩০ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার উচ্ছেদ করে। তাই ফারসি 'মোগল' আমাদের মজ্জাগত ছিল। কোনও কোনও বঙ্গীয় পণ্ডিত ইংরেজিতে Mughal/Moghul দেখে মুঘল/

মোঘল লেখেন। এটা হাস্যকর বলতেই হবে। 'মাছিমারা কেরানি'-র দশা। কিন্তু দেখুন, Ghalib-কে ঠিকই গালিব, Ghani-কে ঠিকই গনি, Afghanistan-কে দিব্যি আফগানিস্তান, Gharib-কে গরিব লিখতে হয়।

লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললাম— তাহলে মোঙ্গোল থেকে তুর্কিতে মোগোল এবং ফার্সিতে মোগল!

ক্যুইজমাস্টার তুম্বোমুখে বললেন— সহি বাত! খাঁটি কথা। চেঙ্গিস খানের পিণ্ডি চটকে দিয়ে— যতঃসব ... তো প্রসঙ্গত বলছি। এই পত্রিকার সম্পাদক মশাই চেঙ্গিস খানের দেশ ঘুরে এসেছেন এবং তিনি ঠিকই লেখেন 'মোঙ্গোলিয়া' (Mongolia)।

ক্ষণের বচন

১
শব্দ যদি মিথ্যাভাষী
তাজা ফুলও হয় বাসি

২
ফুলের ঘনিষ্ঠ হলে
শিশুর ঘনিষ্ঠ হলে
রক্ত ধুয়ে বর্ষা নামবে দেশে
মানুষ বাঁচবে শুধু পাখি ও মানুষ ভালোবেসে

৩
যদি বন্ধ হয় কভু রাজকোষে স্বহস্তে রাহাজানি,
ত্বরান্বিত হয় সব ন্যায়ালয়ে দুঃখের শুনানি—
জীবন প্রগতি পাবে খরস্রোত মহাবলী জলে,
প্রাণ জাগবে মরা মূলে, পড়ন্ত বল্কলে।

৪
দায়িত্ব যখনই হয় দম্ভের বিষয়
সে-দায়িত্ব হয়ে ওঠে ভারি বিষময়
ক্ষমাপ্রার্থনা যদি ক্ষমতা প্রকাশ
লাঞ্ছিতজনেরও জেনো জ্বলে হাড়মাস

৫
রাজার পতন যদি প্রজার কল্যাণ
যত দেরি হবে তত হবে রক্তস্নান

—ক্ষণকথক

শব্দবক্র

অজগরাস্তা

বিশেষ্য; অজগর সাপের মতো হিলহিলে লম্বা রাস্তা, যেখানে পথচারীদের হাঁটার কোনও প্রশ্নই ওঠে না > রামবাবুর নতুন বাসাটি খাসা, একটি *অজগরাস্তার* গা ঘেঁষে। তবু তিনি খুশি নন, জগ করার জন্য রোজ সকালে তাঁকে কাঁচা রাস্তা মাড়িয়ে পাড়ার পার্কে যেতে হয়।

আপত্তিস্নেহ

বিশেষ্য; যে দুর্বার স্নেহের বশে কোনও প্রতিভাধর শিল্পব্যক্তিত্ব নিজের সারা জীবনের কর্মভাণ্ডারটি অযোগ্য সন্তানের হাতে সঁপে দিয়ে যান > ভাবতে অবাক লাগে, অত বড় শিল্পী হয়ে এই মূর্খের হাতে সব তুলে দিলেন। হলই বা নিজের ছেলে, *আপত্তিস্নেহের* ব্যাপারে দেশে একটা আইন থাকবে না?

কস্টালজিয়া

বিশেষ্য; ছোটবেলায় জিনিসপত্রের দাম কত কম ছিল, মুদ্রাস্ফীতিজনিত আয়বৃদ্ধির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাই নিয়ে হা-হুতাশ করা > আট টাকা চালের মণ, চার টাকা মাংসের কেজি, টাকায় কুড়িটা ফুচকা খেতুম, পঁচিশ টাকার রেশমি শাড়ি পড়তুম, এ অকারণ *কস্টালজিয়া* এখন বন্ধ করো তো!

কচটতপটু

বিশেষণ; যাঁর বাক্যগুলি প্রায়শই আদ্যক্ষর অধ্যুষিত হয়ে থাকে >
—আমি বাপু অত *কচটতপটু* নই, কী যে লিখেছে কিছুই বুঝলুম না।
—আরে এ তো বোঝাই যাচ্ছে, এইচ আর থেকে লিখেছে যে আই টি-সংক্রান্ত কাগজপত্তর সব ডি টি পি করে এইচ ও ডি-কে পাঠাতে হবে আর সি সি করতে হবে সি এফ ও-কে। নীচে পি এস দিয়ে যা লিখেছে তার সারমর্ম হল, অফিসে কাজের সময় পি এন পি সি করলে এইচ আর কিন্তু সি এল, ই এল সব কেটে টি সি ধরিয়ে দেবে। তারপর কাজ ছাড়তে চাইলে সি সি জুটবে না। আর এটার ডব্লু ই এফ বারো ফেব। সহজ ব্যাপার!

চিটবেল্ট

বিশেষ্য; সামনে সজাগ মনের পুলিশকর্মী রয়েছে দেখা গেলেই যে সিটবেল্টের বিরল ব্যবহার হয়ে থাকে

—শব্দবক্রমুণি

ধারাবাহিক
পর্ব ১

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

১ মার্চ, সোমবার ১৯৭১

আজ বিকেলে রুমি ক্রিকেট খেলা দেখে তার বন্ধুদের বাসায় নিয়ে আসবে হ্যামবার্গার খাওয়ানোর জন্য।

গোসল সেরে বারোটার দিকে বেরলাম জিন্না অ্যাভেনিউয়ের পূর্ণিমা স্ন্যাকবার থেকে ডিনার-রোল কিনে আনার জন্য।

দু'ডজন ডিনার-রোল কিনে সোজা চলে এলাম বাড়ির কাছের নিউ মার্কেটে। গত দুই সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রায়ই বিভিন্ন দোকানে খোঁজ করি পূর্ব পাকিস্তানের তৈরি সাবান, তেল, টুথপেস্ট, বাসন-মাজা পাউডার; কিন্তু পাই না। একমাত্র ইভা বাসন-মাজা পাউডারটাই এখানকার তৈরি— বলা যেতে পারে সবে ধন নীলমণি। পিয়া নামের এক ঢাকাই টুথপেস্ট বাজারে বের হব-হব করে এখনও বের হতে পারছে না, আল্লাই মালুম কী কঠিন বাধার জন্য!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা। দরজা খুলে দিয়েই বারেক জানাল: 'সাবরে ফুন করেন আম্মা। খাবার-দাবার কিন্যা রাখতে কইছে। কই জানি গণ্ডগোল লাগছে।'

গণ্ডগোল? তা লাগতেই পারে। গত দু'মাস থেকেই তো ঢাকা তপ্ত কড়াই হয়ে রয়েছে। অফিসে ফোন করতেই শরিফ জানাল: 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেলা একটার সময় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শহরে সব জায়গায় হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। লোকেরা দলে দলে অফিস-আদালত ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানকার সব দর্শক শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এখানে মতিঝিলে তো দারুণ হৈচৈ হচ্ছে চারদিকে। কেন, নিউ মার্কেটের দিকে কিছু দেখনি?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'ওই সময়টা আমি পিছনদিকের দোকানগুলোয় ছিলাম, ঠিক খেয়াল করিনি। ওখানকার লোকেরা হয়তো এখনও শুনে ওঠেনি।' তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুমি-জামি যে স্টেডিয়ামে!'

শরিফ বলল, 'চিন্তা করো না। ওরা বেরিয়েই আমার অফিসে এসেছিল। জামিকে এখানে রেখে রুমি ওর বন্ধুদের কাছে গিয়েছে। শোন, বেশ গোলমাল হবে। এখানে অল-রেডি মিছিল বেরিয়ে গিয়েছে। বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়ামের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খবর পেলাম। গোলমাল বাড়লে কারফিউ দিয়ে দিতে পারে। ঘরে খাবার-দাবার আছে কিছু? না থাকলে এখুনি কিনে রাখ।'

তখুনি আবার বেরলাম। এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি— দু'পাশের ছোট ছোট দোকানগুলোতে লোকজনের অস্বাভাবিক ভিড়। সবাই উর্ধ্বশ্বাসে কেনাকাটা করছে। দোকানিরা দিয়ে সারতে পারছে না। আমিও দু-তিনটে দোকান ঘুরে, ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করে, টোস্ট বিস্কুট, চানাচুর, দেশলাই, মোমবাতি, গুঁড়ো দুধ, ব্যাটারি এসব কিনলাম। বাড়িতে এসেই বারেকের হাতে খালি কেরোসিনের টিন আর সুবহানের হাতে খালি বস্তা ধরিয়ে পাঠিয়ে দিলাম কেরোসিন আর চাল কেনার জন্য।

এইসব করতে করতে শরিফ আর জামি এসে গেল অফিস থেকে। প্রায় তিনটে বাজে। টেবিলে বেড়ে রাখা খাবারের ঢাকনা তুলে খেতে বসে জিগ্যেস করলাম, 'আর খবর কী?'

'শেখ মুজিব হোটেল পূর্বাণীতে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। আসার সময় দেখি

হোটেলের সামনে তিনটে রাস্তাই একেবারে মেইন রোড পর্যন্ত লোকে ঠাসা। সবার হাতে লোহার রড আর বাঁশের লাঠি। অফিস থেকে বেরিয়ে দৈনিক পাকিস্তানের দিক দিয়ে গাড়ি নিতে পারলাম না ভিড়ের চোটে। শেষে গভর্নমেন্ট হাউসের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গুলিস্তান ঘুরে এসেছি। রুমি এখনও ফেরেনি?'

এবার আমিই শান্তস্বরে বললাম, 'এই হৈচৈতে কোথাও আটকে গিয়েছে মনে হয়। খেলার শেষে বন্ধুদের নিয়ে হ্যামবার্গার খেতে আসার কথা। এখন খেলা যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, হয়তো আগেই আসবে।'

চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল। রুমির দেখা নেই। সাড়ে চারটের মধ্যে দু'ডজন হ্যামবার্গার বানিয়ে আভন-এ মৃদু গরমে রেখে দিয়েছি।

সন্ধে পেরিয়ে রাত এসে গেল। রুমি এল আটটারও পরে। একা। বিকেল-সন্ধে বাগানে পায়চারি করতে করতে আমার রাগ উবে উদ্বেগ দানা বাঁধছিল মনে। রুমিকে দেখেই রাগ আবার ঝাঁপিয়ে এল সামনে। রুমি আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুহাত তুলে, মুখে হৃদয়-গলানো হাসি ভাসিয়ে বলল, 'আগে শোন তো আমার কথা। কত কী যে ঘটে গেল একবেলায়। সবকিছুর স্কুপ-নিউজ এখুনি দিতে পারি তোমায়। নাকি, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে খবর কাগজের জন্য?'

আমি হাসি চেপে ভ্রূকুটি বজায় রেখে বললাম, 'কী তোমার স্কুপ-নিউজ, শুনি?'

'অনেক, অনেক। একেবারে গোড়া থেকে বলি। একটার সময় স্টেডিয়ামে ছিলাম। অনেক দর্শকই সঙ্গে রেডিও নিয়ে গিয়েছিল। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা যেই না কানে যাওয়া, অমনি কী যে শোরগোল লেগে গেল চারদিকে। মাঠ-ভর্তি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক— সবাই জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি জামিকে আব্বুর অফিসে রেখে ছুটলাম ইউনিভার্সিটিতে। ওখানেও একই ঘটনা। রেডিও'র ঘোষণা শোনামাত্রই ছেলেরা সবাই দলে দলে ক্লাস থেকে, হল থেকে বেরিয়ে বটতলায় জড় হতে শুরু করেছে। আমি যখন পৌঁছলাম, তখনও ছেলেরা পিলপিল করে আসছে চারদিক থেকে। মনে হল সমুদ্রের একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বটতলায়। তখুনি ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা ঠিক করল বিকেল তিনটেয় পল্টন ময়দানে মিটিং করতে হবে।'

'পল্টনে মিটিং হল? দেড়টা-দুটোয় বলল আর তিনটেয় মিটিং হল?'

'হল মানে? সে তুমি না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না আম্মা। এ-তো লোক! এতো লো-ক। উঃ আল্লারে। কিন্তু মিটিংয়েরও আগে তো পূর্বাণীতে শেখ মুজিব প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। উনি অবশ্য সকাল থেকেই ওখানে ওঁদের দলের পার্লামেন্টারি বৈঠকে ছিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণার একঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক বাঁশের লাঠি আর লোহার রড ঘাড়ে নিয়ে পূর্বাণীর সামনে সবগুলো রাস্তা জ্যাম করে ফেলল। সে কী শ্লোগান। পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ আর জিন্নার ছবিও পুড়িয়েছে। শেখ তখুনি সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা দিলেন হরতালের আর ৭ মার্চ রেসকোর্সে মিটিংয়ের।'

মনটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে। শরিফও বলেছে পূর্বাণীর সামনে ভিড়ের কথা। তবু মুখের বেজার ভাবটা বজায় রেখে বললাম, 'এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দু'ডজন হ্যামবার্গার ঠিকই বানালাম। কিন্তু তোদের কারও মনে নেই সে কথা।'

'মনে থাকার জো আছে আম্মা? কী যে খই ফুটছে সারা শহরে! গুলিস্তানের মোড়ে কামানের ওপর দাঁড়িয়ে মতিয়া চৌধুরী যা একখানা আগুন ঝরানো বক্তৃতা দিলেন না, শুনলে তোমারও গায়ে হলকা লাগত। সাধে কী আর ওঁকে সবাই অগ্নিকন্যা বলে।'

আমি আবার খেপে উঠলাম, 'এবার গুল মারছিস। তুই একা এতগুলো জায়গায় এক বিকেলে গেলি কেমন করে?'

রুমি খুব বেশিরকম অবাক হয়ে বলল, 'খুবই সিম্পল। বন্ধুর হোন্ডার পিছনে চড়ে সবখানে টহল দিয়েছি। আমরা কি এক জায়গায় বসে নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি নাকি? স্টেডিয়াম থেকে ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে পূর্বাণী, পূর্বাণী থেকে গুলিস্তান মোড়ের কামান, সেখান থেকে পল্টন— এমনি করে চরকিঘোরা ঘুরেছি না?'

'সারাদিন খাওয়া হয়নি নিশ্চয়?'

'কেই-বা খেয়েছে? ওই একটার আগে যে যা খেয়েছে চা-বিস্কুট— ব্যস। আর খাওয়া-দাওয়া নেই। বাঁশের লাঠি, লোহার রড— যে যা পেয়েছে, একেকখানা ঘাড়ে নিয়ে সবাই রাস্তায় নেমে গিয়েছে। তবে এতক্ষণে টের পাচ্ছি সারাদিন খাওয়া হয়নি।'

'চল চল, আগে খেতে বস। খাওয়ার পর বাকিটা শুনব।'

'ওই হ্যামবার্গারই দাও আমায়। নষ্ট করে কী লাভ? তোমরাও সবাই ওই দিয়েই রাতের খাওয়া সেরে ফেল।'

'গুষ্ঠিসুদ্ধ খেয়েও কি সব ফুরোনো যাবে?'

'চিন্তা করো না। আমি একাই ছটা খেয়ে ফেলব।'

শেখ মুজিব আগামীকাল ঢাকা শহরে, আর পরশুদিন সারাদেশে হরতাল ডেকেছেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের ঘোষণাও দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের কী পরিণাম হতে পারে, তা নিয়ে বহু রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল খাওয়ার টেবিলে বসে। রাত প্রায় বারোটার দিকে শুতে গিয়েও ঘুম এল না। অনেক দূর থেকে শ্লোগানের ধ্বনি আসছে। বোঝা যাচ্ছে এত রাতেও অনেক রাস্তায় লোকেরা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে। কেবল জয় বাংলা ছাড়া অন্য শ্লোগানের কথা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু তবু ওই সম্মিলিত শত-কণ্ঠের গর্জন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে এসে পড়ছে শ্রুতির কিনারে। শিরশির করে উঠছে সারা শরীর। গভীর রাতে আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে মনে হল যেন গুলিরও শব্দও শুনলাম।

২ মার্চ, মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ হরতাল। সকালে নাশতা খাওয়ার পর সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের মাঝখান দিয়ে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম। একটাও গাড়ি, রিকশা, স্কুটার এমনকি

সে কী শ্লোগান। পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ আর জিন্নার ছবিও পুড়িয়েছে। শেখ তখুনি সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা দিলেন হরতালের।

সাইকেলও নেই আজ রাস্তায়। রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে যেন আমার বাড়ির উঠোন! হরতালের দিনে ফাঁকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটা আমাদের মতো আরও অনেকেরই বিলাস মনে হয়। পাড়ার অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটের দিকে চলে গেলাম। কী আশ্চর্য! আজকে কাঁচাবাজারও বসেনি। চিরকাল দেখে আসছি হরতাল হলেও কাঁচা বাজারটা অন্তত বসে। আজ তাও বসেনি। শেখ মুজিবসহ সবগুলো ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে সর্বত্র যানবাহন, হাটবাজার, অফিস-আদালত ও কলকারখানায় পূর্ণ হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে, সবাই সেটা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েই আজ হরতাল করছে।

নিউ মার্কেটের দিক থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে আবার উল্টোদিকে গেলাম হাতিরপুল পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে কিটিও হাঁটছে। রাস্তায় লোকেরা ওর সোনালি চুলের দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। ভাবছি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই।

বসার ঘরে ঢুকে রুমি 'আরেক কাপ চা হোক।' বলেই হাঁক দিল, 'সুবহা-ন'।

সুবহান এঘরে আসতেই আমি বললাম, 'পাঁচ কাপ চা দিয়ে যাও।'

সুবহান চা বানিয়ে এনে সেন্টার টেবিলে ট্রে-টা রেখে রুমিকে লক্ষ করে বলল, 'ভাইয়া, তিনটার সুমায় পল্টনের মিটিংয়ে যাইবেন?'

রুমি গম্ভীর গলায় শুধোল, 'কেন, তুমি যেতে চাও আমাদের সঙ্গে?'

সুবহান কাঁচমাচু মুখে বলল, 'আমায় যুদি পারমিশুন দ্যান।'

আমি হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললাম, 'তাড়াতাড়ি রান্না সারতে পারলে যেতে পারবে।'

সুবহান কৃতার্থের হাসি হেসে প্রায় দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

রুমি নিচু গলায় বলল, 'ওর মধ্যে কিন্তু বেশ রাজনৈতিক চেতনা আছে।'

চা খেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আম্মা একটু বটতলা ঘুরে আসি। ছাত্রলীগ আর ডাকসু মিটিং ডেকেছে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এখন আবার হেঁটে হেঁটে অদ্দুর যাওয়ার দরকারটা কী? তুই তো কোনও দলের মেম্বার নস। তোর এত সব মিটিংয়ে যাওয়া কেন?'

রুমি বলল, 'এখন কি আর ব্যাপারটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে নাকি আম্মা? এখন তো এ আগুন ছড়িয়ে গিয়েছে সবখানে।'

এই এক স্বভাব রুমির। কথায় কথায় ইংরিজি-বাংলা কত যে কবিতার উদ্ধৃতি দিতে পারে ও। মনেও থাকে বটে। আমি নাচার হয়ে বললাম, 'যাবি যা। তবে দেরি করিস না। যা করবি, কর, কিন্তু ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে। বুঝলি?'

'আচ্ছা আম্মা'। বলে রুমি বেরিয়ে গেল।

আমি খবর কাগজের দিকে চোখ নামালাম। ঢাকায় যতগুলো ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক দল আছে সবাই আজ মিটিং ডেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে এগারোটায় বটতলায়, তিনটেয় পল্টন ময়দানে। ন্যাপ এগারোটায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে, বিকেলে পল্টনে। ন্যাপের কর্মসূচির সঙ্গে সমর্থনে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, কৃষক সমিতি। বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে— বিকেল সাড়ে তিনটেয়। নবগঠিত ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের সভাও ওই বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণেই— বিকেল চারটেয়।

সব দলই মিটিং শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে পূর্ব পাকিস্তানে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছে।

তিনটের সময় রুমি, জামি, শরিফ, সুবহান—সবাই চলল পল্টন ময়দানের দিকে। রিকশা করে গেল। গাড়ি নিল না। অত ভিড়ে গাড়ি নিয়ে আরামের চেয়ে ঝামেলাই বেশি। কিটি জিগ্যেস করল, সে মিটিংয়ে যেতে পারে কি না। আমি সকালের কথা ভেবে একটু ইতস্তত করে বললাম, 'তোমার না যাওয়াই ভালো। ভিড়ের মধ্যে কখন না জানি চ্যাপ্টা হয়ে যাও। দেখ না, আমি যাচ্ছি না।' কিটি বুদ্ধিমতী। আসল কথাটা বুঝে মুখ কালো করে নিজের ঘরে চলে গেল।

বারেকও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা ঘুম থেকে উঠবেন চারটেয়, তাঁকে ওঠানো, মুখ ধোয়ানো— আমি যেতে দিলাম না। তাছাড়া একটু মায়ের বাসায় যাওয়া দরকার। সকালে হেঁটে পারব না বলে যাইনি। দুটোর পর রিকশা চলছে।

সাড়ে চারটেয় বাবাকে চা-নাশতা খাইয়ে তাঁর সঙ্গে খানিক কথা বলে বারেককে কাছে বসিয়ে রেখে আমি গেলাম মা'র বাসায় ধানমন্ডি ৬ নম্বর রাস্তায়।

৩ মার্চ, বুধবার ১৯৭১

কালরাতে একদম ঘুম হয়নি। রাত আটটায় হঠাৎ কারফিউ। সারাদিন ধরে যত মিটিং আর মিটিং-শেষের লাঠিসোঁটা-কাঠ-রড নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সন্ধের পরেও তার বিরাম ছিল না। আরও বেরিয়েছিল মশাল মিছিল। রেডিওতে কারফিউয়ের ঘোষণা আমরা শুনিনি। তাই বুঝিনি কারফিউ ঘোষণার প্রতিবাদেই বেশি বেশি শ্লোগান। ভেবেছি সারাদিনের জের ওটা। কিন্তু হঠাৎ সাইরেনের বিকট আওয়াজে চমকে উঠেছি। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? একে-ওকে ফোন করে জানতে পারলাম ওটা কারফিউ জারির সাইরেন।

রাত এগারোটার দিকে মাইকেও কারফিউ জারির ঘোষণা দূর থেকে কানে এল। শব্দ শুনে মনে হল, বলাকা নিউ মার্কেটের রাস্তায় এবং আমাদের বাড়ির দক্ষিণদিকে ইকবাল হলের সামনের রাস্তায়। তার পরপরই বহু কণ্ঠের শ্লোগান আরও জোরে শোনা যেতে লাগল। তার মানে কারফিউ অগ্রাহ্য করে মিছিল আর শ্লোগান। কেমন যেন অস্থির লাগতে লাগল। ভাবলাম, কয়েক জায়গায় ফোন করি অবস্থা জানবার জন্য— গুলশানে রেবাকে, মদনমোহন বসাক রোডে মনোয়ারাকে আর ইন্দিরা রোডে কামালকে।

রেবা বলল, 'এখানে রাস্তায় কোনও মিছিল নেই; কিন্তু দূর থেকে শ্লোগানের শব্দ পাচ্ছি, আমাদের পিছন দিকটাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া তো।'

মনোয়ারা আমার ফোন পেয়ে কেঁদে ফেলল, 'কী যে হচ্ছে আপা! কেউ কারফিউ মানছে না, দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে গিয়েছে, ব্যারিকেড বানাচ্ছে, শ্লোগান দিচ্ছে। পুলিশও গুলি করছে। গুলি খেয়ে লোকে আরও খেপে উঠছে, দ্বিগুণ জোরে শ্লোগান দিচ্ছে। আমার ভাইটাও ওর মধ্যে আছে। জানি না বেঁচে আছে, না গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। কী হবে আপা?'

মনোয়ারার কান্না শুনে মনটা বিকল হয়ে গেল। আর কাউকে ফোন করতে ইচ্ছে হল না। সারারাতই কানে এল শ্লোগানের সম্মিলিত গর্জন।

আজ সকালে খবর কাগজে গত রাতের মিছিল ও গুলির খবর বিস্তারিত পড়লাম। স্টেডিয়াম, নবাবপুর, টয়েনবী সার্কুলার রোড, ভজহরি সাহা স্ট্রিট, গ্রিন রোড, কাঁঠালবাগান, কলাবাগান, নিউ মার্কেট, ফার্মগেট— ঢাকার প্রায় সব এলাকাতেই কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে, বহুলোক মারা গিয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

কাগজে আরেকটা খবর দেখলাম— বক্স করে দেওয়া হয়েছে:

১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারি।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোঃ ইয়াকুব খান গতরাতে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশবলে পত্রপত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছেন।

আদেশ লঙ্ঘনে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

খবরগুলো পড়ছি আর বুকের ভেতর কেমন যেন দম আটকানো ভাব হচ্ছে। ভাবলাম মনোয়ারাকে ফোন করি— খবর নিই ওর ভাইটা কেমন আছে। বাড়ি ফিরেছে কি না। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েও ফোন তুলতে পারলাম না।

রুমিকে নিয়ে আমার হয়েছে মহা উদ্বেগ। সারাদিন টো-টো করে সারা শহর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে কী হয়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাসায় ফিস্ট লাগাতে বলছি, আগে সব সময় লুফে নিয়েছে, এখন নাকি সময় নেই।

আজকেও প্রায় সারাদিনই মিটিং-মিছিল চলছে। আগের রাতে গুলিতে নিহত আটটি লাশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরেছে, মিছিল শেষে শহিদ মিনারে লাশ রেখে সকলে সমস্বরে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ের শপথ নিয়েছে।

বিকেলে পল্টন ময়দানের জনসভাতেও এই লাশগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বিশাল জনসমুদ্র শহিদদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার শপথ নিয়েছে। সভায় শেখ মুজিব সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাঙালি জাতি এক পয়সাও ট্যাক্স-খাজনা দেবে না। তিনি সরকারকে বলেছেন সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে আর বাঙালি জনগণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে অহিংস অসহযোগিতা চালিয়ে যেতে।

সন্ধ্যার পর রুমি বাড়ি ফিরলে তার মুখে এসব শুনলাম। আরও শুনলাম এক নতুন পতাকার কথা। গতকালই নাকি বটতলায় ছাত্রদের জনসভায় এ পতাকা প্রথম দেখানো হয়েছিল। আজ পল্টনের জনসভায় শেখের উপস্থিতিতে প্রথমে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটা গাওয়া হল, তারপর স্বাধীন বাংলার এই নতুন পতাকা উত্তোলন করা হল।

আমি শিহরিত হয়ে বললাম, 'স্বাধীন বাংলার পতাকা? বলিস কি রে? কেমন দেখতে?'

'দাঁড়াও, এঁকে দেখাই।' বলে একখণ্ড কাগজ ও কয়েকটা রঙিন পেন্সিল এনে রুমি স্বাধীন বাংলার পতাকা আঁকতে বসল: সবুজের ওপর টকটকে লাল গোলাকার সূর্য, তার মধ্যে হলুদ রঙে পূর্ব বাংলার ম্যাপ।

আমি বললাম, 'এক'দিন তো স্বাধিকারের কথাই শুনছি, নির্বাচিত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাই শুনছি, এর মধ্যে স্বাধীন বাংলার কথা কখন উঠল?'

'তুমি কোনও খবর রাখ না আম্মা। স্বাধীন বাংলার দাবির কথা তো অনেক অনেক পুরনো ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে বহুদিন থেকেই গুমরাচ্ছিল। গত বছর নভেম্বরের সাইক্লোনের পরে তা ফেটে পড়েছে। তোমার মনে নেই মওলানা ভাসানি ১৮ নভেম্বর দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যেতে চাইলে তাঁর জাহাজ আটকে দেওয়া হয়? সরকার অবশ্য পরে তাঁকে যেতে দেয় কিন্তু এ নিয়ে কী হৈচৈটা হয়, কাগজে পড়নি? তারপরেই তো, ৪ ডিসেম্বরের সেই যে মিটিং— ন্যাপ, জাতীয় লীগ আরও কী কী দল যেন একত্রে মিটিং করল, ভাসানি সেখানেই পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান। তারপর এখন আওয়ামি লীগের উগ্রজাতীয়তাবাদী সেকশনের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার দাবি উঠেছে। চার খলিফা খুব চাপ দিচ্ছে শেখকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য।'

'চার খলিফা?'

'জান না বঝি, আ. স. ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন আর নূরে আলম সিদ্দিকী— এই চার ছাত্রনেতাকে আমরা সবাই চার খলিফা বলে ডাকি। শাহজানার সিরাজই তো আজ পল্টন সভায় পতাকাটা তুলেছে।

'শেখ কী বললেন?'

'কিছুই বললেন না। তবে খুব যে খুশিও হননি, মুখ দেখে বোঝা গেল।'

'তাতো হবেনই না। এই মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়াটা ভীষণ রিস্কি ব্যাপার না?'

'রিস্কি নিশ্চয়। কিন্তু আম্মা, ঘটনার একটা নিজস্ব গতি আছে না? জলপ্রপাতের মতো। উঁচু পাহাড় থেকে যখন গড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে রুখতে পারে, এমন কোনও শক্তি নেই। আমাদের দেশের জনতা এখন ওই জলপ্রপাতের মতো একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে অত্যন্ত তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে, একে আর বোধ হয় রোখা যাবে না।

৪ মার্চ, বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গতকাল রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্ষুব্ধ জনতা আবার কারফিউ লঙ্ঘন করে মিছিল বের করেছে, গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে রাজপথ, জনপদ প্রকম্পিত করেছে এবং অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গুলি খেয়ে কালো পিচের রাস্তা রাঙা করেছে।

আজও ছটা-দুটো হরতাল।

গত তিনদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মিটিং মিছিল করে করে রুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে বাড়িতেই আছে। দেখে আমার প্রাণে শান্তি। চিংকু এসেছে। দু'জনে কথা বলছে খাবার টেবিলে বসে। খাবার টেবিলটাই রুমির পছন্দ আড্ডা দেওয়ার জন্য। বলে বলেও ওকে বসার ঘরের

আগের রাতে গুলিতে নিহত **আটটি লাশ** নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরেছে, মিছিল শেষে **শহিদ** মিনারে লাশ রেখে সকলে সমস্বরে পূর্ব **বাংলার স্বাধিকার** আদায়ের **শপথ** নিয়েছে।

সোফায় বসানো যায় না।

কয়েক মাস আগে ওয়েটিং ফর গোডোতে অভিনয় করে চিংকু খুব নাম করেছে। হোটেল ইন্টারকনের সাউথ বলরুমে নাটকটা অভিনীত হয়েছিল।

মিলিটারির গুলিতে নিহত শহিদদের জন্য আজ গায়েবানা জানাজা বায়তুল মোকাররমে। তারপর শোক মিছিল।

চিংকু বারোটার দিকে চলে গেল। রুমি আর শরীফ গোসল সেরে হালকা স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ সারল। হেঁটে হেঁটে বায়তুল মোকাররমে যাবে, তাই এইরকম আধপেটা খাওয়া।

বিকেলে রিকশা নিয়ে আমি আর জামি বেরলাম মালিবাগের মোড়ে ট্রাফিক আইল্যান্ডে ফারুক ইকবালের কবর দেখতে। দু'তারিখে বিকেলে রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিল ফারুক ইকবাল অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। সেই সময় মিলিটারি পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সে। ক্রুদ্ধ ছাত্রজনতা এই মোড়ের ট্রাফিক আইল্যান্ডের ওপরই তাকে কবর দিয়েছে। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড আছে বলেই গাড়ি নিইনি। একেকটা ব্যারিকেডের সামনে এসে রিকশা ছেড়ে দিই। ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে হাঁটা রাস্তায় ওপাশে গিয়ে আরেকটা রিকশা নিই। এদিকটার কয়েকটা ব্যারিকেড ভারি চমৎকার জিনিস দিয়ে করা হয়েছে— রেলগাড়ির বগি। জামি বলল, দু'তারিখের বিকেলে মালিবাগ লেভেল ক্রসিংয়ে একটা রেলগাড়ি আটক করে সবাই। তারপর একেকটা বগি টেনে টেনে ব্যারিকেড দিয়েছে তিন-চার জায়গায়।

ফারুকের কবরের কাছে এসে দেখি কবরটা ঘিরে দড়ির রেলিং। আগরবাতি জ্বলছে। চারপাশে অনেক লোক। সন্ধে হয়ে আসছে, কয়েকজন লোক মোমবাতি জ্বেলে দিল। দু'জন মৌলবী সাহেব কোরান শরিফ পড়ছিলেন, একজন লোক দুটো বড় সাইজের মোমবাতি জ্বেলে ওঁদের সামনে বসিয়ে দিল।

আজ রাতে কারফিউ নেই।

৫ মার্চ, শুক্রবার ১৯৭১

আজও ছটা-দুটো হরতাল।

শেখ মুজিব হরতালের দিনগুলোতে বেতন পাওয়ার সুবিধের জন্য এবং অতি জরুরি কাজকর্ম চালানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি সব অফিস দুপুর আড়াইটে থেকে চারটে পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রেশন দোকানও ওই একই সময়ে খোলা।

ব্যাঙ্কও তাই। আড়াইটে-চারটের মধ্যে টাকা তোলা যাবে। তবে দেড় হাজার টাকার বেশি নয়। বিকেলে ব্যাঙ্ক খোলা— ভাবতে মজাই লাগছে। শেখের একেকটা নির্দেশে সব কেমন ওলটপালট খেয়ে যাচ্ছে।

জরুরি সার্ভিস হিসেবে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ি, সংবাদপত্র ও তাদের গাড়ি, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, দমকল, মেথর ও আবর্জনা ফেলা ট্রাক— এগুলোকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ মসজিদ ও মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা। গোসল সেরে পৌনে একটার সময় শরীফ, রুমি, জামি, সুবহান— সবাই পাড়ার এরোপ্লেন মসজিদে গেল।

তারপর আড়াইটের সময় খেয়ে দেয়ে শরীফ অফিসে রওনা দিল।

আজ বিকেলে চারটের সময় লেখক সঙ্ঘের মিটিং তোপখানা রোডে। মিটিং শেষে সেখান থেকে মিছিল করে শহিদ মিনারে আসা হবে। আমি সাড়ে পাঁচটা-ছটা নাগাদ সোজা শহিদ মিনারেই যাব। হাঁটুতে বাতের জন্য বেশি হাঁটতে পারি না।

ক'দিন হট্টগোলে কিটিকে বাংলা পড়ানো হয়নি। আজ শরীফ চলে যাওয়ার পর কিটিকে নিয়ে বসলাম। কিটি আমেরিকান মেয়ে— একটা স্কলারশিপ নিয়ে এ দেশে এসেছে ডিসেম্বরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে মুনীর চৌধুরীর আন্ডারে 'সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার মান নির্ধারণ' বিষয়ে গবেষণা করার জন্য। নটা ভাষা জানে। বাংলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতে পারে। তাড়াতাড়ি বাংলা শেখার জন্য কোনও বাঙালি পরিবারে বাস করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল কিটি। তাই মুনীর স্যার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ওর জন্য একটা বাঙালি পরিবার খুঁজে দিতে। তিন-চার জায়গায় চেষ্টা করে না পেয়ে শেষে নিজের বাড়িতেই রেখেছি ওকে।

সপ্তাহে তিনদিন করে বাংলা পড়াই কিটিকে। বাড়ির অন্য সবার সঙ্গে সর্বক্ষণ বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে সে। আজ কিন্তু ওর বাংলা পড়ার বা বাংলায় কথা বলার কোনও চেষ্টা দেখলাম না। সরাসরি ইংরিজিতে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা আম্মা, আমি যখন প্রথম আসি, তখন রাস্তায় আমাকে দেখলে লোকে উৎসুক হয়ে উঠত, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইত। আর এখন কেন দেখলে বিরক্ত হয়? রেগে রেগে কী যেন বলে?'

আমি বিপদে পড়লাম। মেয়েটি খুব আবেগপ্রবণ এবং মেজাজিও। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে তোমাকে এ দেশের গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের ইতিহাস ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা ভালো করে বোঝাতে হবে।'

মিটিংয়ে আর যাওয়া হল না। কিটিকে বোঝাতে বোঝাতে সন্ধে কাবার হয়ে গেল।

৬ মার্চ, শনিবার ১৯৭১

ছটা-দুটো হরতাল চলছেই।

শরীফ আর রুমি আজ সকালে হাঁটতে হাঁটতে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে এল। আমি আর জামি বাদ গেলাম যথাক্রমে অ্যানিমিক ও ছোট বলে।

গতকালকার আলোচনার পর থেকে কিটি যেন চুপ মেরে গিয়েছে।

শরীফরাও রক্ত দিতে যাওয়ার আগে, সে যেরকম মুখ করে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, তাতে মনে হল, সেও বোধহয় রক্ত দিতে যেতে চাইছে। কিন্তু কপাল ভালো, শেষপর্যন্ত কিটি মুখ খুলল না।

আমার বেশ খারাপ লাগছে কিটির কথা ভেবে। এখানে আসার দিন পনেরো পর থেকেই ও আমাকে আম্মা বলা শুরু করেছে। মাস দেড়েক পর থেকে শরীফকেও আব্বা বলছে। ও আমাদের পরিবারে মিশে যেতে চায়, সব ব্যাপারে অংশ নিতে চায়। কিন্তু ওর সোনালি চুল, নীল চোখ রাস্তায় লোকজনের মুখে ভ্রূকুটি এনে দেয়। পাড়ার লোকেরাও এখন আর ভালো চোখে দেখে না ওকে। বাসায় মেহমান এসেও ওকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

আমরা যখন সকলে মিলে গলা ফাটিয়ে তর্ক, আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠি, তখন কিটি এসে দাঁড়ালে আমরা থমকে যাই। মাতৃভাষায় যত কথা কলকল করে বলতে পারি, ইংরিজিতে তত ফ্লো আসে না। ফলে আলাপ হোঁচট খায়। তাতে ও সন্দেহ করে ওকে দেখে আমরা বুঝি কথা ছাপাচ্ছি! আমরা বাংলায় আলাপ চালিয়ে রাখলে সব কথা বুঝতে পারে না। তখন উল্টো মাইন্ড করে। ভারি এক ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়েছি যেন!

আজ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। শরীফ সাড়ে বারোটার মধ্যেই গোসল সেরে রেডি— প্রেসিডেন্ট কী বলেন, তা শোনার জন্য সকলেই চনমন করছি। এক তারিখের ঘোষণায় তো লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গিয়েছে, এখন আবার কী বলেন, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

আগামীকাল রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ কী বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বাণীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচির ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। কিন্তু এ কদিনের ঘটনা তো অন্য খাতে বইছে। এত মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, কারফিউ ভঙ্গ, গুলিতে শয়ে শয়ে লোক নিহত— এর প্রেক্ষিতে শেখ আগামীকাল কী ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছে,

শেখ আগামীকাল কী ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছে, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দূর তা কী করে হবে? এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে। কেউ বলছে, আগামীকালের মিটিংয়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া আজ ভাষণ দিচ্ছে।

উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দূর তা কী করে হবে? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি দাবির জোরে সরকার গঠন করবেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন। এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে। কেউ বলছে, আগামীকালের মিটিংয়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া আজ ভাষণ দিচ্ছে।

ভাষণ শুনে সবাই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। আমি হেসে শরীফকে বললাম, 'তুমি কী আশা করেছিলে? ইয়াহিয়া 'এসো বধূ আধ-আঁচরে বসো' বলে মুজিবকে ডেকে সরকার গঠন করতে বলবে?'

'না, অতটা আশা না করলেও ওরকম কর্কশ গলার ধমক-ধামকও আশা করিনি। যত দোষ নন্দঘোষ বলে উনি যেভাবে আমাদের গালাগালি করলেন, সেটা মোটেই আমাদের প্রাপ্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উনিই তো দায়ী।'

'যাই বল, ভয় পেয়েছে কিন্তু। দেখলে না ২৫ মার্চ অধিবেশন বসার ঘোষণা দিল?'

রুমি চটা গলায় বলে উঠল, 'আর সামরিক বাহিনী দিয়ে আমাদের শায়েস্তা করার হুমকি দিল যে? সেটা কী?'

এসব কচাকচি করতে করতে দুপুরের খাওয়া শেষ হল। শরীফ ও রুমিকে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে দেখে বললাম,

'কোথায় যাচ্ছ?'

'অফিসে।'

'অফিসে?' আজ না শনিবার, হাফ?'

রুমি হেসে উঠে বলল, 'আম্মা ভুলে গিয়েছ, এখন না বিকেলে অফিস-কাচারি চলছে?'

আমি বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'তাতে কী? হাফের দিন হাফ থাকবে না?'

'নিশ্চয় থাকবে। হাফ ছুটিটা সকালেই হয়ে গিয়েছে, এখন হাফ অফিস। দেখছ না, এখন উলট-পুরাণের যুগ চলছে।'

'তাই বটে। কিন্তু তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'আমি? আমিও অফিসে যাচ্ছি। ও আম্মা, তুমি ভুলে গিয়েছ আমি আব্বুর অফিসে ড্রয়িং করতে যাই? তাছাড়া এখন যে বেবি চাচার সঙ্গে কাজ করি?'

ভুলেই গিয়েছিলাম বটে! রুমি গত বছর আই. এস. সি পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে শরীফের অফিসে টুকটাক ড্রয়িংয়ের কাজ করে। রেজাল্ট বেরবার পর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে গত বছর অক্টোবরে; কিন্তু তখনই কলেজ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল ক্লাস শুরু হবে একাত্তরের মার্চ থেকে। তাই বসে না থেকে শরীফের অফিসের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটাও তার সব সময় করতে ভালো লাগে না। তাই বিভাগীয় প্রধানের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স বিভাগে ক্লাসও করে। এখন তো মার্চে এই তোলপাড় ব্যাপার। পড়াশোনা এতদিন শিকেয় তোলা ছিল, এবার টংয়ে উঠল।

বাংলা একাডেমিতে আজ শিল্পীদের জরুরি সভা আড়াইটেয়। যদিও আমি শিল্পী বা সাহিত্যিক নই, কিন্তু ঢাকায় সেই ১৯৪৯ সাল থেকে আছি বলে বেশিরভাগ শিল্পীসাহিত্যিকদের সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপ আছে তাই শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক সভা, সমিতি, সেমিনার, আন্দোলন ইত্যাদিতে দর্শক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় সব সময়ই গিয়ে থাকি।

কিন্তু আজও বাধা পড়ল। বাবাকে ওঠানোর ভার জামির ওপর দিয়ে তিনটের দিকে বেরব ভেবেছিলাম। কিন্তু বাবা হঠাৎ পৌনে তিনটেয় জেগে ডাক দিলেন, 'মাগো, একটু শোন তো।'

কী ব্যাপার?

'মনে হচ্ছে খাটটা দুলছে।'

বুঝলাম। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ব্লাড প্রেসার বাড়লেই ওর মনে হয় খাট, দেওয়াল, ছাদ সব দুলছে। রুমির ওপর রাগ হল। কাল রাতে রুমি অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে দেশের পরিস্থিতি বুঝিয়েছে। অন্ধ মানুষ, বয়স প্রায় নব্বই, হাই ব্লাড প্রেসারের জন্য সবসময় ধরে ধরে সব করাতে হয়। তাঁর ওপর সামান্য মানসিক চাঞ্চল্য হলেই আর রক্ষা নেই। প্রেসার একেবারে দশতলায় উঠে বসে থাকে। তাকে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের এই মরণপণ আন্দোলনের সাতকাহন না শোনালেই নয়? প্রতিবেশী ডাক্তার, এ. কে. খানও নেই ঢাকায়, রাজশাহিতে পোস্টেড। তার অবর্তমানে কখনও ডাঃ নুরুল ইসলাম, কখনও ডাঃ রব দেখেন বাবাকে। কিন্তু এখন ওঁদের বিশ্রামের সময়। পাঁচটার আগে ডাকা ঠিক হবে না। তাই ফোন করে শরীফকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতে বললাম।

পাঁচটার পর ডাঃ নুরুল ইসলামকে ফোন করলাম। উনি বাড়ি নেই। সৌভাগ্যবশত ডাঃ রবকে পেয়ে গেলাম। উনি বললেন, 'এখন তো ভাই আমার গাড়িটা নেই। রুমিকে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য?' অতীতে রুমি বহুবার ওঁকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছে। রুমিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলতেই সে বলল, এখন তো ওই রাস্তায় গাড়ি নেওয়া যাবে না। এখন যে ওই রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি।

তাই তো। ডাঃ রবের বাড়ি মিরপুরে মেইন রোডের ওপর। গত কদিন ধরে রোজই সন্ধ্যায় সব মিছিল ওই রাস্তা দিয়ে গিয়ে শেষ হয় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

॥মহাজনসঙ্গ॥

অমিতাভ চৌধুরি

মহাজনসঙ্গ।১

মুজিবর রহমানের মুখোমুখি

১৯৭২ সালের জানুয়ারি ঢাকার ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে। ওঁকে রবীন্দ্র রচনাবলি উপহার দিচ্ছি। ওপাশে মেয়ে হাসিনা।

'এ পার বাংলা ও পার বাংলা,
মধ্যিখানে চর,
তার মধ্যে বসে আছেন
শেখ মুজিবর।'

সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মানুষ আমি, কিন্তু কপালগুণে দেশ-বিদেশের বহু গুণিজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে। এমনই কয়েকজনের দুয়েকটি কাহিনী নিয়েই এই রচনার সূত্রপাত। অনেক মহাজনই পথ চলতে চলতে এসে পড়েছেন, তাঁদের সঙ্গী হওয়ার স্মৃতি সংক্ষেপে সারতে চাই।

মহাজন-সঙ্গ করব কার সঙ্গে? সবাইকে তো হারিয়েছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই-ওই বাংলায় ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র— কেউ নেই। ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তাঁকেও আমরা হারিয়েছি নিষ্ঠুরভাবে। তাঁর সঙ্গেই আমি খোলাখুলি অনেক আলোচনা করেছিলাম, পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লন্ডনের ক্লারিজ হোটেলে যখন ছিলেন, তখন আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে টেলিফোনে কথা বলেছিলাম। তাছাড়া ঢাকায় গিয়ে তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী, কন্যা, নাতি— সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করেছিলাম। ধানমণ্ডির সেই বাড়িতে তিনি কত অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে নানা গল্প করেছিলেন। তাছাড়া কলকাতার রাজভবনে

আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম। আর তাই যখন শুনলাম নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে তাঁর বাড়িতেই, তখন অঝোরে কেঁদেও ছিলাম।

শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে আমি একটা ছড়া বানিয়েছিলাম। 'এ পার বাংলা ও পার বাংলা, মধ্যিখানে চর, তার মধ্যে বসে আছেন শেখ মুজিবর।' মুজিব আমার প্রিয় রাজনীতিবিদ। তার অন্যতম কারণ ভিন্ন জগতের লোক হয়েও তিনি ভালোবাসতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। মনে আছে, তিনি যখন পাকিস্তানের মি এহাওয়ালি জেলে বন্দি, তখন অনবরত আবৃত্তি করতেন, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়'। মুক্তি পাওয়ার পর লন্ডনের ক্লারিজ হোটেল থেকে কলকাতায় ফোনে বলেছিলেন, 'জয় বাংলা।' বলেছিলেন, ''উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।'' ঢাকার বাড়িতে দেখা করার পরই তিনি বলেছিলেন, ''চিনেছি, চিনেছি, আপনি তো আমাকে লন্ডনে ফোন করেছিলেন। জয় বাংলা।''

বাড়ির একতলায় উনি আর আমি বসেছিলাম আলোচনা করতে। তাঁর পরনে লুঙ্গি আর চেক কাটা শার্ট। বললেন, ''কবিগুরুই আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার রবীন্দ্রপ্রীতি ছোটবেলা থেকেই।'' হঠাৎ একটি লাইন আমাকে মুগ্ধ করে দেয়— 'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের, 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম, জননী জন্মভূমি' পড়ার পরই দেশকে ভালোবাসতে শিখলাম। বড় হয়ে পড়লাম, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'। দুর্ভাগা দেশের প্রতি এত দরদ আর আছে?''

আমি তাঁকে উপহার দিই অখণ্ড গীতবিতান, সঞ্চয়িতা ও সমগ্র রচনাবলি। আর দিলাম সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড 'আমার সোনার বাংলা' এবং অংশুমান রায়ের 'শোন, একটি মুজিবরের থেকে'। উপহার পেয়ে খুব খুশি। বলেন, ''আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের ওই চোখদুটিতে কী আছে বলুন তো? দেখুন দেখুন, চোখদুটিতে জ্বলজ্বল করছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এই জন্যই তো আমি তাঁকে এত ভালোবাসি। আর এই 'সঞ্চয়িতা' আমার হাতের কাছে থাকলে আমি আর কিছু চাই না। সব মিলিয়ে এগারো বছর কাটিয়েছি জেলে। আর এই জেলেই আমার সঙ্গী ছিল সঞ্চয়িতা। আমার প্রিয় গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'— এবং এইটিকে আমি দেশের জাতীয় সঙ্গীত করেছি।'' সত্যিই, এক কবির লেখা দুটি গান দুই দেশে জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার দৃষ্টান্ত আর নেই।

তাঁকে বলি রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত শিলাইদা, পতিসর ও সাজাদপুর সংস্কারের কথা। বলেন, ''হবে, সব হবে! আমি কথা দিলাম।'' তাঁর কাছে দাঁড়ানো ভগ্নিপতিকে বললেন, ''রউফ মনে করিয়ে দিও, শিলাইদা, সাজাদপুর।''

মনে আছে, পরদিন সকালে আবার গিয়েছিলাম, ওঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে। সোজা দোতলায়, ওঁর শোবার ঘরে। সেখানে তখন বেগম মুজিব, মেয়ে হাসিনা-রেহানা, ছেলে কামাল ও জামাল এবং নাতি জয়— বেগমের কোলে। বই ও গানের রেকর্ড পেয়ে বেগম খুব খুশি। কিন্তু বললেন, ''হায় রে কপাল, ও গান শুনব ক্যামনে? ও তো জানে না, বাড়িতে গ্রামোফোন নাই।'' হাসিনা বললেন, ''আপা, মনে আছে তোমার একটা বই— রবীন্দ্রনাথের— তাতে সব জেলের ছাপ ছিল।'' শেখ সাহেব বললেন, ''মনে থাকবে না? ওই বইখানাই তো ওরা পোড়ায় দিছে।'' এক ফাঁকে বেগম মুজিব বলেন, ''এই বই তো দিলেন, কিন্তু পড়ব কোন সময়। সারা দিন তো কাজ আর কাজ।''

এই কাজ করতে করতেই নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে শেখ মুজিব বিদায় নিলেন। মুজিবহীন বাংলাদেশে পরে গিয়েছি কয়েকবার। সেই বেদনার স্মৃতি বারবার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, রমনার মাঠে তাঁর সেই উদাত্ত ভাষণ— ''আমারে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'' দুই বাংলার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আপনজন। সেই আপনজনের অভাব আজও আমি অনুভব করি।

হাসিনা বললেন, ''আপা, মনে আছে তোমার একটা বই— রবীন্দ্রনাথের— তাতে সব জেলের ছাপ ছিল।''

(সব ছবি লেখকের সৌজন্যে)

সত্যজিতের সান্নিধ্যে

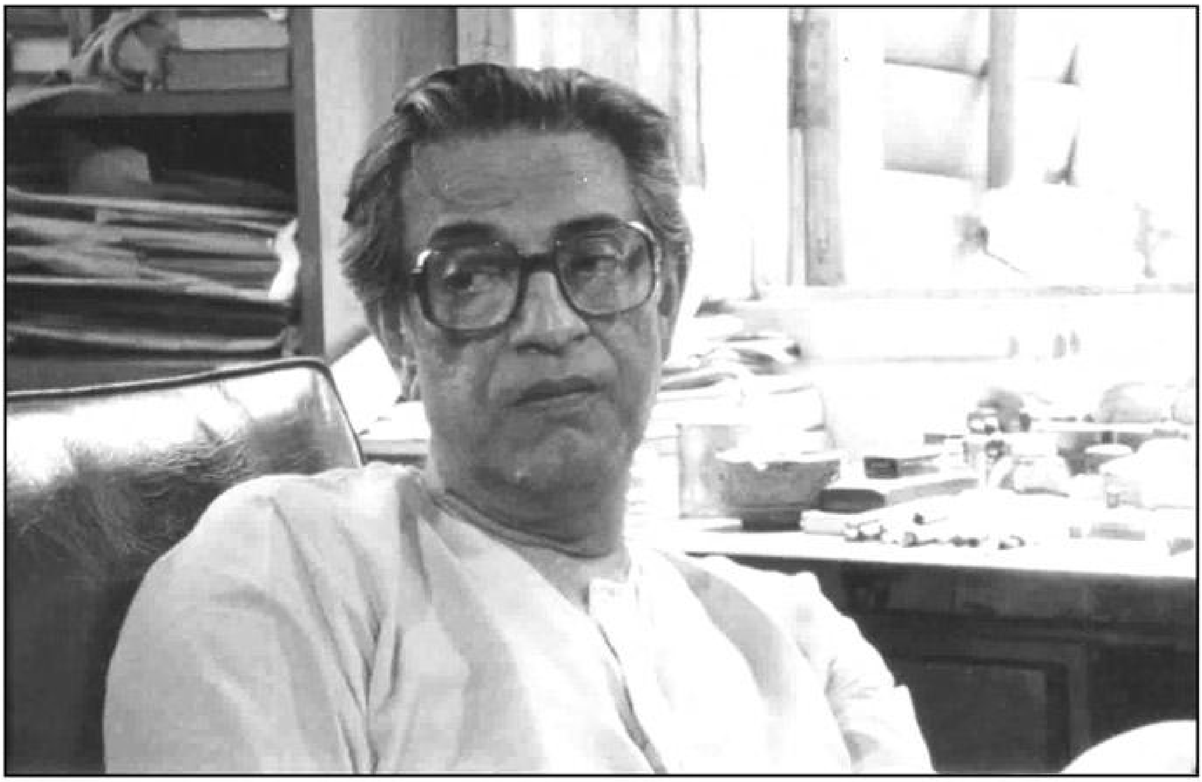

সত্যজিৎ রায়কে প্রথম দেখি শান্তিনিকেতনে। ১৯৪৪ সালে। তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত নন, আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল সুকুমার রায়ের ছেলে বলে। আর জানতাম, তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনে ছাত্র ছিলেন। তখন তাঁর বন্ধু ছিলেন শিল্পী দিনকর কৌশিক এবং শিল্প সমালোচক পৃথ্বীশ নিয়োগী। আর তখনই সেই চল্লিশের দশকে পৌষ-উৎসবে শিল্পী ও সি গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁকে দেখেছিলাম। তাঁর নাম বেশি করে শুনতে লাগলাম ১৯৪৮ সালে কলকাতায় আসার পর। তখন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস সিনেমাতে তোলার তোড়জোড় চলছে। পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন সত্যজিৎ রায় নামে একজন অঙ্কনশিল্পী। রাধামোহন ভট্টাচার্য, অভী ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা প্রমুখ নাকি মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করবেন। কিন্তু তখন ছবিটা হয়নি, হল অনেকদিন পর। কেননা 'ঘরে বাইরে' সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় কাহিনী। এত প্রিয় যে, নিজের একমাত্র ছেলের নাম রেখেছিলেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়কের নামে। সন্দীপ। শেষজীবনে তিনি অবশ্য এই উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন অন্য অভিনেতাদের নিয়ে। সেটা আমিও দেখেছি।

পরে সত্যজিতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁকে ফোন করেছি এবং তাঁর বাড়িতেও কয়েকবার গিয়েছি। ওঁর 'যখন ছোট ছিলাম' বইটা ছাপা হয়ে বেরল, তখন ওঁকে ফোন করে বললাম, 'আপনার এই বই আর রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইয়ের শুরু একইরকম। দুটোই কলকাতার যানবাহন নিয়ে।' ওঁর উত্তর— 'তাই নাকি? আমি খেয়াল করিনি।' ওঁর ছাপা জন্মপঞ্জিকা দেখে আমি কিঞ্চিৎ অবাক হই। ওঁকে টেলিফোন করি— 'আপনি কি কলকাতানিবাসী, না কলকাতা-প্রবাসী? আপনার জন্মপঞ্জিকায় 'নিবাসী' কেটে 'প্রবাসী' লেখা হয়েছে।' উনি বললেন— না, না আমার মা-বাবা, প্রবাসী আমি নই।' 'আচ্ছা কে একজন বলল, আপনি ছোলার ডাল আর রুটি খেতে ভালোবাসেন। সে কি আপনি আদিতে বিহারের লোক বলে? বিহার থেকে চাকদহ, চাকদহ থেকে মসুয়া—।' আমার প্রশ্ন শুনে তাঁর সে কী হাসি! সে হাসির আওয়াজ আমি আজও এত বছর পর শুনতে পাচ্ছি।

সেবার তাঁর তোলা 'শতরঞ্জ কি-খিলাড়ি' মুক্তি পেয়েছে। আমি বললাম, 'আপনার একটি ছবি চাই। দাবার ছক হাতে। ছাপাবো।' আমার কথা শুনে সে কী হাসি। বললেন, 'সকাল আটটায় লোক পাঠাবেন।' পাঠিয়েছিলাম, পরদিন দাবার ছক সামনে সত্যজিতের ছবি 'যুগান্তর' কাগজে ছাপা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথকে পরলোক থেকে সত্যজিতের বাবা সুকুমার রায় অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর ছেলে সত্যজিৎকে শান্তিনিকেতনে এনে ভর্তি করাতে। তিনি যেন স্ত্রী সুপ্রভা রায়কে কলকাতায় গিয়ে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেইমতো সত্যজিতের মাকে ডেকে এনে সেই অনুরোধ করেন। সত্যজিৎ প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও বি এ পরীক্ষার পর কলাভবনে গিয়ে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হন। আমি তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলেন, 'সত্যিই তাই, আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মায়ের পীড়াপীড়িতে গিয়ে ভর্তি হই। মা বলেন, 'তোর বাবার অনুরোধও রাখবি না? কেন?'

সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে গিয়ে লাভবান হন। এখানে জন্মের কয়েক মাস পর ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর মা ও বাবা শিশুপুত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান। তারপর আরও একবার। আট-ন'বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে একটি অটোগ্রাফ প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখে দেন এবং সম্ভবত এটাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অটোগ্রাফ। সঙ্গের কবিতায় ছিল 'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ ঘুরে' ইত্যাদি। নন্দলাল বসুর কাছেও খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি খাতার চারদিকে চারটি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।

তাঁর বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ির দোতলায় গেলে তাঁর সঙ্গে বেশি কথা হত শান্তিনিকেতন নিয়ে। একদিন বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে বেশি ভাব ছিল প্রফেসর আরসনের। এই জার্মান অধ্যাপক শান্তিনিকেতন জীবনেও আমারও অধ্যাপক ছিলেন। সত্যজিৎ বললেন, 'তাঁর বাড়িতে প্রচুর রেকর্ড — বিদেশি বাজনার। প্রচুর শুনতাম ও দুজনে আলোচনা করতাম।' সত্যজিৎবাবু আর একদিন বললেন, 'আমি নন্দলালবাবুর ছাত্র কিন্তু বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে পরে একটা ছবিও তুলি— 'ইনার আই।' আর ঘনিষ্ঠতা ছিল রামকিঙ্কর বেইজের সঙ্গে। আর ভালো লাগত অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসরাজ। চমৎকার হাত। আমি যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তথ্যচিত্র করি, তাতে অশেষবাবুর এসরাজ বারবার ব্যবহার করেছি।'

১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ যখন নার্সিং হোমে, তখন তাঁকে দেখতে কয়েকবার গিয়েছি। সেখানে নানা বিষয়ে কথা হত। একদিন খুব সাহস করে বললাম, 'আপনার 'ঘরে বাইরে' ছবিতে সন্দীপের বিমলাকে চুমু খাওয়ার দৃশ্য আমার কিন্তু ভালো লাগেনি।' তিনি একটু গলা চড়িয়েই বললেন, 'না না, বইয়ে যাই থাকুক ওখানে ওই দৃশ্যটা দরকারি।'

একদিন খুব সাহস করে বললাম, 'আপনার 'ঘরে বাইরে' ছবিতে সন্দীপের বিমলাকে চুমু খাওয়ার দৃশ্য আমার কিন্তু ভালো লাগেনি।' তিনি একটু গলা চড়িয়েই বললেন, 'না না, বইয়ে যাই থাকুক ওখানে ওই দৃশ্যটা দরকারি।'

আরেকদিন গিয়েছিলাম ওঁর বাড়িতে, সঙ্গে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। সত্যজিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি বললেন, 'ওঁকে আমি অনেকদিন চিনি। ওঁর 'শাদা ঘোড়া' আর সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ব্যাঘ্রদেবতা' দুটি ছবি করার কথা ভেবেছিলাম, তখন থেকে ওঁর সঙ্গে এখানেই নানা কথা হত।'

সত্যজিৎ তখন অনেকটাই রোগা হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আমার লেখা একটা বই দিলাম— 'সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ।' আগে নাম ছিল 'মসুয়ার রায় পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ।' বই হাতে নিয়ে আমাকে বললেন, 'কী, বেশি বিক্রি হবে বলে নামটা পাল্টে দিলেন?' তারপর হো-হো হাসি। তারপর অমরেন্দ্র যেই বলেছেন, 'আমি ছোটদের জন্য একটা খুব কম দামের পত্রিকা করছি, আপনাকে মহাভারত নিয়ে কমিক স্ট্রিপ করতে হবে।' ওমনি হাসি থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, বললেন, 'কাজটা তো আমারই, কিন্তু এখন আর অতটা সময় করতে পারব না।'

অমরেন্দ্র নাছোড়। গড়গড় করে বলে চললেন, 'মহাভারত নিয়ে ফিল্ম করার ইচ্ছের কথা আপনি একদিন বিশদে বলেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ওমর শরীফের কথাও ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার দর্শকদের কাছে মহাভারতের চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার সমস্যার কথা ভেবে মহাভারত নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা বাতিল করেন। এখন ছোটদের জন্য ধারাবাহিক মহাভারত চিত্রকথা সৃষ্টি হলে আপনার সেই মহাভারত অনুরাগ কিছুটা হলেও ধরা থাকবে। আপনার মহাভারত ছোটদের কমিক্সসাহিত্যে এক যুগান্তকারী ঘটনা হবে।'

সত্যজিৎ অমরেন্দ্রর কথা শুনতে শুনতে আগুন-তামাকহীন একটা পাইপ দাঁতে চেপে রেখেছিলেন, সেটা হাতে নিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'বিষয়টা আমার খুবই প্রিয়, কিন্তু এখন আর সম্ভব না।'

অমরেন্দ্র নিরস্ত হয়ে হঠাৎ বললেন, 'খালি পাইপ মুখে নিচ্ছেন কেন?'

'দীর্ঘদিনের অভ্যেস, ডাক্তারের নিষেধে ধূমপান বন্ধ করেছি, পাইপটা ছাড়তে পারিনি।'

আমার ছেলের বিয়েতে সত্যজিৎ স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূকে নিয়ে এসেছিলেন, বিয়ের ভোজ খেয়েছিলেন, এখন ভাবলে মনে হয় সে যেন এক ইতিহাসের ঘটনা। অথচ বিশপ লেফ্রয় রোডে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সেই হো-হো হাসি আজও আমার কানে বাজে।

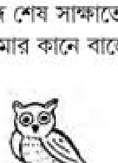

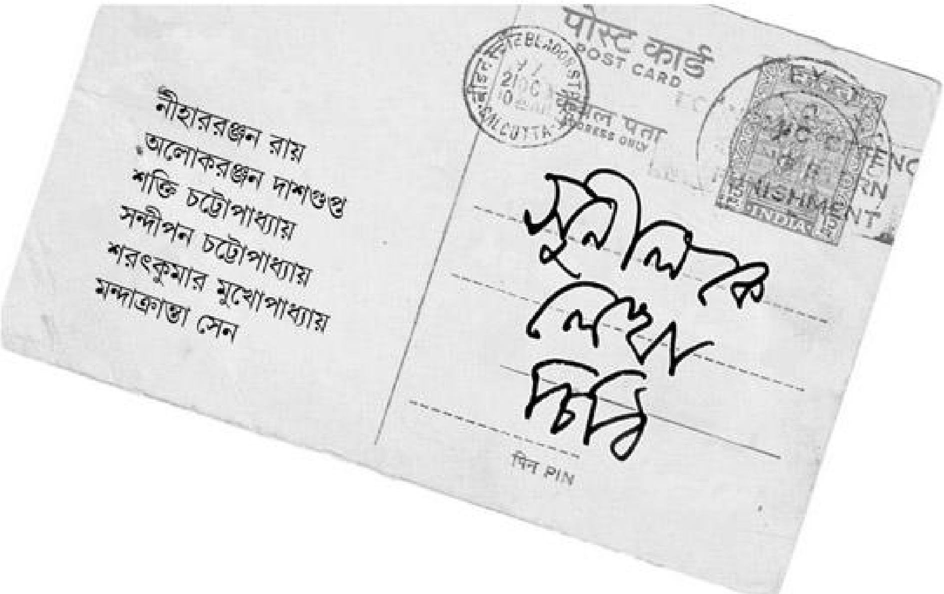

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা স্বনামখ্যাত বিভিন্ন গুণীজনের চিঠি এখানে কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হবে। ১৯৫৪ সাল থেকে অর্ধ শতকের অধিক কাল জুড়ে সুনীলকে লেখা বহু বিশিষ্টজনের এই পত্রগুচ্ছ পড়তে পড়তে আমার চোখে পড়ে গেল বাংলা সাহিত্যের বিস্ফোরক সময়ের বহুবর্ণ আঁকিবুকি, প্রায় যেন পাথরের ভাঁজে জীবাশ্মের মতো।
সদ্য প্রকাশিত বই থেকে চিঠিগুলি পুনঃপ্রকাশের সানন্দ সম্মতি জানিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রলেখকদের উদ্দেশেও। সব শেষে প্রকাশক গৌতম সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ। তাঁর উদ্যোগ ছাড়া একসঙ্গে এত চিঠি হয়তো দেখাই যেত না। —**সম্পাদক**

রবীন্দ্রনাথ এত মানুষকে এত চিঠি লিখেছেন, আমাকে কেন একটাও লেখেননি, এই নিয়ে আমার সামান্য মন খারাপ হত। অবশ্যই এটা সত্যি নয়, কথার কথা। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেতে হলে আমাকে আরও কুড়ি-তিরিশ বছর আগে জন্মাতে হত। কৈশোরের শেষে অপর কোনও কিশোরীর কাছ থেকে গোপন হাতচিঠি পেতে যেমন দুরুদুরু বুকে অপেক্ষায় থাকতে হয়, তেমনি পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গেও চিঠি লেখালেখির উত্তেজনা কম ছিল না। তখন ছিল চিঠির যুগ, কারণে তো বটেই, অকারণেও চিঠি লেখালেখি হত। বদলেয়ার তাঁর মাকে একদিনে ছ'খানা চিঠি লিখেছিলেন, লর্ড কার্জন নাকি তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন একটি একশো পাতার চিঠি, আর রবীন্দ্রনাথ তো সারা বিশ্বেই এ ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একবার আমাকে একটা ইনল্যান্ড লেটারের সবটা ভরিয়ে একটা চিঠি লেখার পর, তার ওপরেই আরেকটি পেন্সিলে অন্য চিঠি লেখে, এটাও বোধহয় এক ধরনের বিশ্ব রেকর্ড। আমেরিকার পল এঙ্গেল আমাকে বলেছিলেন, তিনি বছরে অন্তত তিন হাজার চিঠি লেখেন। অ্যালেন গিনসবার্গেরও যখন তখন চিঠি লেখার অভ্যেস ছিল।

এতগুলি বছরে বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পত্র-প্রাপ্তির সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তালপাতার শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত যখন আমাকে এইসব চিঠির সংকলন একটা পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন, তখন আমি প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করেছি। সব চিঠিই ব্যক্তিগত। তা ছাড়া, কিছু কিছু চিঠিতে আমার দুয়েকটি রচনা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি আছে, সেগুলি কি পাঠকদের কাছে প্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত? তারপর পুরনো চিঠিগুলি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি, অনেক চিঠির মর্ম আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এ সবের মধ্যে বিধৃত আছে বাংলা সাহিত্যের একটি পর্বের ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান। এ সব অবশ্যই রক্ষিত হওয়া দরকার।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কিছুদিন আগে আমাকে বললেন, আপনার যা স্বভাব চরিত্র, তাতে এসব চিঠি জমিয়ে রাখা তো আপনাকে মানায় না। মানুষের স্বভাবে তো অনেক বৈপরীত্যই থাকে। চিঠি পেলেই আমি তার উত্তর দিয়ে কিংবা না দিয়ে একটা বড় ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিতাম। এতদিন পর সেগুলি উদ্ধার করতে গিয়ে দেখি, বেশ কিছু হারিয়েও গেছে। অনেক সময় কোনও কোনও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক চেয়ে নিয়ে গেছে, তারপর মূল চিঠি আর ফেরত দেয়নি, সেই সব পত্রিকাও এলোমেলো হয়ে গেছে কী ভাবে যেন। যা আছে, তার চেয়েও হারিয়ে যাওয়া চিঠিগুলির জন্যই মন খারাপ লাগে।

বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি দিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর পাঠাতেন। একালে প্রবাসী রণজিৎ গুহও প্রায় তাই। সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার আপাতত পত্র বিনিময়ের কোনও কারণই নেই, আমরা দুই বৃত্তের মানুষ। একবার দেশ পত্রিকায় ফরাসি কবিতা বিষয়ক একটি রচনায় র‍্যাঁবো-র সঠিক উচ্চারণ কী হবে, তা নিয়ে টুকটাক মন্তব্য করেছিলাম। মুজতবা আলী সেটি পড়ে অত্যন্ত চটে যান, এবং তাঁর নিয়মিত কলমে লেখেন যে আজকাল ছেলে-

ছোকরারা দু'পাতা ফরাসি পড়েই জ্ঞান ঝাড়তে শুরু করে। এইসব পশ্চাৎপক্কদের... ইত্যাদি। তখন আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে জানালাম যে মাননীয় আলী সাহেব, আমি দু'পাতা ফরাসি পড়া দূরে থাক, এক পাতাও ভালো করে পড়িনি, লোকজনের মুখে মুখে শুনে শুনে যে-টুকু বিদ্যে। আমি র‍্যাঁবো উচ্চারণ সম্পর্কে ঐ সব লিখেছি, একটা মজার কারণে, 'দেশ' পত্রিকায় কেউ ভুল কিছু তথ্য লিখে পার পায় না, নানান পত্রলেখক খড়দা-এঁড়েদা'র মতন জায়গা থেকেও ভুল শুধরে দেন। এবারে দেবেন নিশ্চয়ই। আমি আপনার এতই ভক্ত যে আপনার বকুনিও আমার শিরোধার্য। এর উত্তরে উনি একেবারে স্নেহে বিগলিত ভাবে আমাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লেখেন (সেটি হারিয়ে গেছে), তারপর থেকে আমাদের পত্রালাপ চলতে থাকে, বহু ব্যক্তিগত ও বেদনাদায়ক ঘটনার কথাও লিখেছেন।

তবে, যে-সব চিঠি একান্তই ব্যক্তিগত, তা এখানে ছাপা হল না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

চাইবাসা/সিংভূম
সোমবার

প্রিয় সুনীল এখন তোমাকে চিঠি লিখতে ভালো লাগছে না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সোমবার দুপুরবেলা এখন। তুমি অফিসে রয়েছো। সমীর আমার উপরে তুলো নিচে তুলো রেখে অফিসে গেছে। আমিও এমন জায়গায় যেতে পারতাম হয়তো মন্দ লাগত না, কিন্তু গতকাল থেকে সচরাচরতার উপর ঘেন্না জমেছে। ধরো গতকাল এই স্যানাটোরিয়ামে ভয়ানক একা ছিলাম। কেননা সমীর গেছিল টুরে। গেছিল আগের দিন রাত্রিবেলা, এলো পরের দিন রাত্রিবেলা। এসে সোনার গল্প বললো। তুমি এলে আমরা মনোহরপুর প্রভৃতি জায়গায় যাবো। একা নিসর্গের আমেজ আমার লাগে না কেমন। তুমি আসবে আমি ঠিক ভাবতে পারছি না জানো। আমি তোমার যেহেতু উল্টো, আবেগপর্য্যুদস্ত সবসময়, যেহেতু তোমার এখানে আসার অর্থ-অনর্থ উভয়ই বুকে লাগছে। অভাবনীয় আনন্দ হবে। তোমার কাছে স্বীকার করা লজ্জাজনক কি যে আমি এখানে সামান্য প্রেমে লিপ্ত হ'য়ে পড়েছি। প্রেম একে তুমি অন্তত বলবে না, আমিও বলি না, তবে অঘটনটি মন্দ লাগছে না। বালিকা নির্বিশেষে আমার যেরূপ ভালো লাগতে আরম্ভ করেছিল কোলকাতায় তাতে যে সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করবো এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে? একদিকে দাড়ি বাড়ছে, মাঝে দুবার ছেঁটে ছিলাম, অন্যদিকে মাংসে বাড়ছে, স্তূপীকৃত আলস্যে; দুমণ আট ছটাকে দাঁড়াতে আমার বেশিদিন লাগবে না দেখো।

সমীরের সাথে তোমার পত্রবিনিময়ের বিষয় আমাকে জানানো হয়নি। সমীরকে তো তুমি চেনো; আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছি, টেলিগ্রামের কথা ভাবছি, ইতিমধ্যে যে তুমি আসতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছিলে তা আমাকে ও ঘুণাক্ষরেও বলেনি। ওর মত বদমায়েস কিন্তু আমি দেখিনি জীবনে।

তোমার চিঠিতে এখনও আমার বাড়ির বিষয় থাকে, আমি খুব পছন্দ করি নি জানো। এই কারণে নয় যে মাকে বা ভাইকে বা সাংসারিকতাকে আমি অপছন্দ করি। তা করা যায় না। মায়ের প্রতি আমার ভালোবাসা বরং অলৌকিক। আমি তাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, আর ওদের চিন্তা করার যেমন বিশেষ কারণ রইলো না, চাইবো, তুমি ঐকারণে পীড়িত হ'চ্ছো না। এই সব সামান্যে তোমায় পীড়া দেয় তা আমার অসহ্য। আমি কতগুলি সহজ, দিনানুদৈনিকতা নষ্ট করে ফেলি সম্পূর্ণ আলস্যে, তুমি হয়তো সেগুলোর জন্যে আমায় দোষী করবে। তুমি দোষী বললে তার মধ্যে সত্যতা অমান্য করবো না তবে আমি অপারগ। আমি অতো হিসেব করতে শিখিনি। মনে হয়না কখনো শিখে নেব। আমি যেমন আমি তেমন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তুমি বা তোমরা আমায় না ভালোবেসে পারবে না। কেননা ঐ ত্রুটিগুলোর কোনো অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার নয়। সত্যিই, চালাকি করছি না চুরিচামারি বা মিথ্যায় যে অপরাধ তা আমার কোনোমতে উপগত হ'তে চায় না। অথচ আমার বুদ্ধির দিকে বিশেষ ঘাটতি আছে ব'লে তো মনে হয় না। তোমার প্রতি আ-আলাপ নানাবিধ অন্যায় ক'রে চলেছি এবং পারিও দেখেছি। জানি তোমার মত আশ্রয় আমার নেই আর, তোমার মত আশ্রয় ঠিক সন্দীপ নয়, সমীরও নয়। কেননা তোমার প্রতি আঘাতসমূহের সামান্য একটিতে ওরা আমায় ঘৃণা করতো। এতৎসত্ত্বেও নিজেকে খুব ছোটো মনে হয় না, হয়না হয়ত তোমার সুব্যবহারে বা আমার পূর্বোক্ত অর্থরহিত স্মৃতির জন্যে। অথবা মৌলিকভাবে আমি কোনো ছোটো কাজ কখনো করতে পারি না। তুমি মাঝে মাঝে আমায় সাধারণ যোগবিয়োগে ফেলে দাও এই দুঃখ। আমায় সবসময় তা স্পর্শ করে না, কিন্তু তোমায় তা যে কোনো কারণে ভীষণ স্পর্শ করে। তোমার দুঃখ বাড়ে। ভালোবাসা প্রকাশ করা আমার হল না। তবু তোমার এই সকল দুঃখ না বাড়ার জন্যে আমি প্রাণপণ করছি সুনীল। তোমার প্রতি আমার কোনরূপ বাধা নেই বলেই আজ পরোক্ষে সামান্য হৃদয় নিক্ষেপ করলাম। কিছু মনে কোরো না। তোমার সঙ্গে এখানে যেদিন দেখা হবে সেদিন কিন্তু এইসব মালিন্য থাকবে না মনে। সেদিন চিৎকার ক'রে আহ্লাদ করবো। সন্দীপকে নিয়ে এসোই বিশেষ ক'রে। তোমার কবিতা স্থানে স্থানে সেই তিরস্কারের মতন লেগেছে। ছেলেমানুষের মতন লোভে আমার আর সমীরের কয়েকটা পদ্য পাঠালাম। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো আসছো। তোমার শক্তি।

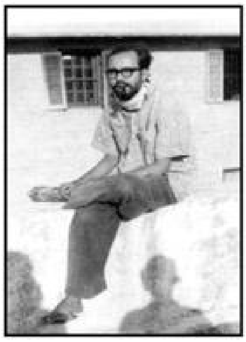

তোমার প্রতি আমার কোনরূপ বাধা নেই বলেই আজ পরোক্ষে সামান্য হৃদয় নিক্ষেপ করলাম। কিছু মনে কোরো না।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৩০/৩/৫৭

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার পত্র পেয়েছি। কৃত্তিবাস ও সোনার হরিণের[১] কাজ অগ্রসর হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হলেই ভাল। আপনার ব্যক্তিগত সাহায্য না পেলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থপ্রকাশ আদৌ সম্ভবপর হোতো না। প্রকাশিত হবার পর খরচপত্র দেখেশুনে দেশপত্রিকায় একটা ইঞ্চিতিনেকের বিজ্ঞাপন দেবার ইচ্ছা আছে। এবং আমার বর্তমান বাসভবনে একটি কবিতার বৈঠক।

আমার কবিতা আপনাকে মুগ্ধ করেছে লিখেছেন। কিন্তু আমার ধারণা, মুগ্ধ করবার মত প্রসাদগুণ আমার কবিতায় নেই। পূর্ববর্তী কোনো কোনো কবিতায় তেমন কিছু ইঙ্গিত থাকলেও ক্রমশঃ আমি তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। পরবর্তীকালে আমার কবিতা রসিক কবি ও পাঠকসমাজে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, বর্তমান দশকের

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে গভীর Frustration (বাংলা প্রতিশব্দ আছে?) প্রবেশ করেছে আমিও, স্বীকার করি, তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, এবং বুঝেছি আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও এই ব্যাধি থেকে আজ কারো নিস্তার নেই। যাঁরা মনে করেন শূদ্রশাসিতসমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে, তাঁদের কথা আমি বিশ্বাস করিনা, যেহেতু মানুষের জীবনেই শান্তি নেই। ঈশ্বরনির্ভরতায় যে শান্তি, সেটা মৃত্যুরই প্রতীক। ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয় থেকে আজ অবিশ্বাসে এসে উপনীত হয়েছি আমরা— অথচ মানুষের প্রতি একান্ত বিশ্বাসে স্থির হতে পারছি না।

মানুষের জীবনের স্বর্ণযুগ হোলো যৌবনকাল। এই সময়ে প্রতিটি মানসিক অভিজ্ঞতা গভীরভাবে দাগ কাটে, সুখদুঃখের অনুভব উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে তারায় প্রতিধ্বনিত হয়। অতএব জীবনে যখন Frustration, যৌবনে তখন অশেষ যন্ত্রণা। মানসবিশেষে এই অনিবার্য যন্ত্রণাই বেদনায় রূপান্তরিত হয়— বেদনা কবিতায়। এমনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়েই কি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসিজম্-এ আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় দেবযান লিখলেন, আর জীবনানন্দ দাশ লিখলেন— 'স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো!'?

আমার মনে হয়, এই তিনজনই পরাজিত হয়েছেন। নিরুপায় অসহায়তা নিয়ে আমাদের এই যন্ত্রণাকে শুধু স্বীকার নয়— উপভোগ করা উচিত, Suffer করা উচিত। তারপর সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠুক বা হলাহল, তাই পরিবেশন করতে হবে। অনুরূপ বেদনা থেকে যে-কবিতার জন্ম হয়, তা তো পীড়াদায়কই বটে,— লেখকের পক্ষেও, পাঠকের পক্ষেও। লেখকের পক্ষে— "It tears its way out of the brain, splintering and breaking its passage, and leaves that organ in the state of a jelly fish when the task is done."

আপনি লিখেছেন, মেয়েদের দ্বারা আর যাই হোক, কাব্যসৃষ্টি হয় না। কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও কথাটা ঠিক। অনেক অধিকার দাবী করলেও এটি ওদের নাগালের বাইরে। তার কারণ, আমার ধারণা, প্রেম সম্পর্কে মেয়েদের দারিদ্র্য ও হীনতা প্রায় সর্বজনীন। সম্যকভাবে প্রেমকে উপলব্ধি করতে না করতেই ওদের যে মাতৃত্বে উপনীত হতে হয়। তারপর, চাকরি করতে করতে লেখাপড়া করার মতো— পাশ করা হয়, কিন্তু শিক্ষালাভ হয় না। দ্বিতীয়ত, যে অপরিসীম বেদনা থেকে কবিতা উৎসারিত হয়, মেয়েদের সে-বেদনা বহন করার সামর্থ্য নেই। চট করে ওরা কেঁদে ফেলতে পারে। (আমরাও যদি পারতাম!) ওরা নিষ্ঠুর হতে পারে, নির্ভয় হতে পারে না। ওদের ভালবাসা যত না গভীর তার চেয়ে বেশি সংকীর্ণ। আমি হয়ত যে-গাছের ফুল নিয়ে কবিতা লিখছি, চোখ থাকলে দেখতে পেতাম সে-গাছের ফুলেরা পরস্পরকে ঈর্ষা করে। অথচ অনুরূপ একটি জীবকে নিয়ে পুরুষকে জীবন কাটাতে হয়, প্রকৃতির এ-এক নির্মম পরিহাস।

অনেক আজেবাজে কথা লিখলাম, ক্ষমা করবেন।

ইতি, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

১ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই, কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকেই বেরোয় ১৯৫৭ সালে।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

C/o রঞ্জিত ব্যানার্জি
২৪। ১৬ পাণ্ডে ঘাট। বারাণসী

প্রিয়বরেষু,

আজ ভোরবেলা, ১০ই জানুয়ারি আপনাকে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হল। যেমন ধরুন, কেন এলাম বেনারসে।

প্রথমে ঠিক করেছিলাম যদি মাসখানেকও এখানে থাকতে পারি, অন্তত আপনাকে কোনো চিঠি দেব না। কারণ চাঁইবাসা থেকে আসার রাস্তায় ট্রেনে মাঝরাত্তিরে আপনি বলেছিলেন, হাউ ডু ইউ নো? —যখন আমি অকারণে বললাম যে The ticket checker went out to take bribe. আপনার গলার স্বরের রূঢ়তা আমার গালে চড়ের মত লেগেছিল এবং তারপর দুদিন তার ব্যথা ছিল। দোষ আমার, ও-রকম silly মন্তব্য করা আমার উচিত হয়নি, বিশেষত মধ্যরাত্রে, যখন আদিবাসী যুবতীটির সঙ্গে যুবকোচিত কিছু করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি এবং সেজন্যে আপনি যখন আগে থেকেই বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমি সত্যিই অকারণে বলেছিলাম, এক একটা সময় মানুষ সম্পূর্ণ নিশ্চরিত্র হয়ে বসে থাকে, তখন সে কার্যকারণহীন যা-তা বলে, তার কোনো যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়ে তাকে সচেতন করে দেওয়াও অনুচিত। আপনার একটা ত্রুটি এই আমি দেখেছি যে তুচ্ছ ঘটনা, একটা উক্তি, কী বিশেষ স্বরে কোনো কথা বলা— এই শুনে আপনি মানুষটার চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা করে নেন, বা ধারণা পাল্টে ফেলেন। কেউ একটা ছোট কাজ করে ফেলল বা মহৎ কাজ, কারুর গলা থেকে অন্যধরণের একটা স্বর শোনা গেল, লোভের কী উদাসীনতার, আপনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আমার ধারণা ছিল না লোকটা এই রকম।' উদাহরণ আছে, কিন্তু আশা করি এ-পর্যন্ত আপনি আপত্তি করছেন না। যদি করেন, আমি তা অগ্রাহ্য করব। যদি আপত্তি না করেন তা হলে বলব নিজের ওপর এতটা আস্থা রাখা আপনার ঠিক নয়, আপনার যাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় আমরা এবং অন্যান্যরা তাদের অনেকেরই এতটা অনাস্থা প্রাপ্য নয়। ছোটখাট ব্যাপার থেকে কী করে বুঝবেন? কারণ যদি ধরেই নিই যে প্রতীক চেনবার অভিজ্ঞতা আপনার আছে—তাহলেও আসল ব্যাপার তো এই আমি জানি যে ছোটখাট যা দেখছি এ-সবই সমগ্র-কিছুর একটা ভাঙা টুকরো। যেমন একটা কাগজ ইচ্ছেমত ছিঁড়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে— আমি জানি বহু পরিশ্রম, বিনয় ও ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলি খুঁজতে হবে— যদি টুকরো জোড়া দিয়ে সেই লেখা কাগজের পাতাটার পুরো চেহারা আমাদের পাবার দরকার থাকে। দু-চারটে টুকরো পেলে যে-ভাবে ছেঁড়া হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে জোড়া দেওয়া যাবে কি? একটা ধাঁধার মত হয়ে যাবে তাহলে, মিথ্যে বানিয়ে নেবার দুর্বলতায় কেন যাব, যদি কিছুদিন অপেক্ষা করলে, বিনয় থাকলে, পুরোপাতাটা জোড়া লাগানোর সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়া তুচ্ছ ঘটনা থেকে কী করেই বা সব বুঝেছি বলতে পারি? প্রথমত এ ঔদ্ধত্য অর্থাৎ প্রকৃত বালখিল্যতা। দ্বিতীয়ত এটাই বা কেন জানা থাকবে না যে একটা তুচ্ছ ঘটনায় সব জেনে ফেললাম ভেবে নিলে, পরবর্তী তুচ্ছ ঘটনা যা সেই আগের সামান্যতাকে মিথ্যে প্রমাণ করত— তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আরো তুচ্ছ ঘটনা সব আসত, কিছু কালহরণ করতে পারলে সমস্ত জানা একটা অলীক ধাঁধা

সুনীলবাবু, বন্ধুত্ব এক অভিসম্পাত কিনা ভেবে দেখুন, সময় যা শরীর ও মনে লাগিয়ে দেয়! ... আজ দেখছি **সময়** এ আমার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে।

হয়ে যেত, কোনো দিন সেই প্রথম তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে যে জানার সুরু তা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারত। কারণ আজকাল যা পাওয়া যায় তা প্রতীক ভাবলে ভুল, নিছক টুকরো ছাড়া সেগুলি কিছু না।

ভোরে কয়েকলাইন কী লিখেছিলাম, মাঝরাতে আবার সুরু করেছি লিখতে খুব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। হাতের লেখা ও ভাষা কত খারাপ হচ্ছে— অর্থাৎ খুবই আন্তরিকতা এসে গিয়েছে। সুনীলবাবু, বন্ধুত্ব এক অভিসম্পাত কিনা ভেবে দেখুন, সময় যা শরীর ও মনে লাগিয়ে দেয়! আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হল, যতদিন কথাবার্তা বললাম, কোনোদিনই বুঝতে পারলাম না কি করে যে বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে— কাজেই সাবধান হয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠেনি— কিন্তু আজ দেখছি সময় এ আমার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে। বেশ বোকার মত লাগে তাই। কবে কী হল জানা গেল না অথচ মিশতে মিশতে যা ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি তাই হয়ে গেল।

আপনি যে মাঝেমাঝে আমাকে আহত করেন, এটা আপনিও কেন ভেবে দেখেন না, কেনই বা আমাকে তা বলে দিতে হবে— যে— যে-সব প্রত্যক্ষ সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই— আপনি সে-অবস্থায় থাকলে কী এর চেয়ে ভালভাবে থাকতে পারতেন। সীমাবদ্ধতা বলতে আমি আমার কথা বিশেষভাবে বলছি— কারণ আমার ভাগ্যহীনতা চক্ষুরুন্মীলন মাত্রই দেখা যায়। আমার চরিত্র খুব সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর তাকে দেখতে, কিন্তু চোখ খুললেই যদি কিছু দেখা যায়— মানুষ সে-বিষয়ে সাধারণত তার বেশি পরিশ্রম করতে চায় না। আমি অসুস্থতার ভয় এত বেশি কেন করি? কারণ এই নয় যে ভোগ থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমার কৃশ বুক, কিন্তু রূপবান অসুস্থ হলে আমি তা মেনে নিতে পারতাম। বলিষ্ঠ ও সক্ষম উদাসীনতাও আমার প্রিয়। যেমন আপনি। কিন্তু আমি কোনটাই নই, কাজেই এ-অবস্থা আমি মেনে নেব কী করে? তাই আমি নিজেকে চাঁইবাসায় ওঁরাও পল্লীতে এত assert করি, হুকুম করি, বাসের বালিকামহলে বেল্ট ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। কেন মদ খাই, বেশ্যার কাছে যাই কী জন্যে— সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আছে কিছু? সকলেরই থাকা উচিত, প্রতিটি সুস্থ সাধারণ মানুষের, সক্ষম উদাসীন বা রূপবান অসুস্থের— কারণ এদের কেউই রেস্তরাঁর এক ওয়েটার যখন সামান্যকারণে, বিনাকারণে অমানুষিক অপমান করেছিল তখন সে (যাকে ভবিষ্যতে সেই রেস্তরাঁতে আমি কোনদিনই চিনতে পারিনি) ও আমি ছাড়া তখন অন্যান্যরা কেউই সেই অপমানের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়নি। প্রকৃত নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা আমার তার আগে হয়নি।

কলকাতায় আমি ভয়ানক চক্ষুরুন্মীলন দেখছিলাম। চাঁইবাসায় খুব কাছাকাছি থাকাটা আপনার সঙ্গে, আমার অন্যায় হয়েছিল; অর্থাৎ বুদ্ধিমানের মত হয়নি। ট্রেনের মন্তব্য নির্বোধের মত হয়েছিল, বাসের বালিকামহলে আমি প্রম্পটারের গলা কিছুক্ষণের জন্য শুনতে পাইনি, ট্রেনেও, আমার দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়গুলিতে অতি কাছে একজন দর্শক ছিল।

যাক। ছেড়ে দিই সব। বেনারসের প্রস্তুতি যেন কলকাতায় কাজে লাগে, যেন সকলের সঙ্গেই কম দেখাসাক্ষাৎ হয়। আপনি তো যাবেনই না, কিন্তু প্রতিদিন বা প্রায়ই অফিসে যেতে আমি বাধ্য বলে, অনেকে যেন সে সুযোগ না নেয়— বন্ধু হিসেবে যতটা পারেন সেদিকটা সামলাবেন, এও আশা করি।

যা দেখা যায়— appearance-এর সুযোগ নিয়ে তো বড় কিছু করা যায় না— এই নিশ্চিত ধারণাও আমার জীবন আমাকে দিয়েছে। appearance-এর ঔদ্ধত্য দিয়ে কিছুই হয় না। প্রকৃত উদাসীন সে-ই, যে ভিড়ের মধ্যেও চুপচাপ থাকে—তাকে দেখার মত নয় বলে কেউ দেখে না— কাজেই সে যখন উঠে চলে যায়, কেউই লক্ষ্য করে না। অথচ সেটাই সবচেয়ে বড় যাওয়া। যাওয়া বলতে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের মরে-যাওয়া না, এ হ'ল উঠে নিজের জায়গায় চলে যাওয়া।

আর কী লিখব। কি লিখেছি। বোধহয় Silly কিছু লিখিনি।

চিঠির উত্তর দেবেন। শক্তি নিশ্চয়ই ফিরছে। শক্তির বিষয়ে আমার মানবের[১] সঙ্গে ও আপনার-আমার সকলের সঙ্গে সবকিছু আলোচনা করা উচিত হয়নি। দেবেশের[২] সামনে আপনি আপনার চরিত্রবিরুদ্ধ ওইরকম করলেন কেন? বাসে, ট্রেনে বা চাঁইবাসায় যাই হয়ে থাক, আপনি ছিলেন বলেই হয়েছিল, দেবেশ থাকলে বা দীপেন[৩] থাকলেও আমার দিক থেকে অন্তত কোনো ভুলই হত না। জনসেবকের চাকরি করছেন কি ইতিমধ্যে। ওটা নেওয়া উচিত হবে কি না সে-বিষয়ে খানিকটা ভাবার সত্যিই আছে। যদিও প্রথমদিকে অন্যরকম বলেছিলাম। আচ্ছা, কলকাতায় কি কেউ আত্মহত্যা করেছে?

প্রীতিসহ, সন্দীপন।

১ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক।
২ দেবেশ রায়, ঔপন্যাসিক।
৩ দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পলেখক।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর চিঠি

৫. ১১. ৫৪

সুনীলবাবু,

আপনার চিঠি পেয়ে বিশেষ খুশি হয়েছি। যে-উপলক্ষ্যই তার রচিত হবার উৎস হোক না কেন, খুশি হয়ে ওঠবার মতো প্রসাদগুণ আপনার চিঠিতে আছে।

আপনি যদি দয়া করে শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাছ থেকে বুদ্ধদেব বসুর বইটি নিয়ে যান তাহলে অত্যন্ত ভালো হয়। বইটা এখানে রেখে যাবো। আমি আজকালের মধ্যেই শান্তিনিকেতন যাচ্ছি— হয়তো দুয়েক দিনের বেশি থাকবোনা। তবু ফিরে এসে বইটি দিলে ভবিষ্যতে আপনি আর আমার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করবেন কিনা সন্দেহ। এর ভিতরে আমার কোনোক্রমেই কফি-হাউসে যাবার উপায় নেই— তবু সে-চেষ্টা যে করবোনা এমন নয়। বইটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

'কৃত্তিবাসে' আপনি 'রুক্ষ মন্তব্য' করেছেন— এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।[১] আমার নিজের ধারণা আমার লেখায় ভালো লাগবার সম্ভাবনা তো নেই-ই, উপরন্তু বেশির ভাগ সময়েই বীক্ষা ও বাণীর[২] পারস্পরিক অপ্রীতির ফলে তা অসহ্য বলে মনে হয়।

আপনাদের কুশল কামনা করি। প্রীতি বহন করবেন। বন্ধুদের দেবেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

১ চতুর্থ-পঞ্চম (১৩৬১) সংকলনে 'কৃত্তিবাসের এক বছর' লেখাটিতে অলোকরঞ্জন বিষয়ে এ-রকম দু-একটি মন্তব্য ছিল: 'মিষ্টিসিজম খাঁটি কবিতার শত্রু' 'প্রেমের কবিতায় আরেকটু যৌবনের উত্তাপ থাকলে অধিক তৃপ্তি পেতুম'। এগুলিই ছিল, 'রুক্ষ মন্তব্য'।

২ একথাও ছিল যে 'বীক্ষা ও বাণীর মধ্যে সার্থক সমাহার— তরুণ কবিদের মধ্যে অলোকরঞ্জন সবচেয়ে বেশী করতে পেরেছেন'।

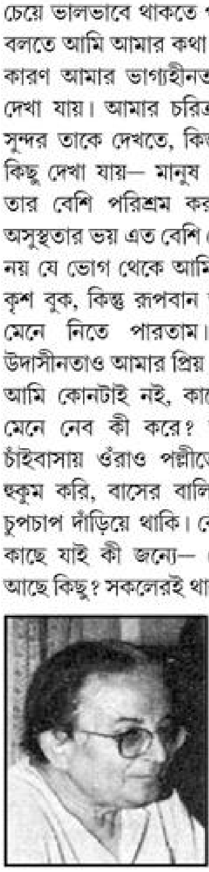

আমার লেখায় ভালো লাগবার
সম্ভাবনা তো নেই-ই, উপরন্তু
...তা অসহ্য বলে মনে হয়।

মন্দাক্রান্তা সেনের চিঠি

প্রিয় সুনীলদা, গভীর শ্রদ্ধাস্পদেষু;

আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে। গতকালও হয়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও চিঠি লিখছি। আপনাকে একদিন বলেছিলাম মাঝে মাঝে আপনাকে চিঠি লিখব। সেটা অন্যরকম চিঠি। সংশয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে, ভেসে উঠতে চেয়ে, মানুষ যেমন নিজের সঙ্গে আর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে, তেমনি কিছু সংলাপ। আজ আমার অন্য কিছু বলার রয়েছে। অথচ, আমার মনে হয় সাক্ষাতে সেসব বলতে গেলে আমি গুলিয়ে ফেলতে পারি। তাছাড়া, আপনাকে বিরক্ত করতে পারি, নষ্ট করে ফেলতে পারি আপনার সময়। চিঠি লিখলে, সেটা যদি আপনি দয়া করে আপনার সুবিধামতো সময়ে একটু পড়ে দেখেন, তাহলে ওইসব আশঙ্কার থেকে খানিকটা বাঁচা যায় বৈকি!

সুনীলদা আমরা (আমি আর শ্রীজাত) মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা লিখেছি। আশ্চর্য! আমরা জানতাম এই ছন্দে আমরা আগেও লিখেছি। শুধু আমরাই বা কেন! এই ছন্দে আমাদের আগে অনেকেই তো লিখেছেন। কিন্তু, সেই ছন্দ, যাকে 'মন্দাক্রান্তা' বলে জেনে এসেছি এতদিন আমরা এবং অনেকে, তা সঠিক অর্থে 'মন্দাক্রান্তা' নয়। আমরা বাংলার 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ বলতে যা শিখেছি তা হল চারটি পর্বে বিন্যস্ত একেকটি পংক্তি যার মাত্রাবিভাগ হল আট, সাত, সাত, পাঁচ। বাংলায় মন্দাক্রান্তা বলতে এই ছন্দরূপটিই প্রচলিত। এর প্রথমপর্বটি আটমাত্রা না সাতমাত্রা তা নিয়েও কেমন যেন অস্পষ্টতা দেখেছি। একজায়গায় জানলাম আট, অন্য একজন বললেন সাত। যা হোক, এত ভেবে হবেই বা কী! কবিতা কীভাবে কবিতা হয় সেটা বোধহয় একটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু, যেটা জানলাম তা হল একটা প্রচলিত ভুল ধারণার কথা। জানলাম, যাকে মন্দাক্রান্তা ব'লে জেনে এসেছি তা আসলে মন্দাক্রান্তা নয়। মন্দাক্রান্তা আসলে অন্য কিছু!

আমাদের এক বন্ধু আছে, তার নাম সন্দীপন চক্রবর্তী। কবিতা লেখে, বাংলা ভাষার ছাত্র। কবি শ্রী শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে ওর একটা যোগাযোগ আছে। ও-ই আমাদের, আমাকে ও শ্রীজাতকে শঙ্খবাবুর কাছে নিয়ে যায়। দুয়েকটি রবিবার আমরা ওঁর বাড়িতে সকালবেলা গিয়েছি। তেমনই এক রবিবার, সন্দীপন শঙ্খবাবুর সামনে 'মন্দাক্রান্তা' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। ওর বক্তব্য ছিল, আমার দু'টি কবিতা, যা অন্যেরা বলেন ব'লে আমিও বলি মন্দাক্রান্তায় লেখা (আমার নিজের ছন্দবিষয়ে আলাদা কোনওই জ্ঞান বা সচেতনতা নেই) তা আসলে মোটেই মন্দাক্রান্তা নয়। ও আগেই শঙ্খবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিল। সত্যি কথা স্বীকার করি, সন্দীপনের কথায় আমি মনেমনে খুব বিরক্তিবোধ করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল— কচকচি। মনে হয়েছিল, ছন্দের নামে কী আসে যায়! মন্দাক্রান্তা না হয়ে অন্য কোনও ছন্দ হোক, হোক পরিপূর্ণ ছন্দোহীনতা— কবিতাটা কবিতা হল কি না সেইটাই তো একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। আমি ওকে বললাম: ''আচ্ছা বেশ। তুই বলছিস ওগুলো মন্দাক্রান্তা হয়নি। না হোক। আমার কিছু যায় আসে না। আমি মন্দাক্রান্তা লিখিনি, মানলাম। কবিতা লিখেছি, তুই বল কবিতা হয়েছে কি না?''

ও কিছু বলার আগেই শঙ্খবাবু বললেন: ''না, শোনো। তোমার নাম যেহেতু মন্দাক্রান্তা, তোমার অন্তত জানা উচিত ছন্দটি আসলে কেমন, আসলে কী। একটা ভুল ধারণা নিয়ে চলছ— তুমি একা নও, অনেকেই। ধারণাটা ভাঙবে না কেন! যে-কোনও বিষয়ই তো, জানলে, যথাযথ জানা উচিত। এক্ষেত্রে তোমার তো আপত্তি থাকবার কথা নয়।'' আমি মাথা নিচু করে মেনে নিলাম। এরপরে উনি আমাদের বোঝালেন। সংস্কৃতে মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রতিটি পর্বে দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বস্বরের বিন্যাস বোঝালেন। শুনলাম, যেহেতু বাংলায় সংস্কৃতের মত দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বস্বরের স্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ হয় না, যেহেতু এই সংস্কৃত ছন্দটির বাংলাভাষায় হুবহু প্রতিরূপ নির্মাণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন কবি শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বলেছিলেন, যদি বাংলায় দীর্ঘস্বরের স্থানে রুদ্ধদল এবং হ্রস্বস্বরের স্থানে মুক্তদল ব্যবহার করা যায়, তবে বাংলাভাষাতেও মন্দাক্রান্তার প্রতিরূপ নিয়ে আসা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে, বাংলাভাষায় মন্দাক্রান্তার রূপ হবে এমন:

প্রথম আটমাত্রার দলবিন্যাস
— রুদ্ধ রুদ্ধ রুদ্ধ রুদ্ধ
দ্বিতীয় সাতমাত্রার দলবিন্যাস
— মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত [মুক্ত] রুদ্ধ
তৃতীয় সাতমাত্রার দলবিন্যাস
— রুদ্ধ মুক্ত রুদ্ধ রুদ্ধ
শেষ বা চতুর্থ পাঁচমাত্রার দলবিন্যাস — মুক্ত রুদ্ধ রুদ্ধ

নমুনাস্বরূপ তিনি লিখলেন 'যক্ষের নিবেদন'— চঞ্চল খঞ্জন নয়না নারীগণ
বর্ষামঙ্গল করুক গান
বর্ষার সৌরভ বলাকা কলরব নিত্য
উৎসব ভরুক প্রাণ॥

এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ দলবিন্যাস বজায় রেখে যে লেখা হবে, তাকেই যথাযথ 'মন্দাক্রান্তা' বলা হবে। কিন্তু শঙ্খবাবু বললেন যে বাংলাদেশে 'মন্দাক্রান্তা'র সার্থক প্রয়োগ এখনও সম্ভব হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যা করেছেন তা একটি নমুনাস্বরূপই। সার্থক কবিতা তাকে বলা যাবে না। আসলে বাংলাভাষার যে চলনরীতি, তাতে বোধহয় এমন syllable সাজিয়ে পরপর পংক্তি লিখে তাকে সার্থক কবিতায় পরিণত করা সম্ভবই নয়। লিখতে গেলে তা ব্যায়াম হয়ে যায়, হয়ে যায় কসরৎ। সহজসুন্দর স্বাভাবিক কাব্যে তার উত্তরণ ঘটানো প্রায় অসম্ভব।

একথা জানার পর আমরা বাড়ি ফিরি। এবং মাথায় তখন আর কিছু কাজ করছিল না। শুধু ওই ছন্দ, ওই চলন। আর বোধহয় একটা জেদ— কেন বাংলাভাষাতে অসম্ভব ব'লে কিছু থাকবে! চেষ্টা করে কি দেখা যায় না! নিশ্চয়ই যায়। আমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাই। আর তারপর মাথায় স্রোতের মত আসতে থাকে একের পর এক পংক্তি। ওই মন্দাক্রান্তায় যাদের গঠন। মাথার মধ্যে সদ্য শেখা ছন্দের প্রবল তোলপাড় নিয়ে আমরা লিখতে বসি। কী বিস্ময়! কেন এই অসামান্য ছন্দে বাংলাভাষায় এতদিন লেখা হয়নি! নাকি, আমাদের কোন ভুল হচ্ছে কোথাও? আবার এক সপ্তাহের অপেক্ষা, মধ্যে সন্দীপনের সঙ্গে

আর শঙ্খবাবু লেখা দেখছেন।... দেখা শেষ হল। উনি মুখ তুললেন। বললেন: ''চমৎকার, ছন্দ ঠিক আছে। কবিতা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।''

দেখা। তখন আমি আর শ্রীজাত পাগলের মতো লিখে চলেছি একের পর এক, মন্দাক্রান্তায়। যা শুনছি তাই মন্দাক্রান্তা— সারা সংসারে কী প্রবলভাবে এই ছন্দ ছড়িয়ে আছে তা আমরা আগে জানতাম না! আমরা কথা বলছি পরস্পরের সঙ্গে— তাও মন্দাক্রান্তায়। তখন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আজহারউদ্দিনের ভারত পরপর দু'দিন হেরেছে। আমরা আশা ছেড়েও ছাড়তে পারছি না। তারপর ভারত দারুণভাবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জিতে লড়াইয়ে ফিরে এল। আমরা বললাম:

আজ হার। কাল জিৎ। এটাতো অনুচিত,
হারব আমরাই জীবনভোর!
আজ নয় হারলাম। হারিয়ে দেব কাল। কাল
আমার জিৎ। এখন তোর।

সন্দীপন দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল, বাংলাভাষায় কিছুতেই মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা সম্ভব নয়। ও প্রথমে পাগলের মতো দল-মাত্রা— এইসব হিসেব করল। তারপর হতভম্বের মতো বসে রইল। তারপর ভিড়ে গেল আমাদের দলে। আমরা তিনবন্ধু মন্দাক্রান্তায় কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগলাম শহরের পথে পথে। বাসে উঠে বললাম:

ভাই কন্ডাক্টর, টাকাটা নিয়ে নিন। নামবো সামনেই। টিকিট দিন।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভীষণ অবিশ্বাস, ভয়। যে ছন্দে এত সহজে কথা বলা যাচ্ছে, লেখা যাচ্ছে কবিতার পর কবিতা, সেই ছন্দ এতদিন এমন অবহেলিত, বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল একপাশে, মৃত এক ভাষার চোরকুঠুরিতে সে ছিল নির্বাসিত হয়ে এত এত যুগ! কেন কেউ লেখেননি! আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। কী সুন্দর চলন, কী অপূর্ব ধ্বনি! আর ওই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মনীতি? সে তো কোনও শৃঙ্খল, কোনও বন্ধন নয়! বরং সেই তো বাধ্য করছে অমোঘতম, অনিবার্যতম, শব্দচয়নে, যখন যেখানে যে শব্দটির বিকল্প নেই, ঘাড় ধরে তাকেই তো লিখিয়ে নিচ্ছে সে, বারবার, আগাগোড়া। এতো আরও সহজ বন্দোবস্ত! পরের রবিবার দুরুদুরু বক্ষে আমরা গেলাম শঙ্খবাবুর বাড়িতে, লেখাপত্তর নিয়ে। নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়েছে আমাদের, খুঁত থেকে গেছে লেখায়...এই সমস্ত ভাবছি, আর শঙ্খবাবু লেখা দেখছেন।... দেখা শেষ হল। উনি মুখ তুললেন। বললেন: "চমৎকার, ছন্দ ঠিক আছে। কবিতা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।" সুনীলদা, অন্য পরিস্থিতি হলে কি এমন করে বলতে পারতাম কাউকে, আপনাকে কি লিখতে পারতাম এসব কথা! শঙ্খবাবু যদি আমাদের প্রশংসা করতেন, সে আমাদের অসামান্য প্রাপ্তি— কিন্তু তাও হয়তো অহঙ্কার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে এমনি করে জানাতে পারতাম না। কিন্তু ওই প্রশংসা তো বর্তাল বাংলাভাষার ওপরে! এতদিন সবাই জানত বাংলাভাষা পারে না মন্দাক্রান্তা ছন্দে সার্থক কবিতা লিখতে, আজ জানল— পারে। পারে পারে পারে। 'আমরা পেরেছি' নয়, 'বাংলাভাষা পেরেছে।' শঙ্খবাবু সেইটাকেই বলেছেন 'ইতিহাস'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মহৎ মেধা শ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে একটা বিরাট ভারী সিংহদরজা খুলে দিয়ে গেছেন সবর্শক্তি নিঃশেষ ক'রে। একা। তাঁর কৃতিত্বের তুলনা নেই। কিন্তু সেই উন্মুক্ত দরজার ওপাশে যে পথ, সেই পথে হাঁটার জন্য বাংলাভাষাকে যে এতকাল অপেক্ষা করতে হল সে ভারী বিস্ময়ের। যথাযথ, ক্লাসিকাল মন্দাক্রান্তার ধ্বনির ও চলনের মহিমার ভার বাংলাভাষা বহন করতে পারবে না এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ায় বোধহয় সে পথে কেউ পা-ই বাড়াননি। অথবা উল্টোটাও সত্যি হতে পারে। কিন্তু, এবার সে পথে নামা গেল। এখন, অনেকের, একসঙ্গে, এই পথে, এই নতুন বিরাট সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে যাত্রা শুরু করা উচিত। যে অনেকটা হেঁটে দূরে পৌঁছতে চায় সে পৌঁছক, কিংবা কেউ যদি দুদিনের জন্যেও বেড়াতে চায় বেড়াক— কিন্তু পথ খুলে গেছে। এইটাই আমরা সব্বাইকে জানাতে চাই। সুনীলদা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

আমি কবি শ্রী জয় গোস্বামীর কাছে কবিতাগুলি রেখে এসেছি। শ্রীজাতর কিছু কবিতাও আছে ওঁর কাছে। হয়তো সেগুলির মধ্যে কিছু দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সুনীলদা, আমরা চাই, কবিতাগুলি যদি প্রকাশিত হয়, তবে যেন পাঠকদের কাছে তাদের এই তাৎপর্য্যটুকুও পৌঁছে দেওয়া হয়। তাঁরা যেন অবহিত হোন যে আজ এতদিন পর আমাদের প্রাচীনতম এক ছন্দে বাংলা কবিতা লেখা নতুন ক'রে সম্ভব হল। এবং এবার থেকে হতেই থাকবে। আমাদের ভাষা আরও এগোবে, তার পক্ষে অসম্ভব সবকিছু ক্রমশ সম্ভব হয়ে আসতে থাকবে। আমাদের ভাষার এই সাফল্যের আনন্দসংবাদটি সব্বার কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও কি 'দেশ' এর মতো সাহিত্যপত্রিকারই নয়?[১]

অ-নে-ক অ-নে-ক আশা নিয়ে বাংলাভাষার তরফ থেকে বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক— আপনার কাছে এই আর্জি পেশ করলাম। স্পর্ধার পরিচয় দিয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন, সুনীলদা। আমার স-ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।
মন্দাক্রান্তা সেন।

১ বেশ কয়েকটি কবিতা একসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি

১৭ই জানুয়ারি ১৯৫৪

শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২৮ ও ২৯শে জানুয়ারি কলকাতা সেনেট হলে একটি কবি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আধুনিকপন্থী কবিরা এই সম্মেলনে তাঁদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। আপনাকে আমরা এই সম্মেলনে যোগ দিতে সাদরে আহ্বান করছি। প্রতিদিন প্রায় দুঘণ্টার অনুষ্ঠান।[১] প্রত্যেক কবির জন্য অনূর্ধ্ব তিন মিনিট সময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিন সম্মেলন শুরু হবে বিকাল ৫-৩০ মিনিটে। আশা করি আপনি আমাদের এই আহ্বানে সাড়া দেবেন। আপনার লেখা নিম্নলিখিত কবিতা আমাদের বিশেষ প্রিয়। সম্ভব হলে এই কবিতাটি আবৃত্তি করা যায় কিনা আপনি বিবেচনা করবেন।

আপনার সম্মতিসূচক উত্তরের প্রত্যাশা করি। যথাসম্ভব ফেরত ডাকেই দয়া করে আমাদের লিখে জানাবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে
কবি সম্মেলনের পক্ষে
নীহাররঞ্জন রায়

কবিতার নাম
(কোন কবিতা পাঠ করবেন সেটা দয়া করে জানাবেন)

পুনশ্চ: অনুগ্রহ করে সেনেটহলের মঞ্চে আপনার আসনগ্রহণ করবেন।

১ জীবনানন্দ দিয়ে শুরু। আমি ছিলাম তরুণতম। এর আগে সম্মেলন তো দূরের কথা, মাইকের সামনেই যাইনি কখনো। তাই টেনশন তো ছিলই। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিল দিলীপকুমার গুপ্ত, মানে ডি. কে.। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ভালোভাবে রিহার্সেল করিয়েছিলেন। বিশেষ করে মাইকে বলতে গেলে কতটা মুখ সরাতে হবে ইত্যাদি। ফলে নার্ভাসনেসটা কেটে গিয়েছিল। দুটো কবিতা পড়েছিলাম। শ্রোতারা হাততালিই দিয়েছিলেন, সরিয়ে তো দেননি।'কৃত্তিবাস' পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে (১৩৬১) এই সম্মেলনের পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী একটা প্রতিবেদন লিখেছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

বানান অপরিবর্তিত

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যের আড্ডায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেলস কাউন্টার বলতে রাস্তার ওপর দশ ফুট বাই বারো ফুটের একটা ঘর। সামনের দুটো দরজার সামনে দুটো বড় টেবিল পাশাপাশি রাখা। দরজার সামনে ক্রেতারা এসে দাঁড়ান তাঁদের চাহিদা মতো বইয়ের ফর্দ নিয়ে। ঘরের ভেতর টেবিলের উল্টোদিকে দুটো চেয়ার, দুটো টুল। ঘরের ভেতর দেওয়াল ঘেঁষে র‍্যাক, আলমারি। সব বইয়ে ভর্তি। র‍্যাক আলমারির সামনে টুল ও একটা বেঞ্চি। বেঞ্চিটি এককালের প্রখ্যাত সাময়িক পত্রিকা 'যমুনার' অফিস থেকে কেনা। শোনা যায়, এটাতেই শরৎচন্দ্র যমুনা অফিসে গেলে বসতেন।

এসব র‍্যাক আলমারি চেয়ার টেবিলের ভিড়ে বইয়ের দোকানের ভেতরের জায়গা আরও সঙ্কীর্ণ। তবে তাতে লেখক কবি ও সাহিত্যামোদীদের আড্ডা ব্যাহত হয় না। বরং আড্ডার প্রতাপে বেচাকেনার কাজই গুছিয়ে করা মুশকিল হয়ে ওঠে। একদিকের দরজায় কাউন্টারের ওপরেই বসে পড়েছেন কবিশেখর কালিদাস রায়। আরেকটু জায়গা করে নিয়েছেন তার পাশে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভেতরে একটি বেতের চেয়ারে কোণের দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পাশে একে একে বসে আছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, কৃষ্ণদয়াল বসু, আরও একজন-দুজন, কেউ টুলে কেউ বেঞ্চিতে, কেউ বা মাটিতে রাখা বইয়ের ওপর। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, তেঁতুল পাতায় ন'জন জানতাম, এটুকু ঘরে আঠারোজন ভাবা যায়!

এতক্ষণে পাঠকেরা নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন এটি বইপাড়ার একটা প্রকাশনের কর্মস্থল। পঞ্চাশের দশকে এমনই ছিল বইপাড়ার সাহিত্য প্রকাশনের দোকান কাম অফিস। সবই এই ঘরে, কেনা-বেচা, নতুন বই-টইয়ের পরিকল্পনা, সমস্তই। সুনীতিবাবু আড্ডার মধ্যেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ মশাই, আড্ডা চলছে, মুড়ি কই?

সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি বেগুনি ডালমুটের ফরমাশ হল। কবিশেখর কালিদাস বলে উঠলেন, ওরে বলে দে, ডালমুটে বাদাম যেন প্রিডমিনেট করে, ওরা বাদাম বড় কম দেয় ডালমুটে।

সুনীতিবাবু এক থাবায় মুড়ি, আর এক হাতে বেগুনি তুলছেন। কে বলবে তখন ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রধান অধ্যাপক। তাঁর পদটির নাম ছিল খয়রা অধ্যাপক, খয়রা মহারাজের টাকায় বা ডোনেশনে এই বিভাগটি চলত। সুনীতিবাবুকে বিভূতিবাবু হঠাৎই বলে উঠলেন, সুনীতিবাবু ওই গ্রিক কবিতাটি বলবেন? আপনার মুখে বেশ শোনায়।

সুনীতিবাবু বললেন, এটা আপনাকে প্রায় পেয়ে বসেছে!

সুনীতিবাবু সেই বিক্রিবাটা ও আড্ডার মধ্যেই গ্রিক নাটকের ছত্রটি আবৃত্তি করলেন— ও গেস ও খেমা, কাপি গেস এ

বিভূতিভূষণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, রমাদেবীকে, ১৯৪০ সালে।

খোন হেদ রান ...। এর ইংরিজি প্রতিবর্ণীকরণ এরকম— o ges okhema, kapi ges ekhon hedran...

এই ছত্র কটি ঈশ্বরের প্রতি একটি নিবেদন। অন্তর্নিহিত অর্থ হল— তুমি পৃথিবীকে বহন করে আছ, আর পৃথিবীতে তোমার সত্র বা আসন পেতে আছ, তুমি যেই হও, তোমাকে জানা কঠিন, তোমাকে প্রণাম করি।

এই গ্রিক ছত্র কটির প্রতি আগ্রহতেই বিভূতিভূষণের চরিত্র অনেকটা ধরা পড়ে। আগাগোড়া ঈশ্বরাভিমুখী ছিল বিভূতিভূষণের চরিত্র। কবিশেখর বলে উঠলেন, যাই বল বিভূতি, তোর একটু জ্যাঠামো আছে।

কালিদাসবাবু সব সাহিত্যিককেই তুই বলতেন, সবাই তো তাঁর অনুজ।

বিভূতিভূষণ মুড়ি ডালমুট খেতে খেতে নির্বিকারভাবে বললেন— কী জ্যাঠামো করলাম কালিদা?

কালিদাসবাবু বললেন— এই যে সবসময় ঈশ্বর ঈশ্বর করা। সেদিন দেখলাম, একজনের অটোগ্রাফে লিখেছিস— গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।

ততক্ষণে আড্ডায় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এসে গিয়েছেন, কালিদার কথা শুনে বললেন— আসলে কী জান বিভূতি, কালিদা অত হাঁটাচলা পছন্দ করেন না।

আড্ডার সকলে হেসে উঠল। সজনীবাবু দুদিকেই আছেন— তবে কালিদা, আপনি ওই যে বললেন না, বিভূতির জ্যাঠামো আছে, এটা একশো ভাগ সত্যি। ঘটনাটা বলি।

আড্ডার সবাই শোনার জন্য উৎসুক। বিভূতিভূষণ মুচকি হাসছেন। বুঝে নিয়েছেন সজনীবাবু কী বলবেন। সজনীবাবু বললেন— আমার ও নজরুলের রামবাগানে একজনের কাছে যাওয়া-আসা ছিল। গান শোনা, একটু পান আরেকটু ফূর্তিটুর্তি হত।

কালিদাসবাবু বললেন— হ্যাঁরে, নজরুল আর তোর তো অহিনকুল সম্পর্ক ছিল।

সজনীবাবু বললেন— হ্যাঁ, তা তো ছিল, তবে এ জায়গায় শত্রুতা হত না। তা বিভূতি সেদিন বলল, হ্যাঁ সজনী, তোমার তো ওখানে যাতায়াত ছিল, একদিন নিয়ে যাবে? আমি 'হিংয়ের কচুরি' গল্পটা লেখার সময়ে দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বা ঘর-বাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তা আমি তো বলে-টলে ঠিক করে বিভূতিকে নিয়ে গেলাম। ও তো ভেতরে ঢুকেই মুগ্ধ।

বিভূতিবাবু বললেন, হ্যাঁ মশাই, এত ফিটফাট, চেয়ার টৌকি, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

সজনীবাবু বললেন, তোমার চোখ জুড়োল তো— দিদি, একটু জল খাওয়াবেন বললে কেন? ও জল খেল, সন্দেশ খেল, ব্যাস, আমি যেই বললাম, ইন্দু এবার বোতল বার করো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, না না আজ ওসব হবে না, আজ আমার দাদা এসেছেন, শুধু গান শুনুন একটা। ওই যে বললেন না কালিদা, বিভূতির সব জায়গায় পাকামো, দিনটাই নষ্ট করে দিল।

বিভূতিবাবু মুচকি মুচকি হেসেই যাচ্ছেন। সজনীবাবু হঠাৎই সুনীতিবাবুকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, সুনীতিবাবু, আপনার তো ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ ছিলই। আবার সংক্ষিপ্ত বার করলেন কেন?

সুনীতিবাবু বললেন, বুঝলেন না আগেরটা ছিল বড়, বলতে পারেন ক্ষিপ্ত সংস্করণ, সেজন্যই সংক্ষিপ্ত বার করতে হল। কালিদাসবাবু বললেন— সুনীতি, ব্যাকরণে চাপ বেশি দেওয়া কি উচিত, ভাষা তো ছাত্ররা পড়তে পড়তে শেখে।

সুনীতিবাবু বললেন— কিন্তু ইংরিজির বেলায় মোটা নেসফিল্ডের গ্রামার তো বেশ পড়ে।

কালিদাসবাবু বললেন— আসলে ভাষা হচ্ছে নদীর মতো, আর ব্যাকরণ অনেকটা নদীর বাঁধ দেওয়ার মতো।

বিভূতিভূষণ বললেন, মশাই, এলাম আড্ডা দিতে, তো আপনারা ব্যাকরণতত্ত্ব নিয়ে পড়লেন। সজনী না হয় আমাকে নিয়েই আড্ডা দাও।

বিভূতিবাবু এই আড্ডাকে খুব ভালোবাসতেন। বলতেন, মাঠে হাওয়া খাওয়ার মতো, আড্ডায় এলেই মনটা বেশ ফ্রেশ হয়ে যায়।

এই আড্ডাকে ভালোবাসার একটা ঘটনা বলি। বিভূতিভূষণের ছোট ভাই নুটুবিহারী তখন ডাক্তারি পড়ছেন। বিভূতিভূষণ চিঠি দিয়েছেন ভাইকে— অমুকদিন আমি মিত্র-ঘোষের আড্ডায় যাব, সেখানে দেখা কোরো।

কিন্তু সেদিন কোনও কারণে বইপাড়া বন্ধ। এমন তো হয়, তবে সেদিন বন্ধ বিভূতিবাবু জানতেন না। অগত্যা দোকানঘরের সামনের রক-এ বসে আছেন, ভাইয়ের অপেক্ষায়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা ছিল সজনীবাবুর, সজনীকান্ত দাস-এর, বিভূতিভূষণকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন— কী ব্যাপার বিভূতি? এখানে বসে?

বিভূতিবাবু বললেন— এই দ্যাখো না, আজ যে বইপাড়া বন্ধ তা তো জানি না। নুটুকে আসতে বলেছি, তাই অপেক্ষা করছি।

সজনীবাবু বিভূতিভূষণের পাশে বসে গেলেন। পাশে একটা চায়ের দোকান থেকে চা আনালেন। দুই বন্ধুতে গল্প হচ্ছে, চা খাওয়া চলছে। এমন সময়ে সরোজ রায়চৌধুরি যাচ্ছিলেন। তিনিও ওঁদের দেখে ওঁদের পাশে বসে গেলেন। তৎকালীন এক জীবনী গ্রন্থকার গৌরীবাবুও বসে গেলেন তাঁদের পাশে। কিন্তু নুটুবাবু শেষপর্যন্ত এলেন না। বিভূতিভূষণ চিঠি লিখেছেন পরে ভাইকে— তোমার অপেক্ষায় কতজন লেখক

অপেক্ষা করছেন এলে দেখতে পেতে।

বিভূতিভূষণের প্রথম পত্নী গৌরীদেবী মারা যান অতি অল্প বয়সে। বিভূতিভূষণ যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন বিবাহ হয়। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই গৌরীদেবী বিসূচিকা রোগে পরলোক গমন করেন। এই সময়ে বিভূতিভূষণ খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। আত্মা ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে ভাবতেন। হরিনাভিতে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠীর এক অল্পখ্যাত সদস্য শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। শ্যামলবাবুর জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা আফ্রিকায়, নাইরোবিতে। বিভূতিভূষণ তাঁর কাছে আফ্রিকার জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিভূতিভূষণ ভেবেছিলেন জঙ্গলে নির্জন বাস হলে পরলোক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

হরিনাভিতে যখন পড়াচ্ছেন, তখন একটি মেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিভূতিভূষণ দেখলেন তাঁর জন্য তরুণীটির সুনামহানি হতে পারে। কোনও অন্নসংস্থান না থাকলেও বিভূতিভূষণ সে শিক্ষকতার চাকরিটি অনায়াসে ছেড়ে চলে আসেন। বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও 'প্রবাসী' পত্রিকার কর্মী নীরদচন্দ্র চৌধুরি তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে জোর করে নিজের মেসে নিয়ে আসেন। নীরদবাবু তাঁর কলেজের সহপাঠী ছিলেন। নীরদবাবু তাঁর 'Thy hand, Great Anarch' গ্রন্থে এই ঘটনাটির বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারও সুনামহানি হতে পারে, এইমাত্র ভেবে অন্নসংস্থান না থাকলেও চাকরি ছেড়ে দেওয়া বড় মনের পরিচয়। আবার এই ঘটনাটাই বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'-র পটভূমি।

শ্যামলবাবুর সঙ্গে জঙ্গল বাস-এর কথাবার্তা চলার সময়ে বিভূতিভূষণ তখন হরিনাভির শিক্ষকতা ছেড়ে খেলাতচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে কাজ নিয়েছেন। শ্যামলবাবু বলেন, খেলাতবাবুদের ভাগলপুরে যে জঙ্গলমহল আছে, সেখানে আফ্রিকার থেকেও ঘন দুর্গম অরণ্য আছে।

ছোটবেলাতেই যে অল্প-স্বল্প সাহিত্যের রচনার চেষ্টা ছিল, পত্নীবিরহের পর বিভূতিভূষণ সাহিত্যে বেশি করে মনোনিবেশ করলেন। ভাগলপুরে জঙ্গলমহলে বাস করেছিলেন বলেই আমরা 'পথের পাঁচালি', 'আরণ্যক', 'দেবযান' প্রভৃতির মতো উপন্যাস পেলাম।

কবিশেখর কালিদাস রায় কবি হিসেবে যেমন খ্যাতিমান ছিলেন, সমালোচক হিসেবে তার থেকে কম ছিলেন না। উনি একদিন আড্ডার মধ্যেই বলেছিলেন, বিভূতির

বিভূতিভূষণ, রমা বৌদি, পুত্র তারাদাস, ভাই ডাক্তার নুটুবিহারী, তাঁর স্ত্রী যমুনা বৌদিদের ভরাভর্তি সংসার। বিভূতিভূষণ বাড়ির সামনের বাগানে একটি স্যুটকেসের ওপর কাগজ রেখে তখন 'ইছামতী' উপন্যাসটি লিখছেন।

কোথায় জোর জানিস, ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে অনায়াসে। ট্রেনে হয়তো ভেন্ডার গাড়িতেই উঠে পড়ল, কোনও সবজিওয়ালা বা চাষির সঙ্গে গল্প করতে করতে দিব্যি চলে গেল।

বিভূতিভূষণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, রমাদেবীকে, ১৯৪০ সালে। তার আগে কলকাতায় তাঁর বাস ছিল ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের (এখন নাম সূর্য সেন স্ট্রিট) একটা মেস-বাড়িতে। বিবাহের পর তিনি সংসার-জীবন শুরু করতে থাকেন পৈতৃকগ্রাম বারাকপুরে, বনগ্রামের কাছে। ইছামতী নদীর ধারে এই গ্রামটি। পরে সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় বাড়ি হল। ঘাটশিলা এবং বারাকপুরের প্রকৃতি-জীবন তাঁকে এমনই আবিষ্ট করে রেখেছিল যে, তিনি বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ উপরোধেও কলকাতায় পাকা আস্তানা করতে চাননি। আড্ডা ভালোবাসলেও বড়জোর দু-তিনদিন বন্ধুদের বাড়ি থাকতেন, আবার ফিরে যেতেন ঘাটশিলায় বা বারাকপুর স্বগ্রামে।

বিভূতিভূষণের জন্ম হয়েছিল মামার বাড়িতে, মুরাতিপুর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ ঠিক সংসারী ছিলেন না। উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। কবিতা লেখা কথকতা তাঁর শখ ছিল। বিভূতিভূষণেরা দুই ভাই ও দুই বোন ছিলেন। এক বোন অল্পবয়সে মারা যান। আর এক বোন জাহ্নবীদেবী বিধবা হয়ে দুই কন্যাকে নিয়ে দাদার সংসারে আসেন। নদীতে স্নান করতে গিয়ে কুমিরের হাতে মারা যান। তদবধি ভাগ্নে-ভাগ্নিরা বিভূতিভূষণের কাছেই মানুষ হতে থাকেন।

পোশাকে-আশাকে বিভূতিভূষণ কী অনাড়ম্বর ছিলেন ভাবা যায় না। কেউ অনুরোধ করলে বলতেন, মশাই, চলুন না একসঙ্গে যাই, দেখি আপনাকে না আমাকে, লোক কাকে বেশি খাতির করে। টাকা-পয়সা সম্পর্কেও ছিলেন এমনই উদাসীন। প্রকাশকের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, কত রয়্যালটি পাওনা হল। প্রকাশক হিসেব করে হাজার কয়েক টাকা দিতে চাইলেন। আঁতকে উঠতেন বিভূতিভূষণ, না না, অত টাকা নিয়ে কী করব? আপাতত ত্রিশ টাকা দাও। তাঁর ভাগ্নি উমা তাঁর কাছেই ঘাটশিলায় মানুষ হন, তাঁর বিয়ে হয় লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনকার দিনে কয়েক হাজার টাকার বাজার। বন্ধু সব খরচ হিসেব করে, হিসেব সহ প্রায় হাজার দেড়েক টাকা ফেরত দিয়ে বিভূতিবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন। বন্ধু মানে গজেনবাবু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

বিয়ের দিন। বিভূতিবাবু বললেন—গজেনবাবু, ওই হিসেবপত্র টাকা সব আমার ওই বিছানার নীচে রেখে দিন। আর চলুন আমরা একটু এঁদেলবেড়ের জঙ্গলে ঘুরে আসি!

গজেনবাবু বললেন, সেকি! আজই রাতে তো বিয়ে।

বিভূতিবাবু বললেন, দেখুন, বর এসে গিয়েছে, কনে তৈরি, বিয়ে ঠিকই হবে। কিন্তু এমন অপরাহ্ন ও সূর্যাস্ত আর পাব কবে?

শ্রাদ্ধবাসরে বিভূতিভূষণের বন্ধুরা। বাঁদিক থেকে সামনের সারি: জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বানী রায়, রাধারানী দেবী, রমণীমোহন মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, আলোক চিত্রকার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্র দেব

চলুন ঘুরে আসি।

এমনই প্রকৃতি-পাগল ছিলেন বিভূতিভূষণ।

বিভূতিভূষণের অকাল তিরোধানের পর পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় তোশক তুলে দেখলেন, হিসেবপত্র ও একগোছা টাকা। রমাদেবী অবাক হয়ে গজেনবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুরপো, এ টাকাগুলি কিসের বলতে পারেন?

গজেনবাবুও অবাক। আরে এতো উমার বিয়ের বাজারের ফেরত টাকা। হিসেব টাকা কিছুই ছুঁয়েও দেখেননি।

বিভূতিবাবুকে সঙ্গী হিসেবে সবাই— সব সাহিত্যিকই পছন্দ করতেন। বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর একবার বোম্বে গিয়েছেন। খুব শীত। ট্রেনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিভূতিভূষণ বললেন— তারাশঙ্কর, আমি আর ঠান্ডায় উঠতে পারছি না, আমার হাতটা একটু ধুয়ে দিবি?

তারাশঙ্কর অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁর হাত ধুয়ে দিলেন। এমনই ছিল বিভূতিভূষণের প্রতি লেখকদের ভালোবাসা।

শিবরাম চক্রবর্তী একবার এক সভায় গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণের সঙ্গে। বোধহয় ডোমজুড়ে। সভার উদ্যোক্তারা সভার শেষে তাঁদের দুজনকে একেকটা বিরাট শিল্ডের মতো জিনিস উপহার দিলেন। শিবরাম বললেন, এত বড় জিনিস নিয়ে যেতে পারব না, এটা আপনারাই রেখে দিন, আমি মেস-এ থাকি, আমার রাখারও অসুবিধা।

বিভূতিভূষণ বললেন, না শিবরাম, ওটা কোরো না, এঁরা ভালোবেসে দিচ্ছেন। নিয়ে নাও। আচ্ছা, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

শিবরাম বললেন— আবার আসার জন্য আপনার বাড়তি গাড়িভাড়া খরচ হবে।

বিভূতিভূষণ বললেন— সে যা ভাড়া বাড়তি লাগে, তোমার কাছে পরে চেয়ে নেব।

বিভূতিভূষণ তখন নেই, শিবরাম বলছেন, জানেন, যখনই বিভূতিভূষণের সঙ্গে দেখা হত, মনে হত এই বুঝি ভাড়ার টাকা চাইবেন, বলতাম, চলুন বিভূতিবাবু কচুরি খাই। পরে হিসেব করে দেখেছি, যত কচুরি খাইয়েছি তাতে অনেক আগেই অনায়াসে ভাড়ার টাকা দিতে পারতাম।

ঘাটশিলার বাড়িটি বিভূতিভূষণ পান অদ্ভুতভাবে। একজনকে হাজার পাঁচেক টাকা ধার দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ ১৯৩৮-৩৯ সাল নাগাদ। তিনি আর শোধ দিতে পারেননি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই ভদ্রলোক বিভূতিভূষণকে অনুরোধ করেন, ঘাটশিলার বাড়িটি নিয়ে তাঁকে ঋণমুক্ত করে দিতে। বিভূতিভূষণ বাড়িটি নিয়ে প্রথম স্ত্রীর নামে 'গৌরীকুঞ্জ' নাম দেন।

আমরা গিয়ে দেখেছি, বিভূতিভূষণ, রমা বৌদি, পুত্র তারাদাস, ভাই ডাক্তার নুটুবিহারী, তাঁর স্ত্রী যমুনা বৌদিদের ভরাভর্তি সংসার। বিভূতিভূষণ বাড়ির সামনের বাগানে একটি স্যুটকেসের ওপর কাগজ রেখে তখন 'ইছামতী' উপন্যাসটি লিখছেন।

বিভূতিভূষণ ঘাটশিলায় বেশি থাকতেন। তাঁরই আগ্রহে গজেনবাবু, সুমথবাবু, প্রমথবাবু ঘাটশিলায় থাকতে শুরু করেন।

এক বিজয়া সম্মিলনীর উৎসবে খাওয়া-দাওয়ার পর বিভূতিভূষণ হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কদিনের মধ্যেই এই ঘরসংসার ছেড়ে চলে যান বিভূতিভূষণ, ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর। কদিনের মধ্যেই ঘাটশিলা নিরানন্দময় হয়ে গেল।

শ্রাদ্ধবাসরে লেখকরা গিয়েছিলেন। ঘাটশিলা স্টেশনে সব সাহিত্যিক জমায়েত হয়েছেন। এক বাউল গান গাইছেন তাঁদের সামনে, সজনী আর কী খাবি, সজনী আর কী খাবি।

সজনীবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা বিজয়ার উৎসবে খেয়ে মারা গেল বিভূতি, আর এ বার বার গাইছে দেখো, সজনী আর কী খাবি, সজনী আর কী খাবি।

সুমথবাবু বললেন, এ সজনী তো আর আপনি নন, বাউলের মানুষ বা ভগবান।

সজনীবাবু বললেন, তা কি আর বুঝিনি। তবে শুনতে কীরকম লাগে? সজনী আর কী খাবি?

দুঃখের মধ্যেও বিভূতিভূষণের বন্ধুরা হেসে উঠলেন।

বিভূতিভূষণের জন্ম ২৮ ভাদ্র, ১৩০১ সালে। ইংরিজি ১৮৯৪ সালে।

১৯৯৪ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উৎসব হয় বারাকপুর ও ঘাটশিলায়।

এখনও ২৮ ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মোৎসব পালিত হয় দু'জায়গাতেই। এইসব পুরনো কথা মনে পড়ে তখন।

গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

সমরেশ মজুমদার

আমার গল্পের বই পড়া শুরু হয়েছিল মোহন সিরিজ দিয়ে। তখন মনে হত, শশধর দত্তের মতো বড় লেখক আর দ্বিতীয়টি নেই। ওঁর বইগুলো পড়তে হত স্কুলের বইয়ের নীচে লুকিয়ে রেখে। তেরো বছর বয়সে মোহনের প্রেমিকা রমাকে অপ্সরা বলে মনে হত। কোনও সমস্যায় পড়লেই শশধর দত্ত লিখতেন, ‘কখন কেমন করিয়া কি হইয়া গেল জানা নেই’, মোহন সমস্যার সমাধান করে ফেলত। ওইসব পড়তে পড়তে হাতে এল স্বপনকুমারের দীপক গোয়েন্দার গল্পগুলো। বেশ জমে গেলাম। এই বইগুলো সাপ্লাই দিতেন পাশের বাড়ির কমলা কাকিমা। সঙ্গে হুঁসিয়ারি থাকত, ‘কেউ জানতে পারলে খবরদার আমার নাম বলবি না। এসব বই তোদের পড়ার কথা নয়। তুই মাথায় লম্বা হয়ে গেছিস বলে পড়তে দিচ্ছি।’

তখন জলপাইগুড়ির একটি বইয়ের দোকানে ওইসব বই পাওয়া যেত। কমলা কাকিমা টাকা দিতেন আর আমি কিনে এনে তাঁকে দিতাম। প্রথম দিন দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে পড়বে এই বই? তুমি?’

‘না। কমলা কাকিমা।’

‘মিছে কথা বলছ না তো?’

কমলা কাকিমা তখনও শর্তটা শোনাননি, তাই সাহস করে বলে ফেলেছিলাম, ‘আপনি চলুন, গেলেই জানতে পারবেন।’

দোকানদার আমাকে বিশ্বাস করলেন।

কমলা কাকিমার বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে। বাদল কাকুর সঙ্গে। বিয়ের ছয় মাসের মাথায় বাদল কাকুর মা মারা যায়। তারপর থেকে কমলা কাকিমা সারাদিন একাই বই পড়ে সময় কাটায়। বাদল কাকু কাজ থেকে ফিরে এলে ওই বাড়িতে রেডিও বাজে। ওই বয়সে আমি বুঝেছিলাম কমলা কাকিমার কোনও বান্ধবী আমাদের পাড়ায় নেই। আমি ছাড়া কেউ ওঁদের বাড়িতে যেত না। বিকেলবেলায় জানলায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতেন, ‘এই, এসো, তোমার সঙ্গে গল্প করি।’

আমাদের গল্পের বিষয় ছিল দস্যু মোহনকে ঘিরে। সেইসময় মাইকে ‘আলোছায়া’ সিনেমার তরফ থেকে সারা শহরে ঘোষণা করা হল, ‘দস্যু মোহন’ নামে সিনেমা শুক্রবার থেকে দেখানো হবে। কমলা কাকিমা খুব উত্তেজিত। বললেন, প্রদীপকুমার হয়েছেন দস্যু মোহন আর সুমিত্রা দেবী রমা। কী দারুণ ব্যাপার! সিনেমাটা দেখতেই হবে।

শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তখনও আমাকে একা সিনেমা দেখতে দেওয়া হত না। দেবদেবী বা অবতারের ছবি এলে আমাকে বড়পিসিমার পাশে রিকশায় বসে ম্যাটিনি শোতে যেতে হত। তবু খুব সাহস করে প্রস্তাবটা বড়পিসিমার কাছে পেশ করলাম। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে পিতামহকে জানালেন। পিতামহ গর্জে উঠলেন, ‘তুমি বন্দুকবাজ দস্যু হতে চাও? তোমার বাবা মা আমার কাছে পাঠিয়েছেন মানুষ হওয়ার জন্য। তুমি আমাদের মুখে কালি মাখাতে চাও?’ চুপসে গিয়েছিলাম।

কমলা কাকিমা ড্যাং ড্যাং করে বাদল কাকুর সঙ্গে নাইট শোতে সিনেমাটা দেখে এলেন। পরদিন বিকেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হ্যাঁরে, তুই কবে দেখবি। উঃ, কী ভালো, কী ভালো!’

আমার দেখা হবে না শুনে তিনি একটুও দুঃখিত হলেন না। বললেন, ‘তাতে কী হয়েছে? আমি তোকে সিনেমার গল্পটা সুন্দর করে বলব। তুই চোখ বন্ধ করে শুনিস, দেখবি সিনেমাটা দেখা হয়ে যাবে।’

ওই প্রথম কমলা কাকিমাকে আমার অপছন্দ হল।

দুদিন পরে স্বপনকুমারের নতুন বই কিনে আনতে পাঠালেন কমলা কাকিমা। তখনও তিনি সিনেমার গল্পটা আমাকে বলেননি। উল্টে একটা নতুন শাড়ি দেখিয়ে বলেছেন, ‘এই

> দোকানদার হাসল, ‘ও মোহন সিরিজ আর স্বপনকুমার কিনে নিয়ে যায় মাঝে মাঝে— বলে কোনও এক কাকিমা কিনতে পাঠিয়েছেন। নিজে পড়ে কিনা কে জানে!’
> ঝুমুরদি নাক সিঁটকালো, ‘ছিঃ। তোর টেস্ট এত খারাপ?’

শাড়িটা কিনলাম। রমা পরে ছিল। কী সুন্দর!' শুনে মেজাজ খারাপ হলেও বই কিনতে গিয়েছিলাম।

দোকানে ভিড় ছিল। খানিকটা অপেক্ষা করার পর বইয়ের নাম বললে দোকানদার মাথা নাড়লেন, 'না। এখন নেই। সামনের সপ্তাহে এসো, পেয়ে যাবে।'

'এম্মা! তুই স্বপনকুমার পড়িস নাকি?'

পিছন থেকে যে কণ্ঠস্বর ভেসে এল সেটা ঝুমুরদির। আমাদের পাড়ায় বাড়ি, কলেজে ঢুকেছে সে-বছর।

দোকানদার হাসল, 'ও মোহন সিরিজ আর স্বপনকুমার কিনে নিয়ে যায় মাঝে মাঝে— বলে কোনও এক কাকিমা কিনতে পাঠিয়েছেন। নিজে পড়ে কিনা কে জানে!'

ঝুমুরদি নাক সিঁটকালো, 'ছিঃ। তোর টেস্ট এত খারাপ?'

'খারাপ বলছ কেন? গোয়েন্দা দীপক তো দারুণ!'

'ছাই। গোয়েন্দা গল্প পড়তে হলে কিরীটি রায় পড়বি।'

'সে আবার কে?' আমি অবাক।

'চল আমার সঙ্গে।'

ঝুমুরদি গম্ভীর মুখে পুরোটা পথ এল। বাড়ির দরজায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতর থেকে একটা বই নিয়ে এসে বলল, 'ঠিক দুদিন সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে পড়ে নিয়ে আমাকে ফেরত দিয়ে যাবি। ছি ছি ছি, তুই ওসব পড়ে নিজের চরিত্র নষ্ট করছিস?'

'এমন করে বলছ কেন? মোহনকে নিয়ে সিনেমা হয়েছে তো!'

'গাঁজা, স্রেফ গাঁজা, যা।' ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল ঝুমুরদি।

বইটি দেখলাম। লেখকের নাম নীহাররঞ্জন গুপ্ত। বইয়ের নাম কালো ভ্রমর। ফেরার পথে কমলা কাকিমাকে জানিয়ে এলাম, বইটি পাওয়া যায়নি। কমলা কাকিমা বললেন, 'ইস!' তারপরই আমার হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর হাতে ওটা কি বই?'

'নীহাররঞ্জন গুপ্তের কালো ভ্রমর'। ওঁকে স্বপনকুমার কেনার জন্য যে টাকা দিয়েছিলেন তা ফেরত দিয়ে দিলাম। ভালো ছেলের মতো বললাম, 'তুমি কি এই বই পড়তে চাও?'

'ভ্যাট! আমি ওই ভ্রমরটোমর পড়ি না।'

রাত সাড়ে সাতটায় পড়ার বইয়ের নীচে রেখে কালো ভ্রমরের পাতা খুললাম। বড় পিসিমার চিৎকার কানে ঢুকতেই দেখলাম পৌনে নটা বাজে। তাড়াতাড়ি বইটা লুকিয়ে রেখে রাতের খাবার খেতে গেলাম। পিতামহ বললেন, 'খুব মেঘ করেছে বৃষ্টি হবে। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো। ভোরে বৃষ্টি না হলে হাঁটতে বের হব।'

ওই বয়সে আমি রোজ প্রার্থনা করতাম যাতে ভোরবেলায় বৃষ্টি হয়। না হলে ভোর সাড়ে চারটের সময় পিতামহ আমাকে বিছানা থেকে তুলে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। বললাম, 'আমাকে একটা হোমওয়ার্ক শেষ করতেই হবে। তারপর শুয়ে পড়ব।'

আমাকে সেসময় আলাদা ঘর দিয়েছিলেন পিতামহ। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে পারতাম। ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করেই কালো ভ্রমর টেনে নিলাম। প্রায় গোগ্রাসে গিলে ফেলে বসে রইলাম রোমাঞ্চিত হয়ে। ঝুমুরদির কথা খুব সত্যি। এর কাছে দস্যু মোহন বা স্বপনকুমার একেবারেই পানসে। কমলা কাকিমা ওই পড়ে বুঁদ হয়ে আছে, আমাকেও দলে টেনেছিল। ঠিক করলাম এখন থেকে শুধু নীহাররঞ্জন গুপ্তই পড়ব। ঠিক তখনই বন্ধ দরজার বাইরে থেকে পিতামহের গলা ভেসে এল, 'হোমওয়ার্ক হয়েছে?'

চমকে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'হ্যাঁ। হয়েছে।'

'তাহলে শুয়ে পড়ো।'

তখন থেকে ঝুমুরদি আমার প্রিয় মানুষ। কমলা কাকিমার বাড়িতে আর যাই না। কয়েকবার জানলায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়েছেন। ব্যস্ততার ভান করে এড়িয়ে গিয়েছি। সেসময় ঝুমুরদিই আমার ভরসা। কিন্তু আরও একটা বই দেওয়ার পর ঝুমুরদি বলল, 'তুই বাবুপাড়া পাঠাগারে ভর্তি হয়ে যা। কিরীটি রায়ের সব বই ওখানে পেয়ে যাবি।'

ঝুমুরদি আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরিয়ান সুনীল পাত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'তুমি তো মাইনর, তিরিশ টাকা দামের মধ্যে বই নিতে পারবে। এই ফর্মটা ভর্তি করে অভিভাবককে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এসো। তিরিশ টাকা জমা রাখতে হবে। মাসিক চাঁদা এক টাকা।' অনেক ঘ্যানর ঘ্যানর করে বড় পিসিমার কাছ থেকে টাকা আর সই আদায় করতে পেরেছিলাম এই শর্তে যে, পরীক্ষার ফল যেন খারাপ না হয়।

আমাকে তখন কে পায়! লাইব্রেরি ভর্তি হাজার হাজার বই। আমি কোনও বইয়ের দিকে না তাকিয়ে নীহাররঞ্জন পড়ে চলেছি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিই। স্কুলের বইতে যাঁদের রচনা থাকে তাঁদের বই খুব কঠিন হয় বলে বিশ্বাস ছিল।

একদিন সুনীলদা বললেন, 'তুমি তো ডিটেক্টিভ গল্প পড়তে পছন্দ করো, তাহলে এঁদের বই তোমার পড়া উচিত। দীনেন্দ্রকুমার রায় এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।' বাধ্য ছেলের মতো আমি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম এই ভেবে যে পরদিনই ফেরত দিয়ে দেব। তাতে সুনীলদার কথা রাখা হয়ে যাবে। পরদিন ফেরত দিতে হয়েছিল কারণ রাত জেগে মোমবাতি জ্বালিয়ে ব্যোমকেশ পড়েছি মুগ্ধ হয়ে। পরের বইটি চাই।

তখন নীহাররঞ্জন গুপ্তকে আর আগের মতো আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল না। ব্যোমকেশের পাশে কিরীটিকে তেমন স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হত না।

সেসময় লাইব্রেরিতে একটি মেয়েকে দেখতাম। আমি তখন চৌদ্দ, তার বয়সও আমার কাছাকাছি। তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও মুখের গড়ন ছিল অপূর্ব সুন্দর। লম্বা মোটা বেনী হাঁটু ছুঁয়ে যেত, এখনও তার চোখদুটো মনে পড়ে। চৌদ্দ বছর বয়সে তাকে বর্ণনা করার কোনও ভাষা খুঁজে পাইনি।

একদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলাম সুনীলদা মেয়েটিকে বলছেন, 'তুমি সাতদিনেও বইটি পড়ে শেষ করতে পারোনি, আবার রিনিউ করতে চাইছ?'

মেয়েটি হাসল, 'আমি দুবার পড়েছি, আরও একবার পড়ব।'

সুনীলদা বললেন, 'খুব খুশী হলাম নীপা।'

শুনে আমি অবাক হলাম। এমন কী বই যা দুবার পড়ার পরেও আরও একবার পড়বে নীপা নামের মেয়েটি? শরদিন্দুর বই নিয়ে সোজা মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি শরদিন্দুর কোনও বই পড়ছ?'

'না তো!' মেয়েটি বিস্মিত হল।

'ও!' আমি থিতিয়ে গেলাম।

'কেন এই প্রশ্ন?' সে বড় চোখে তাকাল।

'আমি এখন শরদিন্দুর বই পড়ি তো, তাই!'

'ওঃ। ওসব বই কি দুবার পড়া যায়?' নীপা হাসল। এবার ওর গজদাঁত দেখতে পেলাম, 'রহস্য জানা হয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যায়।'

'তোমার বইটির নাম কি?'

'শেষের কবিতা।'

'কবিতার বই?'

'ও ভগবান! শেষের কবিতার নাম শোননি? রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস। এই বইয়ের অনেক লাইন আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছি।' নীপা চলে গেল। আমি ফাঁপড়ে পড়লাম।

সাতদিন পরে নীপা লাইব্রেরিতে বইটি ফেরত দিলে আমি পড়ার সুযোগ পেলাম। এ কীরকম বই? কীরকম ভাষা? পড়ে বুঝতে পারছি না আবার না পড়েও পারছি না। একটা লাইনের মানে অনেকরকম হয়ে যাচ্ছে। অমিতকে পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু লাবণ্যকে খুব ভালো লাগছে। একবার পড়ার পর মনে হল আর একবার পড়া উচিত। আর পড়তে পড়তে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

আমার জীবনে কমলা কাকিমা, ঝুমুরদি এবং নীপা তিনরকম ভূমিকা নিয়েছিল, সন্দেহ নেই যে যার মতো। কিন্তু নীপা আমাকে

সমুদ্রের সন্ধান দিয়েছিল, তার কাছে এই জন্যে ঋণী হয়ে আছি।

২

আমার বন্ধু নিশীথ গল্প-উপন্যাস পড়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা পেত। ওর মা মনে করতেন সাহিত্য পড়লে কেউ নষ্ট হয়ে যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, সাহিত্য শব্দটি আমি প্রথম শুনেছিলাম মাসিমার মুখ থেকে। অসম্ভব সুন্দরী মহিলা ছিলেন। স্কুলে পড়াতেন। নিশীথের বাবাকে সবসময় অসুস্থ চেহারায় দেখেছি। তিনি নিজের মতো থাকতেন। মাসিমা খুবই হাসিখুশি। বলতেন, 'বাংলা বই পড়তে হলে তোকে বঙ্কিম দিয়ে শুরু করতে হবে। এক লাফে শেষের কবিতা পড়লে বুঝবি কি করে? তাছাড়া শেষের কবিতার অমিত রায় যেমন রবীন্দ্রনাথের বানানো তেমনই লাবণ্যও। বাস্তবে ওরকম মানুষ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলো পড়, দেখবি চরিত্রগুলো তোর খুব চেনা।'

'তোমার সঙ্গে লাবণ্যের অনেক মিল আছে বলে আমার মনে হয়েছে।' আমি কথাগুলো বলতেই মাসিমার শরীরের সব রক্ত যেন মুখে উঠে এল। সেটা কাটাতে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভ্যাট। আমি কি ওইরকম নেকু?

পছন্দ হয়নি ওঁর কথা, বলেছিলাম, 'লাবণ্য কি বাস্তবে হয় না?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে না বলেছিলেন মাসিমা।

'তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?' সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'কি বলবি, বল্।'

'তোমার সঙ্গে লাবণ্যের অনেক মিল আছে বলে আমার মনে হয়েছে।' আমি কথাগুলো বলতেই মাসিমার শরীরের সব রক্ত যেন মুখে উঠে এল। সেটা কাটাতে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভ্যাট। আমি কি ওইরকম নেকু? খুব পেকে গিয়েছিস তুই!'

কিন্তু আমার মনে হতে লাগল লাবণ্য কখনই নেকু হতে পারে না। কোথায় ন্যাকামি করেছে? নিশীথ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়ে না। সে নাকি এখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ছে। বাংলা সাহিত্যে কত লেখক আছেন? বাবুপাড়া পাঠাগারে গিয়ে তাঁদের তালিকা দেখে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। অ্যাতো লেখক? তাঁরা যত বই লিখেছেন তা পড়ে শেষ করতে কত বছর লাগবে? বই ঘাঁটাঘাটির সময় বড়দের সংলাপ কানে আসত। তাঁরা যেসব লোকের বইয়ের কথা বলতেন তা আমার জ্ঞানের বাইরে ছিল। একজন বলতেন, 'রবীন্দ্রনাথের সব রচনা পড়ে শেষ করতে আমার দু-বছর লেগে গেল।' লোকটির দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম এইসময় কানে এল, 'আবার ব্যোমকেশ নাকি?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম নীপা দাঁড়িয়ে, হাতে বই। সঙ্গে সঙ্গে মাসিমার কথা মনে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, লাবণ্যকে তোমার কেমন লেগেছে?'

'হ-ঠাৎ?' ঠ-এর উচ্চারণ এত সঠিকভাবে করল যে কানে লেগে গেল।

'তোমার কি ওকে নেকু নেকু মনে হয়েছে?'

'যাচ্চলে! ভাবিনি তো! লাবণ্যকে আমার খুউব ভালো লেগেছে কিন্তু আমি কখনও লাবণ্য হতে চাইব না!' নীপা বলল।

'কেন?'

'আমি যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী বা সরস্বতী হতে চাইব না তেমনই লাবণ্যও না। ওটা কল্পনার চরিত্র। স্বর্গের ফুলের মতো।' নীপার কথা শেষ হওয়া মাত্র সুনীলদা এসে দাঁড়ালেন, 'কী নিয়ে কথা হচ্ছে? লাইব্রেরির ভেতরে এত কথা বললে অন্যের অসুবিধা হতে পারে।'

ব্যাপারটা একদম গুলিয়ে গেল। যাকে এত ভালো লেগেছে, যার ভাবভঙ্গি আমি কল্পনা করে নিয়েছি, যার কথা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে তাকে নীপা স্বর্গের ফুল বলে সরিয়ে দিচ্ছে, আবার মাসিমা বলেছেন নেকু। সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকে এই যে রহস্য তৈরি হয়েছিল আজও তার সমাধান খুঁজে পাইনি।

কিন্তু খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম আমি। সমবয়সী বটেই, আমার চেয়ে যারা বছর পাঁচেকের বড় সেইসব মেয়েদের মধ্যে লাবণ্যকে খুঁজতে চাইলাম। আমাদের বাড়িতে থাকতাম তিনজন। একজন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়জন প্রৌঢ়া আর আমি। বড়পিসিমার কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের সবাই হয় প্রৌঢ়া নয় বৃদ্ধা। পাড়ার মেয়েরা স্কুলে যাওয়া আসা করত অভিভাবকের সঙ্গে, বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও যেতে হলে মা-পিসি সঙ্গে থাকত। ফলে তাদের সঙ্গে গল্প করার কোনও সুযোগ পাওয়া যেত না। আচমকা আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছিল বাবুপাড়া পাঠাগারে নীপার সঙ্গে কথা বলার পর। নীপার বাবা বেশ বড়সড় সরকারি অফিসার। একবছর আগে বদলি হয়ে এসেছেন। তাই নীপা আমাদের জলপাইগুড়ির মেয়েদের মতো অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে ঘুরত না। লাইব্রেরিতে আসত রিকশায় চেপে, একাই।

আমাদের বাড়ির একদিকে যেমন কমলা কাকিমাদের বাড়ি, অন্যদিকে বংশীদাদু। বিশাল বাড়ি। শুনতাম ওঁর ছেলেদের কেউ দিল্লিতে থাকেন, কেউ লন্ডনে। বংশীদাদু খুব সাহেব মানুষ। বিকেলে ছড়ি এবং পাইপ হাতে নিয়ে হাঁটতে যেতেন তিস্তার বাঁধে। পিতামহের সঙ্গে কথা বলার সময় খুব কম বাংলা শব্দ ব্যবহার করতেন। হঠাৎ ওই বাড়িতে বেশ হৈ চৈ। শুনলাম বংশীদাদুর জামাই আমেরিকায় যাচ্ছেন বছর খানেকের জন্য। ততদিন তাঁর মেয়ে এবং নাতনি ওই বাড়িতে থাকবেন। বছরটা যাতে নষ্ট না হয় তাই নাতনিকে নিয়ে গিয়ে করলা গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দিলেন বংশীদাদু। একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় নাতনিকে দেখলাম। দরজায় দাঁড়ানো মাকে চুমু খেয়ে রিকশায় উঠে স্কুলে চলে গেল।

আমি চমকিত। জলপাইগুড়ির কোনও চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ে প্রকাশ্যে মাকে জড়িয়ে ধরে দুই গালে টপাটপ চুমু খায় বলে কখনও শুনিনি, দেখা দূরের কথা।

আমাদের একটা গোপন আড্ডা ততদিনে তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই আড্ডায় আমি শ্রোতা হিসেবে থাকি। বাড়ির পাশেই তিস্তার বাঁধ। তার সিকি মাইল দূরে জলের ধারা যা তখনও গভীর ছিল। মাঝখানের বালির চরে লম্বা লম্বা কাশবন। স্কুল ছুটির পরে বাড়ি ফিরেই কিছু খেয়ে নিয়ে খেলতে যাওয়ার কথা বলে আমরা ওই কাশবনের গভীরে চলে যেতাম। জলের ধারে কাশবনের আড়ালে বসে বন্ধুরা সিগারেট

এরপর আগামী সংখ্যায়

ধরাতো। একটা নাম্বার টেন সিগারেট তিনজনে পালা করে টানতো। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমি সিগারেটে অংশ নিতে চাইনি। বড়পিসিমার ঘ্রাণশক্তি খুব বেশি। ঠিক গন্ধ পেয়ে যাবেন মুখে, আর পেলে যে কী হবে তা কল্পনা করা যাবে না। কিন্তু ভয়ের শক্তি নিষিদ্ধ কৌতূহলের চেয়ে বেশি নয়। আমি একটাই টান দিতাম আর তারপরে খানিকটা কেশে তিস্তার জলে বারংবার কুলকুচি করে নিতাম। নিশীথরা কাশতো না। ওরা ওই বয়সেই ধোঁয়া দিয়ে রিং বানাতে পারত। ঘণ্টাখানেকের ওই আড্ডায় আমরা যে যার মনের কথা বলতাম।

গোবিন্দ রোজ রোজ প্রেমে পড়ত। তার প্রেমিকাদের বয়স অন্তত দশ থেকে পনের বছর বেশি। কেউ বউদি, কেউ কাকিমা। আমি তাদের কথা শুনতে না চাইলে নিশীথ গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'তুই চরিত্রহীন পড়িসনি বলে রি-অ্যাক্ট করছিস।'

'চরিত্রহীন?'

'শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস। কিরণময়ী দিবাকরের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিল। দিবাকরের দাদার সঙ্গে তার প্রেম ছিল। রেঙ্গুনে যাওয়ার জাহাজে কিরণময়ী দিবাকরকে চুমু খেয়েছিল আচমকা। তারপর শরৎচন্দ্র কি লিখেছেন জানিস? ঘাবড়ে যাওয়া দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরণময়ী খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিল। উঃ। চুমু খাওয়ার চেয়ে খিলখিল শব্দটা অনেক বেশি সেক্সি।' নিশীথ বলেছিল।

তখনও সেক্সি শব্দটি শুনলে কান গরম হয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভাবতাম ওরা খারাপ কথা বলে, ওদের সঙ্গে মিশব না। কিন্তু কাদের সঙ্গে মিশব? সেই ক্লাস থ্রি থেকে তো একসঙ্গে পড়ছি।

তা এইরকম এক আড্ডায় আমি বংশীদাদুর নাতনির কথা ওদের বললাম। চৌদ্দ-পনের বছর বয়স শুনে গোবিন্দ এমনভাবে হাত নাড়ল যেন আমি দু'বছরের শিশুর কথা বলেছি। নিশীথ বলল, 'এমটি ভেসেল, সাউন্ড মাচ। যাদের ভেতরে কিছু নেই তারাই ওইসব করে পাঁচ পাবলিককে দেখায়। ওর চেয়ে তোর ওই নীপা মেয়েটি দারুণ ইন্টারেস্টিং। যা বলিস তা শুনে মনে হয় গভীরতা আছে। একদিন তোর সঙ্গে গিয়ে ওকে দেখে আসব।'

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'নীপার বয়স কত?'

বললাম, 'আমাদের বয়সী।'

'দূর।' অদ্ভুত শব্দ করেছিল গোবিন্দ।

'যাক?'

'আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

অজিত হেসেছিল, 'তোর যত ইন্টারেস্ট বড়দের দিকে।'

'নিশ্চয়ই। কোনও রিস্ক নেই। সমবয়সী হলেই বিয়ে করতে বলবে। বহুৎ ঝামেলা। কাকিমা দিদিরা তো তা বলবে না।' গোবিন্দ বলেছিল।

কিন্তু আমি ঠিক করলাম কখনই ওদের সঙ্গে নীপার কাছে যাব না।

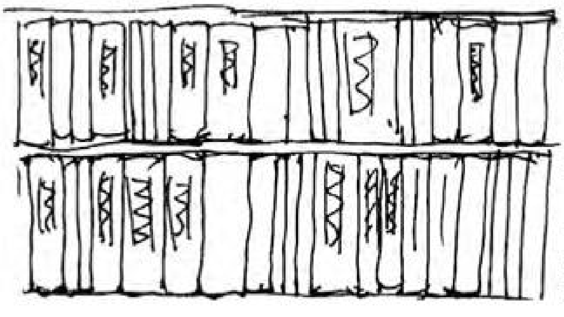

লাইব্রেরিতে নীপার সঙ্গে দেখা। হাতের বই ফেরত দিতে যাচ্ছিল। কী বই জিজ্ঞাসা করলে বলল, 'এটা এমন একটা বই যা তুমি হজম করতে পারবে না।' বলে সে তার গজদাঁত দেখাল।
'কেন পারব না? খুব খটোমটো?'

তখন আমি পনের। ফুলপ্যান্ট সবে পরছি। এক বিকেলে দেখি আমাদের গলির মুখে একটি অচেনা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমাঝেই ঘড়ি দেখছে। একটু কৌতূহল হল। দূর থেকে লক্ষ না করে কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি বংশীদাদুর নাতনি রিকশায় স্কুল থেকে ফিরছে। তাকে দেখে ছেলেটির মুখে হাসি ফুটল। মেয়েটি গম্ভীর মুখে বসেছিল। রিকশা ছেলেটির পাশ দিয়ে যখন ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন মেয়েটি একটা দলা পাকানো কাগজ ছুঁড়ে দিল। কাগজটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটু দূরে গিয়ে পড়ল। মেয়েটি তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে ছেলেটি এগিয়ে যাচ্ছিল কাগজটা তুলতে। তখনই সে আমাকে দেখতে পেল। দেখে কিছুই হয়নি ভান করে উল্টোদিকে হেঁটে চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি দ্রুত কাগজের দলাটাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। মনে হচ্ছিল কোনও গোপন খবর জানতে পারব ওটা খুললে। কিন্তু ওই মেয়েটা তো বেশি দিন এখানে আসেনি, এর মধ্যে ছেলেটার সঙ্গে কী করে এসব হল। কাছাকাছি কেউ নেই নিশ্চিন্ত হয়ে কাগজটাকে সোজা করলাম। মেয়েলি হাতে দুটো লাইন লেখা আছে, ইংরিজিতে। কাকে লিখছে তার নাম যেমন নেই, কে লিখছে তাও বোঝায়নি। হাতের লেখা খুব সুন্দর। দ্বিতীয়বার পড়লাম, Short absence quickens love, long absence kills it. মানে করলাম, 'অল্প বিরহ ভালোবাসাকে বাড়িয়ে দেয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদে ভালোবাসা মরে যায়।' পড়ার পরে আবার মাথা থেকে লাবণ্য উধাও হয়ে গেল।

লাইব্রেরিতে নীপার সঙ্গে দেখা। হাতের বই ফেরত দিতে যাচ্ছিল। কী বই জিজ্ঞাসা করলে বলল, 'এটা এমন একটা বই যা তুমি হজম করতে পারবে না।' বলে সে তার গজদাঁত দেখাল।

'কেন পারব না? খুব খটোমটো?'

'বেশ, তুমি এটা নিয়ে যাও এন্ট্রি করিয়ে। পড়ে বলো।'

নিয়ে এলাম। লেখকের নাম প্রথম পড়লাম, যাযাবর। বইয়ের নাম দৃষ্টিপাত। প্রথমদিকে একটু খটোমটো লাগলেও শেষ পর্যন্ত মজে গেলাম। আঃ, কি সব লাইন, বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

এই দৃষ্টিপাতের কথা নিশীথকে বললাম কাশবনের মধ্যে বসে। নিশীথ হেসে বলল, 'আমি একটা খাতায় লাইনকে লাইন তুলে রেখেছি কোটেশন হিসেবে। যে-কোনও মেয়েকে বললে জলে গল হয়ে যাবে।'

ওরা যখন সবে সিগারেট ধরিয়েছে তখন কিছুটা দূর থেকে মেয়েদের গলা ভেসে এল। এ ওকে ডাকছে, এরকম জায়গায় মেয়েদের আসার কথা নয়। কিন্তু গলাগুলো ভেসে আসছে তিস্তার দিক থেকে। আমরা সন্তর্পণে কাশবন সরিয়ে জলের দিকে তাকালাম।

তিস্তার স্রোতে পাহাড়ে ভেঙে পড়া জঙ্গলের মোটা ডাল, গুঁড়ি ভেসে আসছে। কিছু আদিবাসী মেয়ে সেই কাঠ ধরার জন্য স্রোতে নেমেছে অনেক ওপর থেকে। জীবন বিপন্ন করে ওগুলো তুলে নিয়ে আসছে পাড়ের দিকে। তারপর সেই কাঠগুলো কেটে টুকরো করে শহরে যাবে বিক্রি করতে। যার বিনিময়ে ওরা চালডাল কিনতে পারবে। এই নির্জন নদীর চরে কোনও মানুষ না থাকায় ওরা শাড়ি বাঁচানোর জন্য বিবস্ত্র হয়ে জলে নেমেছে। সেই প্রথম আমি নগ্ন নারী-শরীর দেখলাম দূর থেকে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

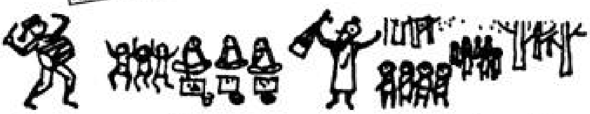

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজ পাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

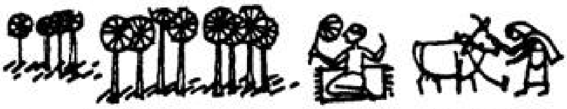

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

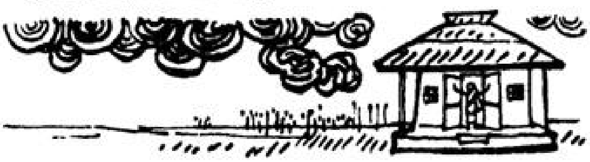

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের

কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

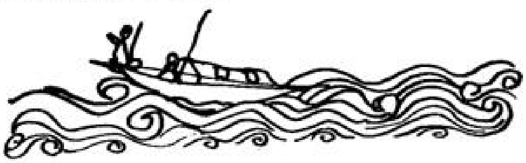

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

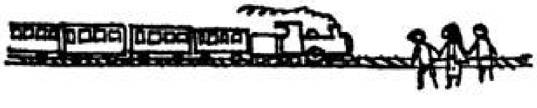

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

আমলাশাহি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঠা দো

তিন যুগেরও বেশি আমলাগিরি করার পর এই কলমচির স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়েছে কিছু টক-মিষ্টি-ঝাল অভিজ্ঞতা। ইচ্ছে হল, তার কিছু টুকরো অংশ উৎসর্গ করা যাক তন্নিষ্ঠ পাঠকবর্গের উদ্দেশে। তাবড় সাহেব থেকে কনিষ্ঠ কেরানি— কত চরিত্রই তো নানা রঙের নানা রসের ছবি এঁকে গেছে কলমচির গৌণ জীবনচরিতে, তার সামান্যই এখনও বহাল মগজের কুঠুরিতে, বেশিটাই জলছবির মতো ক্রমবিলীয়মান।

সাহেবসুবোদের কথাই প্রথমে নিবেদন করা যাক যাঁরা মহকুমা অফিস থেকে কালেক্টরেট থেকে রাইটার্সে পরিযায়ী পাখির মতো যাতায়াত করেন বছর-বছর, অদ্ভুত-অদ্ভুত ছাপ ফেলে যান সামান্য দু-এক বছরের টেনিওরে, বহুকাল পরেও সেই কহানি বলাবলি হয় অফিসের সেকশনে-সেকশনে, কেরানিদের টেবিলে-টেবিলে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

এরকমই একজন সদ্য আই এ এস-প্রাপ্ত কানোয়ার সাহেব, সামান্য, পৃথুল চেহারা, ফর্সা গায়ের রং, মুসৌরির ট্রেনিং সেরে সরাসরি এস ডি ও-র দায়িত্ব পেয়ে ভাগীরথীতীরের বাংলোয় এসে ডেরা বাঁধলেন দ্বিধা-দ্বিধা মুখ করে। ছাব্বিশ প্লাসের হিন্দু পাঞ্জাবি যুবক, ভালো করে বাংলা রপ্ত হয়নি তখনও, সুদূর অমৃতসরের বাস ছেড়ে হঠাৎ 'বঙ্গাল'দেশের এক মহকুমায় পোস্টিং, নতুন পটভূমিতে কেমন ভোম্বল-ভোম্বল লাগল নতুন সাহেবকে।

কিন্তু মহকুমাশাসকের চাকরিটা এমনই যে, ভোম্বল মেরে থাকার কোনও সুযোগ নেই, তাঁর সি এ থেকে শুরু করে বড়বাবু, নাজিরবাবু থেকে কোর্টের পেশকার সবাই নতুন সাহেবের নেকনজরে পড়তে সদা-উৎসুক। তাঁর অফিসারবৃন্দও প্রথম কয়েকদিন চুপচাপ থেকে বুঝে নিতে চেষ্টা করছেন নতুন বসকে।

সি এ অর্থাৎ কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টই সবচেয়ে কাছের লোক এস ডি ও-র, দোতলায় তাঁর বাংলো-চেম্বারের বাইরে কনফিডেন্সিয়াল সেকশনে সদা-মোতায়েন দেখে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সি এ সাহেব, ইয়ে সাব-ডিভিশনমে এস ডি ও-কা কাম ক্যা হ্যায়?

সি এ অচিন্ত্যবাবু অকস্মাৎ সাহেবে উন্নীত হয়ে বেশ পুলকিত বোধ করলেন। অবাঙালি সাহেবের নতুন জায়গার হালহদিশ পেতে এখনও ঢের ঢের দেরি। সাহেবের গূঢ় প্রশ্নে বেশ ফ্যাসাদে পড়লেন অচিন্ত্যবাবু। মহকুমায় এস ডি ও-র কী কাজ তা কি আর সাহেব জেনে আসেননি! কিন্তু সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, অচিন্ত্যবাবু নানা কসরত করে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, স্যার, সাব-ডিভিশনে এস ডি ও-ই সর্বেসর্বা। আপনার অধীনে দশটা থানা, তেরোটা বি ডি ও অফিস, আরও বহু বহু অফিস, তার তালিকা একদিনে শুনলে আপনার মনেই থাকবে না। মহকুমার যাবতীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। এলাকার যাবতীয় উন্নয়ন আপনার হাতে। খরা বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই হোক না সব কিছুই মোকাবিলা করতে হবে আপনাকেই।

এস ডি ও তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রুকিয়ে সি এ সাহেব, একদিনে এত কাজের ফিরিস্তি শোনালে তবিয়ৎ খারাপ হয়ে যাবে।

অফিসের বড়বাবু ছিলেন তক্কে তক্কে, তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ড এককথায় বোঝাতে ইংরিজি ঝেড়ে বললেন, স্যার, এস ডি ও ইজ

> সাহেব পেপারওয়েটগুলো দেখলেন ঘুরিয়েফিরিয়ে, এগুলো প্রায় নতুন, তবু বললেন, ইয়েস, হাঠাও হিঁয়াসে।

দি সুপ্রিম অথরিটি ইন দি সাব-ডিভিশন।

কথাটা সাহেবের বেশ মনে ধরল, জিজ্ঞাসা করলেন, সুপ্রিম অথরিটি?

— ইয়েস স্যার।

— যেমন?

অফিসের নাজিরবাবুও এবার সুযোগ বুঝে সাহেবের ক্ষমতা কত তা বোঝাতে বললেন, স্যার, আপনার হাতে প্রচুর ক্ষমতা। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার এই পুরনো পেনস্ট্যান্ড বাতিল করে নতুন পেনস্ট্যান্ড কেনার হুকুম দিতে পারেন।

সাহেব গুম হয়ে রইলেন দিনদুয়েক, বললেন, এত কোম অ্যালটমেন্ট দেয় কেন গভর্নমেন্ট!

— ইজ ইট? সাহেব তখন তাঁর টেবিলে রাখা পুরনো পেনস্ট্যান্ডটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললেন, দেন ইসকো হাঠাও হিঁয়াসে।

নাজিরবাবু এরকম একটি সুযোগ খুঁজছিলেন, নতুন পেনস্ট্যান্ড কিনলে এখনই তাঁর কিছু লাভ হয়, তৎক্ষণাৎ পেনস্ট্যান্ডটি সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে বললেন, কালই আপনার টেবিলে নতুন পেনস্ট্যান্ড এসে যাবে স্যার। টেবিলের পুরনো পেপার-ওয়েটগুলো বদলে নতুন ডিজাইনের পেপারওয়েট এনে দেব, স্যার?

সাহেব পেপারওয়েটগুলো দেখলেন ঘুরিয়েফিরিয়ে, এগুলো প্রায় নতুন, তবু বললেন, ইয়েস, হাঠাও হিঁয়াসে।

নাজিরবাবু প্রস্তাবটি লুফে নিয়ে বললেন, আর কিছু স্যার?

সাহেব তখন তেরচা চোখে তাকিয়ে দেখছেন তাঁর চেম্বারের পুরনো পর্দাগুলো, বললেন, বহুৎ ময়লা পর্দা। নতুন পর্দা লাগিয়ে দিতে পারেন?

— কালই আপনার চেম্বারে নতুন পর্দা লাগিয়ে দেব, স্যার।

পরদিন সাহেবের টেবিলের পেনস্ট্যান্ড, পেপারওয়েট, পর্দা সব ঝকঝকে হয়ে গেল নাজিরবাবুর হাতের কল্যাণে। অতঃপর সাহেবের নজর পড়ল তাঁর চেম্বারের টেবিলটির দিকে। পুরনো ডিজাইনের চারকোনা টেবিল তাঁর পছন্দ হল না, নাজিরবাবুকে ডেকে বললেন, ইসকো হাঠাও হিঁয়াসে।

নাজিরবাবু ঝকঝকে সানমাইকা দিয়ে ঢেকে একটি অর্ধগোলাকৃতি টেবিল উপহার দিলেন সাহেবকে। কিন্তু সাহেব তখন তাঁর ক্ষমতা পরখ করতে চাইছেন, নাজিরবাবুকে ডেকে বললেন, আমার বাংলো-চেম্বারের দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা কি ভেঙে পড়তে পারে?

— স্যার, কাঠের সিঁড়ি, কে জানে ভেঙে পড়ে কি না!

— দেন, হাঠাও উসকো।

ব্রিটিশ আমলের কাঠের সিঁড়ি, বেশ ভারি কাঠের তৈরি, মরা হাতির দাম লাখ টাকা, সে-আমলের কাঠও বেশ টেঁকসই, তবু সাহেবের যখন হুকুম হয়েছে, সেই সিঁড়ি ভেঙে নতুন সিঁড়ি বসে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। টাকাও খরচ হল কম নয়।

নতুন সিঁড়ি দেখে সাহেবের ফর্সা গোলগাল মুখে চওড়া হাসি। সেকেন্ড অফিসার ঘোষসাহেব নাজিরবাবুকে ডেকে বললেন, সাহেব এরপর হয়তো বলে বসবেন ব্রিটিশ আমলের বাংলো হাঠা দো। তখন কি আপনি অতএব বড় বাংলো ভেঙে নতুন বাংলো তৈরি করে দিতে পারবেন!

কিন্তু বাংলো নয়, সাহেবের নজর পড়ল চেয়ারগুলোর দিকে। একদিন বললেন, টেবিলটা নয়া হল, কিন্তু চেয়ারগুলো পুরানা থাকলে কি মানায়, আপনিই বলুন!

সাহেবের বায়না মেটাতে গিয়ে কোষাগারে টান পড়তে শুরু করেছে, নাজিরবাবু মাথা চুলকে বললেন, স্যার, এবছরের অ্যালটমেন্ট প্রায় শেষ। আপনার ঘরের বারোটা চেয়ার মাত্র গত বছর কেনা হয়েছে, আগের সাহেবের আমলে, বদলাতে গেলে অনেকগুলো টাকা লাগবে। এখনও তিনমাস বাকি ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হতে, যা টাকা আছে, অফিসের কাগজ-কলম-স্টেশনারি কিনতে লেগে যাবে। পরের বছরের টাকা পেলেই কিনে দেব।

সাহেব গুম হয়ে রইলেন দিনদুয়েক, বললেন, এত কোম অ্যালটমেন্ট দেয় কেন গভর্নমেন্ট!

কিন্তু তার পরও শুরু হয়ে গেল আরও নানা বায়নাক্কা, কিন্তু তার কিছু মেটানো যায়, কিছু যায় না, নাজিরবাবু শুধুই বলেন, স্যার, এবছর অ্যালটমেন্ট নেই।

'অ্যালটমেন্ট নেই' শুনে-শুনে সাহেবের চোখ লাল, মুখ রাগে ঢোল, তাঁর তো অনেক ক্ষমতা, এ নিশ্চয় নাজিরবাবুর ওজর, সেদিনই বড়বাবুকে ডেকে হুকুম দিলেন, উনকো হাঠা দো নাজিরখানাসে।

তদ্দণ্ডেই সাহেবের হুকুমে পুরনো নাজির বদলে নতুন নাজির জয়েন করল, কিন্তু চেয়ার নিয়ে তিনি নতুন হাঙ্গামা শুরু করার আগেই হঠাৎ দেশ থেকে চিঠি পেলেন তাঁর বিয়ের ঠিক হয়েছে, তিনি যেন অবিলম্বে ছুটি নিয়ে অমৃতসর চলে আসেন।

সাহেব নাচতে নাচতে বিয়ে করতে দেশে চলে যাওয়ার পর কয়েকদিন শান্তি। অবশ্য ফিরে এলেন দিন পনেরোর মধ্যে। তখন আর চেয়ারের কথা মনে নেই, নতুন বউ নিয়ে সদাব্যস্ত। বাংলোয় যারা আর্দালি আছে, তারা সারাক্ষণ ছুটছে কখনও বাজারে মাছ-মাংস কিনতে, কখনও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নতুন বউয়ের নানা চাহিদা মেটাতে। ক্রেট ভর্তি করে আসছে রকমারি কোল্ডড্রিঙ্কস। আসছে দামি আইসক্রিমের বার। সাহেব বউ নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন, ফিরছেন অনেক রাতে দামি রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে।

মাসের অর্ধেক না-পেরতে ডাক পড়ল নাজিরবাবুর, কী করা যায়, নাজিরবাবু। স্যালারি শেষ। অ্যালটমেন্ট খতম।

ক-টাকা আর মাইনে পান নতুন চাকরি পাওয়া এস ডি ও! এত খরচ করলে খতম তো হবেই! নাজিরবাবু কী করবেন দিশে না পেয়ে বললেন, নাজিরখানা থেকে কিছু অ্যাডভান্স দেব, স্যার?

— তাই দিন।

সেই অ্যাডভান্স কাটা গেল এস ডি ও-র পরের মাসের স্যালারি থেকে। ফলে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আবার নাজিরবাবুর ডাক, কী করি বলুন? স্যালারির অ্যালটমেন্ট খতম।

নাজিরবাবু ফাঁপরে, আমতা আমতা করে বললেন, কী করবেন, স্যার? আবার অ্যাডভান্স নেবেন?

কিন্তু সেই অ্যাডভান্স তো মাস শেষ হওয়ার আগেই খতম। ফলে পরের মাসে স্যালারিই পেলেন না সাহেব।

এস ডি ও সাহেব হতাশ হয়ে নাজিরবাবুকে বললেন, এতো কোম স্যালারি কেন দেয় গভর্নমেন্ট?

অবশেষে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হল, স্যার, আপনি দেশের বাড়িতে চিঠি লিখুন, বলুন, বিয়ে করে অনেক খরচ বেড়ে গেছে, আপনাকে যেন মাস-মাস কিছু টাকা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেন তাঁরা।

দেশের বাড়িতে সেরকমই চিঠি গেল এস ডি ও-র, স্যালারির অ্যালটমেন্ট এত কম যে সংসার চালানো দায়। অবিলম্বে টাকা পাঠাও।

অফিসে তখন কানাকানি ফিসফাস চলছে স্টাফদের মধ্যে, বুঝলেন বড়বাবু, সাহেব এখন না বলে বসেন নয়া অওরতকো হাঠা দো।

আগামী সংখ্যায় নতুন পর্ব

স্বনির্বাচিত তিনটি গল্প

রমানাথ রায়

আমার কথা

সাহিত্যিক হব বলে আমি কোনওদিন সাহিত্য করিনি। সাহিত্য আমার কাছে শুধু বেঁচে থাকার আশ্রয় নয়, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকারও অস্ত্র। তাই কৈশোর থেকে সাহিত্য ছাড়া অন্য কাউকে আমার সঙ্গী করিনি। আজও প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত পার হচ্ছে সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই। সাহিত্য ছাড়া অন্যকিছু আমি ভাবি না, ভাবতে আনন্দও পাই না। ধার্মিকের কাছে যেমন ঈশ্বর, আমার কাছে তেমনই সাহিত্য। সাহিত্য না থাকলে আমার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠত। আমাকে হয়তো আত্মবিনাশের কোনও পথ বেছে নিতে হত। কারণ, কৈশোর থেকে যে ভয়ঙ্কর রুক্ষ পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি, আমাকে অবিরত যে মানসিক দুঃখ পেতে হয়েছে তাতে আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না। একমাত্র সাহিত্যই সেই প্রতিকূল পরিবেশে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের কাছে আমার তাই ঋণের শেষ নেই।

তারপর একদিন টের পেলাম আমি আর পাঠক হয়ে আনন্দ পাচ্ছি না। আমার মধ্যে অনেক কথা আস্তে আস্তে জমে উঠেছে। যত আমি আঘাত পাচ্ছি, আমার বলবার ইচ্ছেও তত প্রবল হচ্ছে। শেষে কোনও এক শুভ বা

পরের পাতায়

এই নাও পারিজাত

তারা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর ধারে এল। নদীর এপারে ছোটবড় নানা গাছ। গাছে গাছে ফুল, পাখির ডাক। নদীর ওপারে পাহাড়, জঙ্গল।

তারা দু'জন একটা গাছের নীচে বসল।

ছেলেটি একটা সিগারেট ধরাল।

মেয়েটি বলল, সিগারেট ফেলে দাও।

— কেন?

— আমি সিগারেটের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না।

ছেলেটি জ্বলন্ত সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলল। ফেলে জিজ্ঞেস করল, এবার খুশি?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বলল, জায়গাটা খুব শান্ত, খুব নির্জন।

মেয়েটি বলল, আমি এখানে কোনও দিন আসিনি। এই জায়গাটার কী নাম?

ছেলেটি মজা করে বলল, বৃন্দাবন।

মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলল, বাজে কথা। এর নাম নন্দনকানন।

— হতে পারে। তুমি এর যে নাম দেবে সেটাই এর নাম।

— এই নদীর কী নাম?

— আমার খুশি। আর নামে কী আসে যায়? মনে নেই জুলিয়েট রোমিওকে কী বলেছিল?

— কী বলেছিল?

ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, এর নাম যমুনা হতে পারে, সরস্বতী হতে পারে, অলকানন্দা হতে পারে। আমি এর নাম দিলাম অলকানন্দা।

— কেন এই নাম দিলে?

— গোলাপকে যে নামেই ডাক সে তার সুগন্ধ ছড়াবে। তেমনি এই নদীকে যে নামেই ডাক তার সৌন্দর্য এতটুকু কমবে না।

মেয়েটি তা শুনে হাসল। হেসে জিজ্ঞেস করল, এই জায়গার নাম যদি হয় নন্দনকানন, এই নদীর যদি নাম হয় অলকানন্দা তাহলে ওই পাহাড়টার কী নাম হবে?

ছেলেটি বলল, ওই পাহাড়ের নাম হবে হিমাদ্রি কিংবা ত্রিকূট কিংবা সুমেরু। তোমার কোন নামটা পছন্দ।

— সুমেরু।

— তাহলে ওর নাম সুমেরু।

তারপর তারা চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। তাদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। মৃদু বাতাসে নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। ঢেউয়ের মাথা সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে।

এমন সময় অলকানন্দার বুকের ওপর দিয়ে একটা সুন্দর ফুল ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

মেয়েটি বলে উঠল, দেখ দেখ, ফুলটা কী সুন্দর!

ছেলেটি মেয়েটির কথায় সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, খুব সুন্দর।

— কী নাম ফুলটার?

— এই জায়গার নাম যদি নন্দনকানন হয়, এই নদীর নাম যদি অলকানন্দা হয়, আর ওই পাহাড়ের নাম যদি হয় সুমেরু, তাহলে ওই ফুলের নাম হবে পারিজাত।

মেয়েটি বলল, এই পারিজাত আমার চাই।

অশুভ মুহূর্তে ঠিক করে ফেললাম, আমাকে লিখতেই হবে। কিন্তু কীভাবে লিখব আমার এই গোপন দুঃখের কথা, যাতে আমার দুঃখ আর আমার থাকবে না, হয়ে উঠবে সকলের, প্রতিটি মানুষের। শুধু তাই নয়, সেসময় কোন শিল্প মাধ্যমটি আমি বেছে নেব সে প্রশ্নেও ভীষণ বিব্রত হয়েছিলাম। কখনও কবিতা, কখনও নাটক, কখনও বা গল্প উপন্যাসকেই ভেবেছি আমার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। তবে কয়েক বছর পরে বুঝতে পারি কথাসাহিত্যই আমার যোগ্য শিল্পমাধ্যম। তবে এটা যে কীভাবে বুঝেছিলাম তা আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। কেউ এর বিবরণ চাইলে আমি তার উত্তর দিতে পারব না।

কিন্তু লিখতে এসে সাহিত্যেও দেখতে পেলাম আরেক প্রতিকূল পরিবেশ। দেখলাম বাস্তববাদী সাহিত্যের নামে এক ধরণের লেখালেখি চলছে যা না বাস্তব, না সাহিত্য। অধিকাংশ লেখকরা কল্লোলের লেখকদের অনুকরণ করে চলেছেন। তাঁরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নীচুতলার মানুষদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখাকেই ভাবছেন বাস্তবতা, ভাবছেন সাহিত্য। ফলে জেলে, কৃষক, শ্রমিক, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, বেশ্যা বা সার্কাস পার্টির লোকজন দেখা দিচ্ছে সকলের লেখায়। এবং তাঁদের লেখা শেষ পর্যন্ত একটা কৃষক বা শ্রমিকের গল্প হয়ে উঠছে মাত্র। আজকের মানুষের সত্যিকারের কোনও গভীর সমস্যা বা সঙ্কট সেখানে ফুটে উঠছে না। তাঁরা বেছে নেন এক কাল্পনিক গ্রাম, বেছে নেন একাধিক কাল্পনিক দরিদ্র মানুষ। এবং সেইসব দরিদ্র মানুষদের বাস্তব করে তোলার তাগিদে তাদের নাম দেন নিতাই, চরণ বা ফকির। তারপর তাদের মুখে বসিয়ে দেন আঞ্চলিক সংলাপ। ফলে চরিত্ররা 'কেন' বলে না, বলে 'কেনে', 'পারলাম না' কথাটা হয়ে দাঁড়ায় 'লারলাম না', 'কোথায়' বদলে 'কুথা'। ব্যস, অমনি তারা হয়ে যায় বাস্তব এবং জীবন্ত। এরপর কোনও একটি বা দুটি নারীকে কেন্দ্র করে রচিত হয় চিরপুরাতন রোমান্টিক কাহিনী। এঁরা বাস্তব কী তা জানেন না, উপন্যাস কী তা জানেন না। এঁরা কেবলই তারাশঙ্কর অথবা মানিকের অক্ষম অনুকরণ করে চলেছেন, নিজস্বতা কিছু নেই।

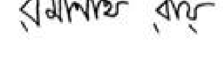

নদীটার নাম অলকানন্দা। নদীর ওপারে একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের নাম সুমেরু। আমি আর তোর বাবা সেই নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। হঠাৎ দেখি একটা ফুল নদীর বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। খুব সুন্দর ফুল। নাম পারিজাত।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, এই ফুল নিয়ে কী করবে?

— খোঁপায় পরব।

— কিন্তু এই ফুলের গাছ কোথায় আছে তা তো জানি না।

— খুঁজে বের করো।

— কোথায় খুঁজব।

— তা আমি জানি না। ওই ফুল আমার চাই। তুমি যদি ওই ফুল না এনে দিতে পার তাহলে বুঝব...

— কী বুঝবে?

— তুমি আমাকে ভালোবাসো না।

ছেলেটি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, তুমি আমাকে এখনও সন্দেহ করো?

মেয়েটি বলল, সন্দেহ করি না। কিন্তু ফুলটা আমার চাই।

ছেলেটি এই কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ভাবতে লাগল কী করা যায়। কীভাবে এই ফুল জোগাড় করা যায়।

এমন সময় একটা ছোট নৌকো বাইতে বাইতে একজন মাঝি যাচ্ছিল। ছেলেটি তাকে চিৎকার করে ডাকল, শুনছ ভাই!

মাঝি উত্তর দিল, কী?

— এদিকে এসো।

— কেন?

— তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মাঝি তীরে নৌকো ভেড়াল।

ছেলেটি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো এখানেই থাক?

মাঝি বলল, হ্যাঁ।

— তোমার নাম কী?

— কৃষ্ণ।

— আমি তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাই।

— কী কথা?

— একটু আগে নদীর বুকে একটা সুন্দর ফুল ভাসতে ভাসতে গেল। ওটা কি পারিজাত?

— হ্যাঁ, ওটা পারিজাত!

— ওই ফুল কোথায় পাওয়া যায়?

— ওই পাহাড়ে।

— আমাকে ওই পাহাড়ে নিয়ে যাবে?

— না।

— কেন?

— ওই পাহাড়ে মানুষ যেতে পারে না। ওখানে ঘন জঙ্গল।

— তাহলে ওই ফুল আমি কী করে পাব? ওই ফুল যে আমার চাই।

— তুমি চিন্তা কোরো না। ঠিক সময়ে আমি তোমার হাতে ওই ফুল তুলে দেব।

— কবে সেই সময় হবে?

কৃষ্ণ তার উত্তর না দিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে চলে গেল।

ছেলেটি আপন মনে বলে উঠল, অদ্ভুত! তারপর আবার মেয়েটির কাছে ফিরে এল। পাশে এসে বসল। বসে বলল, সব শুনলে?

মেয়েটি বলল, শুনলাম।

ছেলেটি বলল, আমি আশা ছাড়ছি না। আমি আবার এখানে আসব। তুমি আসবে?

মেয়েটি বলল, আসব।

২

তারপর কেটে গিয়েছে অনেক বছর। এর মধ্যে তারা বিয়ে করেছে। তাদের একটা ছেলে হয়েছে। তারা এখন বাবা এবং মা। বাবা রোজ অফিসে যায়। মা সংসার সামলায়। ছেলেকে রোজ সন্ধেবেলা পড়তে বসায়। ছেলের বয়স এখন দশ।

একদিন সন্ধেবেলা পড়তে বসে পড়াশুনোয় ছেলের মন বসছিল না। থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল।

মা জিজ্ঞেস করল, আজ তোর কী হয়েছে?

ছেলে বলল, আজ পড়তে ভালো লাগছে না। আমার গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে। তুমি একটা গল্প বলো।

মা বলল, আমি তো গল্প জানি না। তবে একটা জায়গার কথা জানি।

ছেলে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন জায়গা? আমেরিকা?

— না।

— তাহলে?

ছেলে তাদের নন্দনকাননের কথা বিশ্বাস করে না। কিছুই আর বিশ্বাস করতে চায় না। সব কিছুতেই অবিশ্বাস আর অবিশ্বাস। এত অবিশ্বাস নিয়ে কী করে বাঁচবে? মা মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলল, ঠাকুর, ওকে সুমতি দাও। ওর মনে বিশ্বাস এনে দাও।

— সে এক আশ্চর্য জায়গা।

— সেটা কোথায়?

— ভারতে।

— তুমি গেছ সেখানে?

— হ্যাঁ। আমি আর তোর বাবা সেখানে গিয়েছিলাম।

— কী আছে সেখানে?

— চারদিকে ছোটবড় নানা গাছ। গাছে গাছে ফুল, পাখির ডাক। কতরকমের পাখি। জায়গাটার নাম নন্দনকানন। সেখানে বয়ে চলেছে একটা নদী। নদীটার নাম অলকানন্দা। নদীর ওপারে একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের নাম সুমেরু। আমি আর তোর বাবা সেই নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। হঠাৎ দেখি একটা ফুল নদীর বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। খুব সুন্দর ফুল। নাম পারিজাত। ওই ফুলটা নিতে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আমরা জানতাম না কোথায় ওই ফুল পাওয়া যায়। এমন সময় নৌকো বেয়ে এক মাঝি যাচ্ছিল। সেই মাঝির নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কাছ থেকে জানতে পারলাম নদীর ওপারে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়ে পারিজাত ফুলের গাছ আছে। তোর বাবা ওপারে যেতে চাইল। কৃষ্ণ নিয়ে গেল না। বলল, ওই পাহাড়ে কোনও মানুষ যেতে পারে না। তবে কৃষ্ণ কথা দিল ঠিক সময় সে তোর বাবার হাতে ওই ফুল তুলে দেবে। কিন্তু কবে সেই সময় হবে তা না বলে নৌকো বাইতে বাইতে চলে গেল। ইচ্ছে আছে আর একবার ওখানে যাব।

ছেলে বলল, আমিও যাব।

— এখন তো যাওয়া হবে না। আগে বড় হ'। তারপর যাবি।

— বড় হলে নিয়ে যাবে তো?

— যাব।

এই সময় ডোরবেল বাজল। মা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বাবা ঘরে ঢুকল। বাবাকে দেখে ছেলে জিজ্ঞেস করল, তোমরা নাকি এক অদ্ভুত সুন্দর জায়গায় গিয়েছিলে, সত্যি?

বাবা হেসে বলল, সত্যি।

— জায়গাটার নাম নন্দনকানন?

— হ্যাঁ।

— নদীটার নাম অলকানন্দা?

— হ্যাঁ।

— আর নদীর ওপারের পাহাড়টার নাম সুমেরু?

— কী আছে ওখানে?

— পারিজাত ফুলের গাছ আছে।

— আর কী আছে?

— জানি না।

— আমি যাব ওখানে।

— আগে বড় হ', তারপর যাবি।

— আমি কবে বড় হব?

বাবা হেসে বলল, হবি, একদিন ঠিক বড় হবি।

তারপর মা বলল, অনেক বছর হয়ে গেল। আমাদের বয়স হল। কিন্তু কৃষ্ণ এখনও পারিজাত দিয়ে গেল না। কবে দেবে?

— একবার ওখানে যাওয়া দরকার।

— কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে কি আবার দেখা হবে?

— অবশ্যই দেখা হবে। তবে বিশ্বাস চাই।

৩

ছেলেটা বড় হল। অনেক লেখাপড়া শিখল। তারপর চাকরি নিয়ে চলে গেল বেঙ্গালুরু। সেখানে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করল। বিয়ে করে একদিন বউকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেল। তবে বাবা-মাকে ভুলল না। মাঝে মাঝে তাদের ফোন করত। তাদের খবরাখবর নিত।

একদিন বিকেলবেলা ছেলের ফোন এল। মা কথায় কথায় ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তোকে একদিন নন্দনকাননের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

ছেলে বলল, আছে।

— সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না?

— না।

— কেন?

— ওসব তোমাদের গালগল্প।

— নারে, গালগল্প নয়, সত্যি। আবার একদিন আমরা সেখানে যাব। তুই যাবি না?

— না। তোমরা বরং এখানে এসো। এখানে এলে তোমাদের নন্দনকানন তুচ্ছ হয়ে যাবে।

— এসব বলিস না।

— তাহলে তোমরা তোমাদের নন্দনকানন নিয়ে থাকো।

— তাই থাকব।

ছেলে এবার গলার স্বর নরম করে জিজ্ঞেস করল, রাগ করলে?

— না, রাগ করিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোরা যেখানে আছিস সেখানে সুখে থাক। সেটাই তোদের নন্দনকানন হয়ে উঠুক। —বলে মা ফোনের লাইন কেটে দিল।

তবে মা-র মনে ছেলের ওপর একটু অভিমান হল। কারণ ছেলে তাদের নন্দনকাননের কথা বিশ্বাস করে না। অথচ একদিন ছেলেবেলায় নন্দনকাননের কথা বিশ্বাস করেছিল। সেদিন সে নন্দনকানন যেতে চেয়েছিল। আজ কী হল তার? নন্দনকাননের কথা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে এসব গালগল্প। আসলে বেশি লেখাপড়া শিখে মাথাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিছুই আর বিশ্বাস করতে চায় না। সব কিছুতেই অবিশ্বাস আর অবিশ্বাস। এত অবিশ্বাস নিয়ে কী করে বাঁচবে? মা মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলল, ঠাকুর, ওকে সুমতি দাও। ওর মনে বিশ্বাস এনে দাও।

এই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। বাবা অফিস থেকে ফিরল। ফিরে মনের আনন্দে বলে উঠল, আর মাত্র এক মাস।

মা কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কীসের এক মাস?

— চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আর এক মাস আছে। তারপর ছুটি, অনন্ত ছুটি। চাকরি করতে আর ভালো লাগছে না।

মা-ও খুশি হয়ে বলল, ভালো হল। এবার আমরা নন্দনকানন যাব।

বাবা বলল, ঠিক বলেছ। আমরা আবার সেই নন্দনকানন যাব। স্বপ্নের মতো কী সুন্দর সেই জায়গা। তবে তার আগে...

মা জিজ্ঞেস করল, তার আগে কী?

— সব কিছুর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

— সব কিছুর মানে?

— টাকা-পয়সার কথা বলছি।

— যা খুশি করো। তবে দেরি কোরো না।

৪

একমাস পরে বাবা অবসর নিল। হাতে গ্র্যাচুইটির টাকা এল, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা

এল। এ ছাড়া মাসে মাসে পেনশন তো আছেই। সুতরাং শেষজীবনে আর অর্থকষ্টে পড়তে হবে না। কিন্তু সমস্যা হল এতগুলো টাকা কোথায় কীভাবে রাখবে। কেউ সব টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে বলল। কেউ বলল, সব টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ঠিক নয়। কিছু টাকা পোস্ট অফিসে রাখা ভালো। কেউ আবার শেয়ারে টাকা খাটাতে বলল। শেয়ারে কয়েক বার টাকা খাটাতে গিয়ে বাবা সুবিধে করতে পারেনি। তাই অনেক ভেবেচিন্তে কিছু টাকা পোস্ট অফিসে রাখল। আর বাকি টাকা নানা ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে রাখল। তার মধ্যে কিছু টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে রাখল, কিছু টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখল।

— মা বলল, বেশি টাকা ব্যাঙ্কে রেখো না।

বাবা জিজ্ঞেস করল, কেন?

— ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা ওঁত পেতে আছে। কখন ধরবে তার ঠিক নেই।

— ভয় নেই। আমি কোনও দিন ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিইনি। কোনও দিন দেব না। সরকারের যা প্রাপ্য তা সরকারকে দেব। সেই সঙ্গে তোমার যা প্রাপ্য তোমাকে দেব। আমার মৃত্যুর পর তোমার যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থাও করেছি।

— এখনই মৃত্যুর কথা কেন?

— একদিন মরতে তো হবে।

— এখন তো মরছ না।

— মৃত্যুর কথা কিছু বলা যায় না। আমি আজকে মরতে পারি। দশ বছর পরেও মরতে পারি।

— তোমার আগে আমি মরব। আমার শরীরটা আজকাল ভালো যায় না।

— আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।

মা আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? কী হয়েছে?

বাবা উদাসীন গলায় বলল, মাথায় মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। জানি না এটা কীসের প্রব্লেম।

মা-র মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তাহলে কালই একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।

— দেখাব। তবে তার আগে নন্দনকানন ঘুরে আসা দরকার। এখনও থেকে থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই বন, সেই নদী, সেই পাহাড়। আর মনে পড়ে সেই কৃষ্ণ মাঝির কথা। যে আমাকে পারিজাত ফুল দেবে বলেছিল। কৃষ্ণ কি তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেল? এদিকে আমার বয়স বাড়ছে। আর কবে পাব সেই পারিজাত ফুল? আমার যে আফশোস থেকে গেল। তোমার হাতে আমি যে এখনও পারিজাত ফুল তুলে দিতে পারলাম না।

মা হেসে বলল, আমার আর পারিজাত ফুলের দরকার নেই।

বাবা জিজ্ঞেস করল, কেন?

মা বলল, আমার আর খোঁপা বাঁধার মতো চুল নেই।

বাবা বলল, না থাকুক। আমি তোমার হাতে পারিজাত ফুল তুলে দিতে চাই। এ আমার স্বপ্ন।

— তাহলে চলো।

— চলো। কিন্তু সেই নন্দনকানন কি আছে? যদি থাকে তাহলে অলকানন্দায় কি এখনও কৃষ্ণ মাঝি নৌকো বায়? যদি কৃষ্ণ মাঝি থেকেও থাকে তাহলে সুমেরু পাহাড়ে এখনও কি পারিজাত ফুল ফোটে? জানি না। এখন আমার কাছে সবই স্বপ্ন মনে হয়।

— তাহলে আর যেতে হবে না। যে ক'দিন বেঁচে আছি সে ক'দিন এখানেই সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দিই।

— কিন্তু সেই নন্দনকাননের কথা আমি যে ভুলতে পারি না। আমাদের যেভাবেই হোক ওখানে একবার যেতে হবে।

মা কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

৫

যাব যাব করে যাওয়া আর হয় না। আস্তে আস্তে তারা দু'জনে বুড়িয়ে গেল। একদিন বুড়ি রাগ করে বলল, আর কবে যাবে নন্দনকানন? আমরা যে অক্ষম হয়ে পড়ছি।

বুড়ো বলল, এবার যাব। কালকেই যাব। যেতে পারবে?

বুড়ি বলল, পারব।

আর পিছুটান নয়। দুর্বল শরীর নিয়ে অনেক কষ্টে তারা তাদের সেই নন্দনকাননে পৌঁছল। কিন্তু এ কী! সেই সব গাছ আর নেই। সব কারা কেটে ফেলেছে। সেই নদীও আর নেই। তার জল প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। নদীর বুকের ওপর দিয়ে আর পারিজাত ফুল ভেসে যায় না। ওপারে পাহাড়ের সেই সৌন্দর্য আর নেই। এখন এখানে চারদিকে লোকজন, ব্যস্ততা। দূরে মনে হয় বিশাল একটা কারখানা হচ্ছে। কীসের কারখানা? একটি লোক এই সময় তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ো তাকে থামিয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

লোকটি বলল, কী কথা?

— আপনি কি ওই কারখানায় কাজ করেন?

— হ্যাঁ।

— অনেক অনেক বছর আগে আমরা এখানে এসেছিলাম। তখন চারদিকে কী সুন্দর গাছ ছিল, কী সুন্দর নদী ছিল, কী সুন্দর দূরের ওই পাহাড় ছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই সব গাছ, সেই নদী, সেই পাহাড়?

লোকটি হেসে বলল, এখানে ইস্পাতের বিশাল কারখানা হবে। তাই সব গাছ কাটা হয়েছে। আর এই নদীর ওপর তৈরি হবে বিশাল ব্রিজ। আর ওই পাহাড়ে তৈরি হবে বিশাল বিশাল হোটেল, ঘরবাড়ি। তার জন্য ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানো হচ্ছে। তৈরি হবে রাস্তা।

— কারা এসব তৈরি করছে?

— নামকরা সব বিদেশি কোম্পানি।

— ওহ! —বলে বুড়ো মাটিতে বসে পড়ল।

বুড়িও বুড়োর পাশে বসল।

লোকটা আর কিছু না বলে চলে গেল।

বুড়ি জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ এখানে ইস্পাতের কারখানা কেন?

বুড়ো বলল, এর মাটির নীচে নিশ্চয়ই লোহা আছে।

— তার জন্য এই হিংস্র তাণ্ডব?

— হ্যাঁ। তার জন্য এই হিংস্র তাণ্ডব।

— এখন দেখছি এখানে না এলেই ভালো হত।

— আমারও তাই মনে হচ্ছে। —বলে একটু থেমে বুড়ো বলল, কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।

বুড়ি জানতে চাইল, কী কথা?

— কৃষ্ণ আমার হাতে পারিজাত ফুল তুলে দেবে বলেছিল। তার কী হবে?

বুড়ি বলল, আর পারিজাত ফুলের দরকার নেই। এখন বাড়ি চলো।

— কিন্তু আমি যে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম।

বুড়ি এ কথা শুনে কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

বুড়োও আর কিছু বলল না। চুপ করে রইল। তারপর একসময় দু'জনে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। চারদিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুড়ির চোখে জল চলে এল।

৬

বাড়ি ফিরে বুড়োবুড়ি দু'জনেই বিছানা নিল। বিছানার পাশে ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর ফোন।

বুড়ি বলল, ছেলেকে একবার ফোন করো।

বুড়ো বলল, না। আমার কাউকে দরকার নেই। আমার দরকার এখন একজনকেই।

— কে সে?

— কৃষ্ণ মাঝি।

— তাকে কোথায় পাবে?

— এখানেই পাব। আমি তাকে বিশ্বাস করি। সে কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না। কিন্তু সে কবে আসবে? আমি যে আর পারছি না। আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

— তোমার যখন এত বিশ্বাস তাহলে সে আসবে। ঠিক আসবে। তুমি এখন ঘুমোও।

এর দু'দিন পরে বুড়োর মাথায় শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা। ■

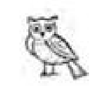

স্ব নি র্বা চি ত গ ল্প ২

প্র তি দি ন

সন্ধেবেলা বাড়ি ঢুকে ঘরে বসতে না বসতেই স্ত্রী এসে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটা বুঝতে পারল আজকেও কিছু একটা হয়েছে। তবে কী হয়েছে তা সে জানতে চাইল না। জানার আগ্রহ বোধ করল না। কারণ রোজই বাড়িতে কিছু না কিছু একটা ঘটছে। আর রোজই বাড়ি ফিরে তাকে সব শুনতে হচ্ছে। তার এসব শুনতে একদম ভালো লাগে না। না লাগলেও সে মুখে কোনও বিরক্তি প্রকাশ করে না। আবার সহানুভূতি দেখিয়ে কিছু জানতেও চায় না। আজও সে প্রতিদিনের মতো চুপ করে বসে রইল।

স্ত্রী প্রতিদিনের মতো গম্ভীর মুখে বলল, জানো আজ কী হয়েছে?

লোকটা বলল, পাখাটা খুলে দাও।

স্ত্রী পাখার সুইচ অন করে বলল, তোমার মা আজ আমাকে কী বলেছে জানো?

লোকটা স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে বলল, এক কাপ চা করে দাও।

—আগে আমার কথা শোন, তারপর চা করে দিচ্ছি।

—না, আগে চা করে দাও, তারপর সব শুনছি।

স্ত্রী অগত্যা আগে চা করে আনল। এনে বলল, এবার শোন।

লোকটা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, চায়ে চিনি কম হয়েছে। এক চামচ চিনি নিয়ে এস।

স্ত্রী এক চামচ চিনি এনে চায়ে গুলে দিল।

লোকটা তারপর কয়েক চুমুকে চা শেষ করে বলল, আমি একটু বেরচ্ছি।

—কোথায়?

—কাজ আছে।

—না, কোথাও এখন যাওয়া হবে না। আগে আমার কথা শুনতে হবে।

—বলো।

—তোমার মা আজ কী বলেছে জানো?

লোকটা এবার গম্ভীর গলায় বলল, জানি।

স্ত্রী এ কথায় বিরক্ত হয়ে বলল, জানো! কী বলেছে জানো!

—জানি।

—বলো কী জানো?

—মা তোমার রাঁধা তরকারি মুখে দিতে পারেনি। তুমি তরকারিতে খুব ঝাল দিয়েছিলে। মা তোমায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি তরকারিতে এত ঝাল দিয়েছ কেন? তুমি মার কথা অস্বীকার করেছিলে, বলেছিলে, ঝাল! কোথায় ঝাল দিয়েছি! মা তখন বলেছিল, তুমি কথায় কথায় এত তর্ক করার স্বভাব কোত্থেকে শিখলে? কে শেখাল তোমাকে? তোমার বাবা? তোমার মা? তারপর তুমি বললে, কথায় কথায় আমার বাপ-মা তুলবেন না। একদম ভালো হবে না। আর তারপরেই ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে যায়। তাই না?

স্ত্রী অবাক হয়ে বলল, এত কথা তুমি জানলে কী করে? তোমায় কে বলেছে? মা? বাবা? তোমার ভাই? তোমার বোন? মেয়ে?

লোকটা হেসে বলল, কেউ বলেনি।

—মিথ্যে কথা।

—আমি মিথ্যে কথা বলি না।

স্ত্রী তখন কী বলবে তা খুঁজে না পেয়ে বলল, ঠিক আছে, তুমি একজন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। কিন্তু তোমাকে এর বিহিত করতে হবে। যদি না কর...

—তাহলে বাপের বাড়ি চলে যাবে। তাই না?

—হ্যাঁ —বলে স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা ঘরে ঢুকল। লোকটা দেখল মার মুখ রাগে থমথম করছে। বুঝল দুপুরের জের এখনও চলছে। এখনও মা শান্ত হয়নি। তবে সে দুপুরের ঘটনা নিয়ে মাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। না করে শুধু বলল, বসো।

মা বলল, বসব না। যা বলছি শোন।

—বলো।

—বউমা আজকেও ...

তরকারিতে খুব ঝাল দিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তুমি তা নিয়ে বলতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তাতে তোমার বউমা গলা উঁচু করে ঝগড়া করতে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—আর তাতেই তোমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে যায়?

—হ্যাঁ।

—তুমি এবার চাইছ, আমরা যেন অন্য ফ্ল্যাট খুঁজে চলে যাই।

—হ্যাঁ। —বলে মা চলে গেল।

কিন্তু লোকটা বাইরে যাবে বলে উঠতে পারল না। কারণ মা যেতে না যেতে বাবা ঘরে ঢুকল। লোকটা বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবার চোখে মুখে একটা বিরক্তির ছাপ।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, আজ আবার ঝামেলা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—দোষ তোমার বউমার। তাই তো?

—হ্যাঁ।

লোকটা দেখল মার মুখ রাগে থমথম করছে। বুঝল দুপুরের জের এখনও চলছে। এখনও মা শান্ত হয়নি। তবে সে দুপুরের ঘটনা নিয়ে মাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। না করে শুধু বলল, বসো। মা বলল, বসব না। যা বলছি শোন।

—রোজ তোমার এই ঝামেলা আর ভালো লাগে না নিশ্চয়?
—হ্যাঁ।
—অতএব আমরা যেন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই— এটাই চাইছ তো?
—হ্যাঁ। —বলে বাবা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। চলে গেল। তবু লোকটা উঠতে পারল না। এবার ভাই আর বোন একসঙ্গে ঘুরে ঢুকল।
বোন বলল, আমি আগে শুরু করব।
—কেন?
—মেয়েদের দাবি সবার আগে।
—তাহলে তুই শুরু কর।
বোন বলতে আরম্ভ করল, আজ আমাদের স্কুল-কলেজ ছুটি ছিল। জানো?
লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, জানি, আজ ছাত্র ধর্মঘট।
—আমরা তাই বাড়িতেই ছিলাম।
—থাকারই কথা।
—তারপর কী হয়েছে জানো?
লোকটা বলল, জানি। খেতে বসে তোর সঙ্গে মা-র কথা কাটাকাটি হয়েছে।
—ঠিক তাই।
—তুই বউদির পক্ষ নিয়েছিলি?
—হ্যাঁ।
—তুই বলেছিলি তরকারিতে তেমন ঝাল হয়নি?
—হ্যাঁ।
—ফলে মা বলেছিল চুলের মুঠি ধরে তোকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে?
—হ্যাঁ।
—এতে তুই রেগে গিয়ে বলেছিলি ক্ষমতা থাকে তো বের করে দাও?
—হ্যাঁ।
—তখন মা তোর গালে ঠাস করে একটা চড় মারে?
—হ্যাঁ। কিন্তু এত কথা তুমি কী করে জানলে? বউদি তোমাকে সব বলেছে?
—বউদি কিছুই বলেনি।
—তাহলে?
লোকটা হেসে বলল, অনুমান।
বোন বলল, আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগে না। তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।
ভাই এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার বলল, আমার কী হয়েছে জানো?
লোকটা বলল, জানি।
—কী করে জানলে?
—অনুমান করে। বলব কী হয়েছে?
—বলো।
—তুই মাকে সমর্থন করেছিলি। বউদির বিরোধিতা করেছিলি। তাই না?
ভাই হেসে বলল, হ্যাঁ।
—তুই বলেছিলি মা যা-ই বলুক, মা-র সঙ্গে তর্ক করা বউদির উচিত হয়নি।
—হ্যাঁ।
—তোর মতে বউদির চুপ করে থাকা উচিত ছিল।
—হ্যাঁ, আমি তাই বলেছিলাম।
—এতে বউদির সঙ্গে তোর কথা কাটাকাটি হয়। হয়েছিল?
—হয়েছিল।
—তুই শেষে মার হয়ে তোর বউদিকে বলেছিলি, তোমার যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে এত অসুবিধা হয়, তাহলে আলাদা হয়ে চলে যাও।
—রাগের মাথায় বলেছিলাম।
—যাই হোক, বলেছিলি কিনা?
—বলেছিলাম। কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে? নিশ্চয় বউদি বলেছে।
—বউদি! বউদিকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।
—বউদি কিছু বলেনি?
—না।
—সব অনুমান?
—হ্যাঁ। যাই এবার। —বলে লোকটা উঠে দাঁড়াল।
ভাই জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?
—একটু কাজ আছে।
ভাই ও বোন সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
লোকটাও বেরবে বলে কয়েক পা এগোল। কিন্তু এবারেও তার যাওয়া হল না। তার দশ বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকল। বলল, মা আজ আমায় মেরেছে।
—মারবেই তো।
মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, কেন? আমি কী করেছি?
লোকটা মেয়েকে কোলে নিয়ে বলল, কারণ তুমি মা-র কথা শোননি।
—আমি মা-র কথা শুনব না।
—কেন শুনবে না?
—মা আমায় কেবল বকে, মারে। একটুও ভালোবাসে না।
—তোমায় কে ভালোবাসে?
—তুমি।
—আর কে?
—ঠাকমা। —বলে একটু থেমে মেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি আর মা নাকি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?
—হ্যাঁ।
—আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাব না। আমি ঠাকমার সঙ্গেই থাকব।
—তাই থেকো। —বলে লোকটা মেয়েকে কোল থেকে মেঝেয় নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল, মা-র সঙ্গে দেখা হল, বাবার সঙ্গে দেখা হল, ভাই ও বোনের সঙ্গে দেখা হল। সকলেই জানতে চাইল সে কোথায় যাচ্ছে। লোকটা কাউকেই জায়গার নাম বলল না। শুধু বলল, কাজ আছে। তখন সকলে তাকে জিজ্ঞেস করল, কখন ফিরবে? এর উত্তরে লোকটা বলল, সে তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করবে। তারপর তাকে আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।
ঠিক রাত দশটায় লোকটা আবার বাড়ি ফিরল। তখন ডাইনিং টেবিল ঘিরে সকলে খেতে বসেছে। লোকটা জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পরে খাবার টেবিলে এল। তার খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া ছিল। ঢাকা খুলে সে খেতে বসল। খেতে খেতে লোকটা মাকে জিজ্ঞেস করল, আজ পাশের বাড়ির মাসিমা এসেছিল?
মা খেতে খেতে বলল, রোজই তো আসে।
—খুব গল্প হল?
—রোজই তো হয়।
—তুমি তোমার বউমার খুব প্রশংসা করলে?
—রোজই তো করি।
—বলেছ, বউমার রান্নার তুলনা হয় না?
—বলেছি, বেশ করেছি। বাইরের লোকের কাছে ঘরের বউয়ের নিন্দে করব নাকি?
—রাগছ কেন? এমনি কথাটা জিজ্ঞেস করছি।
তারপর লোকটা চুপ করে গেল। মুখ নীচু করে খেতে লাগল। খেতে খেতে একটু পরেই আবার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, তুমিও নিশ্চয় কথায় কথায় মা-র খুব প্রশংসা করলে?
—কী প্রশংসা করেছি?
—তুমি বলেছ মা-র সেলাই-এর হাত অপূর্ব। তুমি বলেছ এমন সেলাইয়ের হাত সচরাচর দেখা যায় না। ঠিক বলছি?
স্ত্রী একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, বলো তো, আর কী বলেছি?
—তুমি বলেছ মা-র সেলাই নিয়ে একটা একজিবিশন করা উচিত। বলেছ?
—বলেছি। তাতে কী হয়েছে?
—কিছু হয়নি। এমনি জিজ্ঞেস করছি।
লোকটা আর কথা না বলে খেতে লাগল। খেতে খেতে একটু পরে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, আজ জগদীশবাবু এসেছিলেন?
বাবা খেতে খেতে উত্তর দিল, উনি তো প্রায়ই আসেন।
লোকটা জিজ্ঞেস করল, তোমার বউমা চা করেছিল?
—বউমাই তো করে।
—জগদীশবাবু চা খেতে খেতে নিশ্চয় তোমার বউমার তৈরি চায়ের তারিফ

করেছিলেন?

—হ্যাঁ। সত্যি, বউমা খুব ভালো চা করে।

—তুমি জগদীশবাবুকে বলেছ তোমার খুব ভাগ্য যে এমন বউমা পেয়েছ।

—বলেছি তো কী হয়েছে?

—কী আবার হবে! এমনি জিজ্ঞেস করছি।

লোকটা তারপর চুপ করে খেতে লাগল। খেতে খেতে বোনকে জিজ্ঞেস করল। বউদি আজ তোকে আইসক্রিম খাইয়েছে?

বোন বলল, রোজই তো খাওয়ায়।

—স্কুলের অঙ্ক কষে দিয়েছে?

—রোজই তো কষে দেয়।

—মাঝে মাঝে বকুনি খেয়েছিস?

—রোজই তো খাই। তাতে কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি, এমনি। —বলে একটু থেমে ভাইকে জিজ্ঞেস করল, বউদি আজ তোকে এগরোল খাইয়েছে?

—প্রায়ই খাওয়ায়।

—গানের ক্যাসেট কেনার টাকা দিয়েছে?

—প্রায়ই দেয়।

—একটা সিনেমা দেখাবে বলেছে?

—প্রায়ই বলে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি, এমনি।

লোকটা তারপর খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। তার মেয়ে এখন ঠাকুরমার বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে যদি জেগে থাকত, লোকটা বোধহয় তাকেও ছাড়ত না। কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করত। ফলে লোকটা হাতমুখ ধুয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকল। এখন তার ঘুম পাচ্ছিল। বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে লোকটা বাড়ি ঢুকে ঘরে বসতে না বসতেই আবার তার স্ত্রী এসে দাঁড়াল। লোকটা স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, আজ তরকারিতে নুন কম দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—মা বলেছে বাপের বাড়ি থেকে কিছুই শিখে আসনি?

—হ্যাঁ।

—তুমি তাতে রেগে গিয়ে মা-র সঙ্গে তর্ক করেছ?

—হ্যাঁ।

—বাবাও তোমাকে খুব বকেছে?

—হ্যাঁ।

—যাও, এক কাপ চা করে নিয়ে এস। আমি এখনি বেরোব। ■

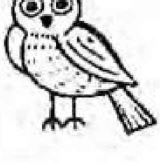

স্ব নি র্বা চি ত গ ল্প ৩

দি নে র শে ষে

একদিন আমাদের গোপন ভালোবাসা সকলের চোখে ধরা পড়ল। কেউ আঁতকে উঠল, কেউ থুতু ছেটাল।

সে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হবে?

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভয় পেওনা।

তবু তার ভয় গেল না। জানতে চাইল, আমরা এখন কী করব?

বললাম, চলো, এখান থেকে আমরা চলে পরে ভালো ঘর পেলে চলে যাব।

আমাদের ভীষণ খিদে পাচ্ছিল। অথচ কাছে পয়সা ছিল না। সঙ্গে যা এনেছিলাম তা ঘরের সেলামি দিতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। ফলে শুধু জল খেয়ে থাকতে হল।

আমরা সারারাত জেগে রইলাম। আমাদের চোখে ঘুম এল না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা পাক খেতে লাগল।

শেষে একটা সরু নোংরা গলির মধ্যে একটা ছোট ঘরে আমাদের আশ্রয় নিতে হল। ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ঘর। এখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। বাতাস খেলা করে না। ঘরে পা দিয়ে সে ভয় পেয়ে গেল। বলল, আমাদের এখানে থাকতে হবে!

যাই।

সে রাজি হল। তারপর আমরা সারাদিন একটা ভালো ঘর খুঁজে বেড়ালাম। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেলাম। দক্ষিণ থেকে পুবে গেলাম, পশ্চিমে গেলাম। আমাদের পা ব্যথা হয়ে গেল। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল।

সে বলল, আর পারছি না।

আমি বললাম, আমিও না।

সে বলল, আমার কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, আমারও।

সে জিজ্ঞেস করল, তাহলে?

বললাম, আরেকটু চেষ্টা করি।

সে এ কথায় চুপ করে গেল। আর কিছু বলল না।

আমরা ঘর খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু ভালো ঘর কোথাও পেলাম না। শেষে একটা সরু নোংরা গলির মধ্যে একটা ছোট ঘরে আমাদের আশ্রয় নিতে হল। ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ঘর। এখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। বাতাস খেলা করে না। ঘরে পা দিয়ে সে ভয় পেয়ে গেল। বলল, আমাদের এখানে থাকতে হবে!

আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম, চিন্তা কোরো না। কটা রাত এখানে কষ্ট করে কাটাও।

পরদিন সকালে তাকে ঘরের মধ্যে একা রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

বললাম, কাজের খোঁজে।

সারাদিন পয়সার জন্য শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। প্রচণ্ড রোদে আমার শরীর পুড়ে গেল। দিনের শেষে যখন সন্ধে নামল তখন ঘরে ফিরে এলাম। আমার হাত ভর্তি খাবার।

ঘরে আলো জ্বেলে আমার জন্য সে বসে ছিল। আগের রাতে তার খাওয়া হয়নি। আজও সারাদিন কিছু খায়নি। তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। দেখে ভীষণ কষ্ট হল। বললাম, ফিরতে দেরি হল। কিছু মনে করো না।

সে কোনও উত্তর দিল না। না দিয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, অমন করে কী দেখছ?

সে আমার হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিছু না।

আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখি, মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছে। ■

সাময়িক পত্রে সেকালের লেখা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'

বারিদবরণ ঘোষ

৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার প্রায় সব লেখাই সম্পাদকের, আটটির মধ্যে পাঁচটি। বাঙালি পড়ল একটা পাগল-করা উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'।

বঙ্কিম সারকথাটি বলে নিলেন— বাঙালি একটি ব্লটিং পেপার জাতীয় জাতি।

"অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল"— রবীন্দ্রনাথ।

"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।'... বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"— রবীন্দ্রনাথ। "বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় লোকচক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল।"— শিবনাথ শাস্ত্রী।

এক একটা বছর পৃথিবীতে আসে আর একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দটি ঠিক এমনি একটা স্মরণযোগ্য বছর। এবছরেই বাংলায় জাতীয় নাট্যশালা গড়ে ওঠে, নীলদর্পণ নাটক মঞ্চস্থ হয় আর বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ পায়। বঙ্গদর্শন শুধু বাংলাকে দেখা নয়, এই মাসিক পত্রিকায় বাঙালি নিজেকে দেখতে পেল। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় পত্রিকার নামটা যদি বঙ্কিম একটু বদলে বঙ্কিমী ঢঙে 'বঙ্গদর্পণ' রাখতেন তো খুব উপযুক্ত হত। এই আয়নাতেই তো বাঙালি নিজের স্বরূপটা দেখবার অবকাশ পেল— তার অন্তঃসার এবং অন্তঃসারশূন্যতা দুটো প্রতিবিম্বই একেবারে নিঃশেষে ধরা দিলে। বঙ্কিম পশ্চিমী দর্শনকে একেবারে আমাদের আঙিনায় এনে দিলেন। রুশোর সাম্যবাদ আর উদারনীতি, বেন্থাম আর মিলের হিতবাদ বাঙালির সমাজ আর সাহিত্যকে একেবারে উলোট-পালোট করে দিতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন— বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। তাঁর হাত ধরে, তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর চর্চায় বাঙালি, ভারতবাসী তার নিজের ইতিহাস জানতে পারল। বিদেশী ঐতিহাসিক আর মাইনে-করা ওয়াকেয়ানবিশ দলের মনগড়া ইতিহাসের বিকৃতি বঙ্কিমকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বাঙালি তার সত্যইতিকথা জানতে পারল কখনও সুলিখিত প্রবন্ধে, কখনও বা উপন্যাস-কাহিনির রসে মজিয়ে।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে রয়েছেন, সেখান থেকেই সব আয়োজন সারলেন। তারপরে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের ১ নম্বর পিপুলপটি লেন থেকে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের প্রথম প্রভাতে ছেপে বের হল 'বঙ্গদর্শন'— প্রথম সংখ্যাতেই গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজারে। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার প্রায় সব লেখাই সম্পাদকের, আটটির মধ্যে পাঁচটি। বাঙালি পড়ল একটা পাগল-করা উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। যাঁরা বাংলা পড়তে নাক কুঁচকে বসেন তাঁরাও পরে এর ইংরিজি অনুবাদ 'Poison Tree' পড়ে 'উন্মাদ' হয়েছিলেন। বাঙালি একেবারে পাগল— নগেন্দ্র, সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনীকে পেয়ে। 'নগেন্দ্রে'র ঘরে তখন কত সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনীর ঘোরাফেরা। বাঙালি মেয়েরা যখন বলছেন— আমাকে আর ভালবাসা বোঝাসনি ভাই, আমি হলেম গিয়ে সাতছেলের মা। সন্তান সংখ্যা যার যতো বেশি তার স্বামীর ভালবাসার নাকি ততই পরিমাণ বেশি; আর তখন সূর্যমুখী নগেন্দ্রের শয়নঘরের দেওয়ালে আঁকা একটা ছবির নীচে লিখে রাখেন... কী লিখে রাখেন— একটু পড়ি 'চতুশ্চত্বারিংশত্তম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গদর্শনের পাতায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারতমহিলা' প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিম বলে উঠেছিলেন— 'তুমি এমন **বাংলা লিখিতে** শিখিলে কী করিয়া?'

'রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার **বঙ্কিম একাকী** গ্রহণ করাতেই বঙ্গ-সাহিত্য এত সত্বর এক দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।'

পরিচ্ছেদ'-এর 'স্তিমিত প্রদীপ' থেকে।

"আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। ... প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ... তাহার একদিকে ভর করিয়া ... দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে ... সুবর্ণ রাশি স্তূপীকৃত ... তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উর্ধ্বোত্থিত হইতেছে না। তুলাপার্শ্বে সত্যভামা ... তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন ... পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রুক্মিণী ... আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। ... শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না। ... এই চিত্রের নীচে সূর্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে, সোনারূপার তুলা?"

প্রেম-ভালবাসা যে কী 'বস্তু' তা বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাসে স্পষ্ট করে দিলেন। আসলে 'পত্রসূচনা'য় বঙ্কিম তো বলেই দিয়েছিলেন— যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। বঙ্কিম সারকথাটি বলে দিলেন— বাঙালি একটি ব্লটিং পেপার জাতীয় জাতি। অধিকমন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ কঠিন কথাটি উচ্চারণ করে গেছেন— 'সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন— সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।...'

এই কঠিন লোকটাই কিন্তু বাঙালিকে আসল বাংলা শেখাবার কাজটা করে গেলেন। এই বঙ্গদর্শনের পাতায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারতমহিলা' প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিম বলে উঠেছিলেন— 'তুমি এমন বাংলা লিখিতে শিখিলে কী করিয়া?' শাস্ত্রী মশায় উত্তর দিয়েছিলেন— 'আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।'

'বঙ্গদর্শন'-এর পুরনো ফাইল পড়তে গেলে পুরনো লাইব্রেরিতে যেতে হবে। পরে ন্যাশনাল লিটেরেচার কোম্পানি হুবহু ছাপলেও তা পাওয়া যায় না। কলেজ স্ট্রিটে যা পাওয়া যায়— তাকে অনেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। সে যাকগে— একটা খবর জানানো যাক। 'বিষবৃক্ষ' যেমন ছাপা হয় এখানে তেমনি ছাপা হয়েছিল 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' আর 'রাজসিংহ'ও। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম 'মার্কা-মারা হিন্দু', অন্যত্র মুসলমানদের 'যবন' বলেছেন— তিনি প্রবল 'মুসলমান-বিরোধী' হিসেবে একশ্রেণীর পাঠকের কাছে চিহ্নিত হয়ে আছেন আজও। এই অভিযোগ বিষয়ে বঙ্গদর্শনের আশ্বিন ১২৮০ সংখ্যায় ছাপা শ্রীযঃ-এর লেখা 'জাতিভেদ' প্রবন্ধের কয়েকটা লাইনে চোখ আটকে গেল। লাইন কয়টা তুলেই দিই না— 'মুসলমানদিগকে বাঙ্গালি জাতি হইতে বর্জন করিলে আমাদিগের দেহের অর্ধেক পরিত্যক্ত হইবেক। যে-ব্রহ্মার শরীর হইতে চতুর্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল এখনকার হিন্দু-মুসলমানরাও সেই ব্রহ্মার অঙ্গ। অতএব পরস্পরের সৌহৃদ্য বাঞ্ছনীয়।' লেখকের নামটি পরে জানতে পেরেছি— যোগেশচন্দ্র ঘোষ। ঘোষ মশায় আরও বলেছেন যে এককালে মুসলমান প্রভুত্ব করলেও এখন হিন্দু মুসলমান সমান। আমি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাটি উল্টে দেখলাম, সম্পাদকের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই।

সত্যিকথা বলতে গেলে বার বার রবিঠাকুরের কাছে শরণ নিতে হয়। তিনি ওই যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী বলে গেছেন— 'রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ-সাহিত্য এত সত্বর এক দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।' কিন্তু তাতে উল্টা বুঝিলি রামও হয়েছিল— 'শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র তথা 'বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ' অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম বলেছেন যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এটি প্রকাশ করেন 'তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।' কিন্তু সবাই কথা শোনেন না। এক বছর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে আবার ভাই সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বের হল তথা 'পুনর্জীবিত' হল। বঙ্কিমও লিখতে লাগলেন। কিন্তু 'বাঁকা চাঁদের' শোভা আর তেমন করে 'সঞ্জীবিত' হতে পারল কই! তারপরেও আবার রবীন্দ্রনাথ এবং আরও পরে মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শন' বের করলেন। সেসব কথা পরে বলা যাবে। অলমিতি।

মেঘনাদবধ কাব্যের এক পাঠক

‘এই একটা অদ্ভুত genius তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মতো দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।’

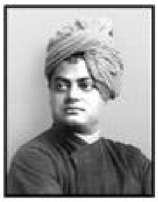

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে
স্বামী বিবেকানন্দ

মোঙ্গোলিয়ার কবিতা

অনুবাদ : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছবি মোঙ্গোলিয়ার শিল্পীর আঁকা

ব্রহ্মাণ্ডের তিন খামতি

আকাশের অবলম্বন নেই
সমুদ্রের ঢাকনা নেই
ভূমণ্ডলের কোমরবন্ধ নেই

ব্রহ্মাণ্ডের তিন ধন

আকাশ তারায় ধনী
মাটি শিকড়ে ধনী
সমুদ্র সলিলে ধনী

ব্রহ্মাণ্ডের তিন শূন্য

তীব্র তীক্ষ্ণ জোরালো হলেও, প্রতিধ্বনি শূন্য একেবারে
যতই প্রগাঢ় হোক, মরীচিকা শূন্য একেবারে
যতই বাস্তব মনে হোক— স্বপ্ন তো শূন্য একেবারে

'ব্রহ্মাণ্ডের তিন' নামে অজ্ঞাতনামা
কবিদের লেখা এই শ্রেণীর কবিতা
মোঙ্গোলিয়ার চিরাচরিত লোককাব্যে
অতি বিশিষ্ট ও সম্মানিত স্থানের অধিকারী।

একজোড়া লিপি

যদিও অরণ্য আর পর্বত কখনো বুড়ো হয় না
তুষারে তবুও তাদের মাথা সাদা হয়
যদিও নদীর জল অসুখে ভোগে না
বাতাস তবুও জলে বলীরেখা আঁকে

গুনাচুগ (১৮৩২-১৮৬৬)

সুন্দরীতমা

সুন্দরীতমা নারী
পুরুষদের হৃদয় চুরির বিরাট ওস্তাদ,
বহু ভগ্নহৃদয়ের সমরক্ষেত্র।

তার অতুল বিভার দখল নিতে
মহারণে মত্ত শত হৃদয়।
শেষে পড়ে থাকে
ক্ষতবিক্ষত ৯৯।

এন. নিয়ামদোর্জ (১৯৪৬-১৯৯৬)

নীল মোমবাতির লিপি

বিশ্বের ঘটনাবলি বাচ্চাদের খেলাধুলোর মতো—
লোকে সেসব কেন বিশ্বাস করে?
পৃথিবীর আসল স্বাদ জানতে হলে আগে ফোঁড়ার স্বাদ নাও
বহুধা এই প্রকৃতি বুঝতে হলে ফুলের ওপর চোখ সেঁটে রাখো

গুলিরানসা (১৮২০-১৮৫১)

মানুষ যদি কবিতাকে চূড়ান্ত আয়ত্ত করতে পারে
শয়তান আর রাক্ষসের ভীতির কারণ হবে সে।

কিশিগবাতু (১৮৪৯-১৯১৬)

মোঙ্গোলিয়ায় নাদাম উৎসবে স্বরধ্বনি শিল্পী
ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

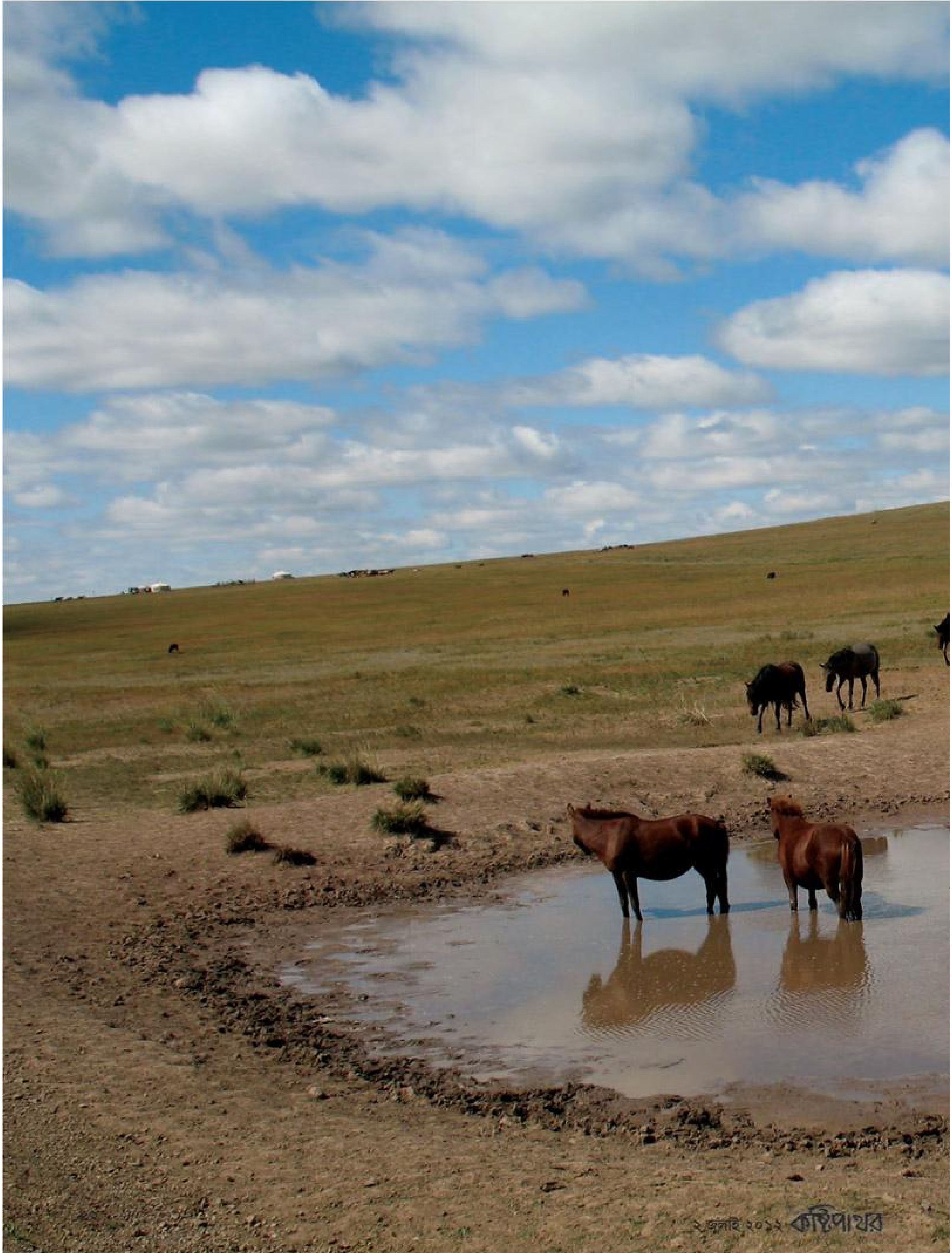

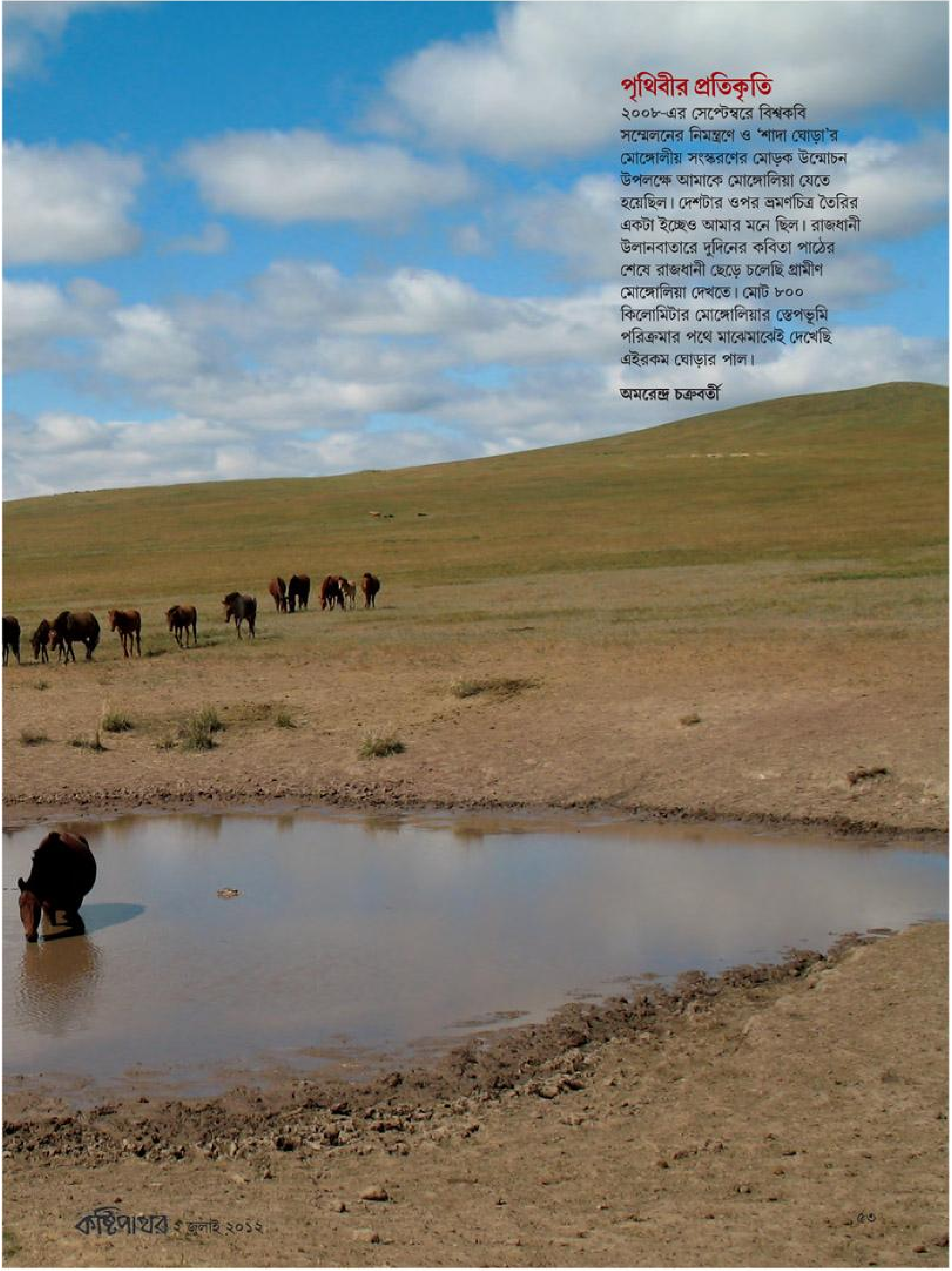

পৃথিবীর প্রতিকৃতি

২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে বিশ্বকবি সম্মেলনের নিমন্ত্রণে ও 'শাদা ঘোড়া'র মোঙ্গোলীয় সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে আমাকে মোঙ্গোলিয়া যেতে হয়েছিল। দেশটার ওপর ভ্রমণচিত্র তৈরির একটা ইচ্ছেও আমার মনে ছিল। রাজধানী উলানবাতারে দুদিনের কবিতা পাঠের শেষে রাজধানী ছেড়ে চলেছি গ্রামীণ মোঙ্গোলিয়া দেখতে। মোট ৮০০ কিলোমিটার মোঙ্গোলিয়ার স্তেপভূমি পরিক্রমার পথে মাঝেমাঝেই দেখেছি এইরকম ঘোড়ার পাল।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বই ও পত্রিকা

প্রাপ্তিস্বীকার

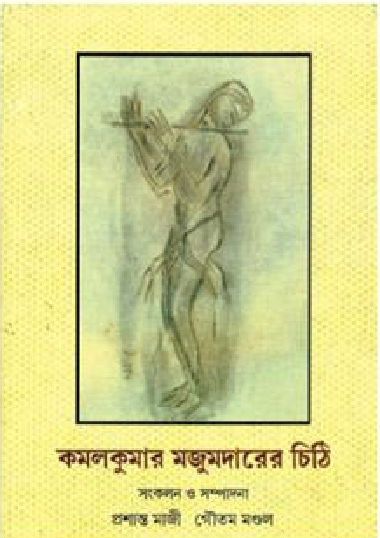

কমলকুমার মজুমদারের চিঠি
সংকলন ও সম্পাদনা : প্রশান্ত মাজী ও গৌতম মণ্ডল। প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১২। দাম ১৫০ টাকা।

পুলকিত যামিনী
শ্যামলকান্তি দাশ। প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০০৮। দাম ৫০ টাকা।

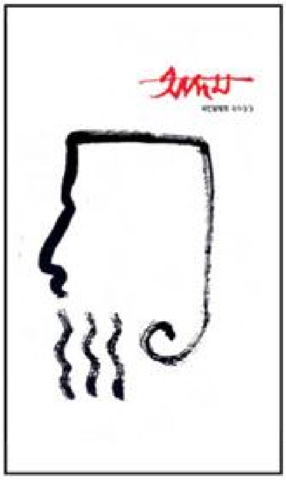

আদম
সম্পাদক: গৌতম মণ্ডল। নভেম্বর ২০১১। দাম ২০০ টাকা।

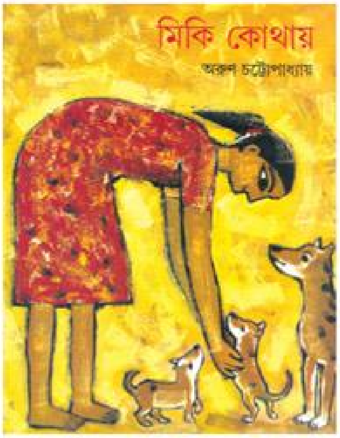

মিকি কোথায়
অরুণ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৪। দাম ৩৫ টাকা।

রিভিউ প্রিভিউ
সম্পাদক: মারুফ হোসেন। গ্রীষ্ম ১৪১৯। দাম ১০ টাকা।

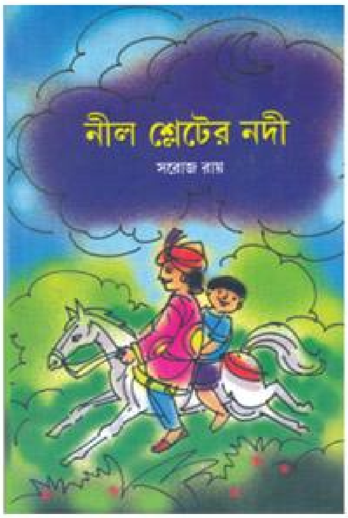

নীল শ্লেটের নদী
সরোজ রায়। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২। দাম ৪০ টাকা।

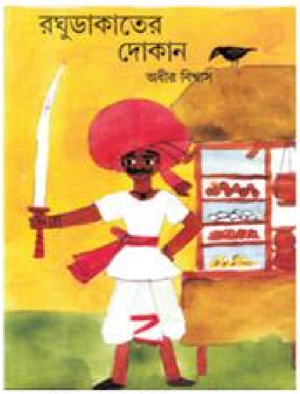

রঘুডাকাতের দোকান
অধীর বিশ্বাস। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০২। দাম ২৫ টাকা।

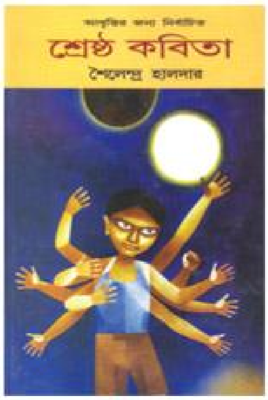

আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা
শৈলেন্দ্র হালদার। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২। দাম ১২০ টাকা।

কবিতা-পরিচয়

কবিতা-পরিচয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

'কবিতা-পরিচয়'-এর ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি, কবিতা নিয়ে আমার প্রবল মগ্নতার বয়েসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে এসে খুব অসহায় বোধ করি। ক্লাসে আমার কোনও কোনও প্রিয় ইউরোপীয় কবিকেও প্রায় দার্শনিকের চেহারায় পরিচিত হতে দেখে আমি সহ্য করতে পারতাম না। লাইব্রেরিতে পালাতাম, মানুষ যেভাবে অপছন্দের সংসার ছেড়ে অরণ্যে-পাহাড়ে যায়, অনেকটা সেইরকম। সেখানেও একই হতাশা। এমনিতে কবিদের নিয়ে, কবিতা নিয়ে কোনও আলোচনাবই দেখলেই আমার তখন ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ার অবস্থা। কবিতা এতই প্রাণের জিনিস, তা নিয়ে আস্ত একটা বই, পুরো বইটাই আমার কানে কবিতার কথা শোনাবে! এরকম হাতের নাগালে যা পাই রুদ্ধশ্বাসে পড়ি ও দীর্ঘশ্বাস ফেলি। দীর্ঘশ্বাস এই ভেবে যে, যাঁরা আমার প্রাণের কবি তাঁরা তবে কি প্রকৃতি, ধর্ম, ঈশ্বর, সভ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে শুধুই নিজেদের বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিকতা বেশ আটসাঁটোভাবে শোনাবার জন্য তাঁদের জীবনযাপন নিংড়ে দেন কবিতায়? সত্যিকার কবিতামাত্রই তো পাঠকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে। প্রকৃতি, ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর বক্তব্য নয়, পাঠকের শরীরের রক্ত ও গায়ের চামড়া ছুঁয়ে দুর্বিষহ কথা বলা। এমনকি তার ফিসফিস আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায়। আলোচনাবইয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কিছুই মেলে না কেন? কবিতা সেখানে দুপুরের রাস্তায় বিজলি বাতির মতন কুঁকড়ে থাকে।

এই রাগ আর অভিমান আরও প্রবল হয়েছিল আমাদের নতুন বাংলা কবিতার দিকে তাকিয়ে। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতার শব্দ, ছন্দ, কাঠামো, স্বরভঙ্গি কত বিচিত্রভাবে কী সাংঘাতিক রকম বদলে গেছে, সকলেই জানেন। সূক্ষ্ম, বক্র, জটিল, রহস্য ও বিচ্ছুরণময় এইসব রচনার আনাচে-কানাচে পুরনো কালের চোখ নিয়ে যে আর বেশি দূর দেখা যাবে না, সে-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

তখন রাগ আর অভিমানেরই বয়েস। মনের

পরের পাতায়

গোধূলিসন্ধির নৃত্য : জীবনানন্দ দাশ

দরদালানের ভিড়— পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে— শব্দহীন— ভাঙা
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল— রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরিতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া— নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ— মধুকুপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো:
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে: নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে— বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে— জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক— কর্কট— তুলা— মীন।

সেই অবস্থায় 'কবিতা-পরিচয়'-এর খসড়া মাথায় আসে। এরকম অনেক ভাবনাই আমার মনে আসে আবার যথাসময়ে ভেঙেও যায়। 'কবিতা-পরিচয়'-এর কল্পনাটা দেখলাম ক্রমেই একটা জেদে দাঁড়িয়ে গেল।

একেকটি কবিতার আমূল পরিচয় কীভাবে তুলে আনা যাবে, তা নিয়ে আমার তখনকার অল্পবয়সের ভাবনা যখন পত্রিকার সম্ভাব্য লেখকদের কাছে ব্যাখ্যা করতাম, তাঁরা যে কী পরিমাণ প্রশ্রয় সহকারে আমাকে সহ্য করতেন সেটা তখন বুঝিনি, এখন বুঝে লজ্জা পাই। আমাদের মাথায় কবিতাপাঠের যে-রীতি দানা বাঁধছিল তার হুবহু রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে এবং অল্পবয়সের অবিদ্যায় কারও কারও কোনও কোনও লেখা কখনও কখনও নিষ্ঠুরভাবে কাটছাঁটও করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রেও তাঁদের ক্ষমা ও উদারতার কথা ভেবে এখন একই সঙ্গে আশ্চর্য ও অপরাধী মনে হয়। এঁরা প্রায় সকলেই আমার অগ্রজ ও শ্রদ্ধাস্পদ। সকলেই প্রখ্যাত কবি কিংবা প্রতিষ্ঠিত সমালোচক। কিংবা দুই-ই।

১৯৬৬ থেকে, যতদূর মনে পড়ছে হয়তো ৬৮ পর্যন্ত, খুবই এলোমেলোভাবে 'কবিতা-পরিচয়'-এর এগারোটি সংকলন বেরিয়েছিল। তারপরে আর-একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে কোনও কবিতার আলোচনা ছিল না। ছিল কবিতা লেখা নিয়ে দেশকালজড়িত কয়েকটি প্রশ্ন ও কবিদের উত্তর।

'কবিতা-পরিচয়'-এর ব্যাকুল দিনগুলিতে আমাদের মনে প্রধান তাগিদ ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিককালে প্রসারিত, অভিজ্ঞতায় দুরূহ ও রূপে জটিল নতুন বাংলা কবিতার যতদূর-সম্ভব-সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণে। যেহেতু কবিতা কেবল তার গদ্যার্থ নয়, বা কবির বক্তব্য-প্রকাশক নিবন্ধমাত্র না, নিছক ছন্দ-মিলের অহেতুক কারুকর্মও না, ভাষায় রচিত শিল্পবিশেষ, এক অনিবার্য রূপসৃষ্টি, যেহেতু এই রূপের মধ্যে ধরা আছে কবিতা, এবং রূপের সমগ্রতাই কবিতা, সেই জন্যই কবিতা-আলোচনায় আমাদের মূল মনোযোগ ছিল কাব্যরূপে, তার শব্দ-সন্ধান ও-সংস্থাপনে, এমনকি শব্দের সকল সম্ভাব্য অনুষঙ্গ ও সাংগীতিক নির্দেশেও লক্ষ করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বিশেষ করে বলবার কথা এই ছিল যে, কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে, অন্তঃস্থ কল্পনাশৃঙ্খলার এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের এবং সব অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য সন্ধানে এই সবই, কবিতার সমস্তই আরও বেশি স্বচ্ছ হওয়া সম্ভব।

'কবিতা-পরিচয়'-এর কবিতা-আলোচনার এই রীতি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। কেবল একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, নতুন কবিতাই ছিল আমাদের সমালোচনার প্রধান শিক্ষাস্থল, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবি-সমালোচকের কাব্যচর্চার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

ডিসেম্বর, ১৯৮১

কয়েকটি সর্বনাশপন্থী নারী কোথাও এক জঙ্গলের মধ্যে সদ্য জ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে। তাদের ঘিরে কয়েকটি নবীন পুরুষ। কবিতাটির 'বিষয়' এইটুকুই— আর কিছু নেই— এখন, এর পর নানা রকম তত্ত্ব-গবেষণা ও মাথার চুল ছেঁড়া যেতে পারে। কিন্তু কবিতাটি এইটুকুই।

যাই হোক, এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলতে চাই, জীবনানন্দ দাশ ভুল ছন্দ লিখতেন কেন? আমি কিছুতেই এর উত্তর খুঁজে পাই না। ভুল ছন্দের জন্য তাঁর কবিতার কোথাও একটুও ক্ষতি হয়নি, অনেক জায়গায় বরং শব্দবন্ধ গাঢ় হয়েছে, অনেক জায়গায় অবশ্য তেমন সুফল হয়নি, কিন্তু, তিনি ভুল ছন্দ লিখতেন কেন এবং কী করে? 'জ্যোৎস্নায়' এবং 'নিস্তব্ধতা' এই শব্দ দুটির আগে পরে দুটি করে ড্যাশ দিয়ে দুই মাত্রা সরানো হয়েছে, তাতে জ্যোৎস্না ও নিস্তব্ধতা উভয়েই অতীব প্রগাঢ় বিলম্বিত, কিন্তু 'কৃতকর্ম নবীন' ও 'রৌদ্রের দিন' কেন লিখেছিলেন তার কোনও উত্তর নেই। কেননা, তিনি তো অটোম্যাটিক রাইটিং বা মনে যে-রকম শব্দ আসছে ঠিক সেইরকমই লিখে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রতিটি লাইনই অত্যন্ত চিন্তিত রচনা। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ১৪৪ পাতায় পাণ্ডুলিপির সেই ভয়াবহ ফটোগ্রাফ স্মরণ করা যাক। একটা কবিতা নিয়ে ও-রকম কাটাকুটি মানুষের কল্পনাতীত। কবিতা লেখার পর কাটাকুটি হয় কোনও-কোনও শব্দ বদল, ছন্দ আঁট করা, কোনও লাইন বর্জন বা নতুন যোগ করা, এই জন্য। কিন্তু, ও-রকম কাটাকুটি করে, ইচ্ছে করে, কবিতায় ভুল ছন্দ, এলোমেলো বন্ধন, আপন-ভোলা রূপ ফোটাবার প্রয়াস ছিল তাঁর। সুতরাং, জীবনানন্দ দাশকে উদাসীন, আলগা স্বভাবের কবি কিছুতেই মনে করা যায় না। তিনি জানতেন, এইটাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ডিকশন, কবিতায় এক অভিনব এবং অলৌকিক রীতি, এবং তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টায় তাঁর কবিতাকে এইরকমভাবে প্রস্তুত করতেন। সুতরাং মালার্মে কিংবা এজরা পাউন্ডের কবিতার মতো কিংবা তাঁর সমসাময়িক এবং আত্মীয় ধরণের কবি ফ্রাঁসিস পঁজ-এর রচনার মতো জীবনানন্দের কবিতার প্রতি শব্দের ব্যাখ্যা বা মানে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, খোঁজা উচিতও নয়। স্বদেশী কবিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম, তবু মনে হয়, আধুনিক পৃথিবীর কোনও ভাষাতেই একজন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি ভুল ছন্দ লিখেছেন বারবার, এর আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

নিজের কবিতার নানান ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই কবি সচেতন। পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গেও কবিকে যুক্ত থাকতে হবে— এ-কথাও তিনি লিখেছেন। সুতরাং, অতিসচেতনভাবে কবিতাকে পাঠক ও সমালোচকের ধরা-ছোঁয়ার বহু উর্ধ্বে রহস্যময় লোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কবিতার এই রহস্যকে আমরা ভাঙব না।

ছন্দ অমন আলগা, অথচ মিলের জন্য ভারি লোভ দেখা যায়। যেখানে-সেখানে লাইনের শেষে মিল দিতে চান। মিলের জন্যই এসেছে 'হৃৎকণ্ঠের তৃণ', এবং ফট করে অন্ধকার ঘরের জানলা খুলে যাবার জন্য লাইনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবিতার মধ্যে আবহাওয়া সৃষ্টিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক, শব্দার্থের চেয়ে শব্দের পাশে শব্দের মানিয়ে যাওয়া। এই জন্যই, তাঁর কবিতায় অনেক শব্দের মানে নেই, মানে হয় না, কিন্তু প্রতিটি শব্দই অবধারিত। মিল ছাড়া, তাঁর আর একটি দুর্বলতা হচ্ছে ছোট ছোট অনুপ্রাসের ব্যবহার। অনুপ্রাসের ঝোঁকে যে-শব্দ এসেছে তা অনেক সময়েই নিরর্থক হলেও অভিলষিত। যেমন, এই কবিতায়, 'নরকের নবজাত', 'বাণিজ্যের বেলোয়ারি', 'বিনুনিতে নরকের নির্বচন', 'বাতাসে—বরুণে'। 'আর' কথাটা আছে আটবার, তার মধ্যে আবার একই লাইনে দু-বার— এ-সব দুর্বলতা সমেতও একটা কবিতা কী করে এমন সার্থক হয়ে ওঠে— তার উত্তর কেউ জানবে না।

কবিতার নামের মধ্যে কোনও গভীর অর্থ ঢোকানো তাঁর রীতি নয়। সাধারণত তাঁর নাম থাকে খুব শাদাশিধে, 'হাওয়ার রাত', 'ঘোড়া', 'বুনো হাঁস' 'খেতে প্রান্তরে'— এইসব, অথবা লাইনের আরম্ভ দিয়ে। এখানে, নামের মধ্যে খুব-একটা গভীর ভাব ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন। সেদিক দিয়ে অবশ্য এমন কিছু নয়। এই রচনা একটু উচ্চাভিলাষী, একটা বড় বিষয়কে নির্ভর করতে চেয়েছেন কিন্তু সেটা অকিঞ্চিৎকর, কবিতাটা সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। গোধূলিসন্ধি বলতে সভ্যতার সন্ধিক্ষণ, মহাযুদ্ধে কেঁপে উঠছে যে-সভ্যতা, যেখানে রাত্রি আসন্ন— বিষয় হিসেবে এই কথাগুলো শুনতে বড়, কিন্তু কবিতায় এ-বিষয় ব্যবহৃত বহু ব্যবহৃত, অনেকটা মূল্যহীন, ও-সব চিন্তা কবির ছেলেমানুষি, এ-কবিতায় নৃত্যই প্রধান। এই কবিতার নাম হওয়া উচিত ছিল শুধু 'নৃত্য'। কারণ, বিষয় হিসেবে তিনি যুদ্ধ এবং সভ্যতার সংকট বেছে নিলেও, 'তাতে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন, কবিতায় ঠিক মানাতে পারেননি, সেইজন্য গোধূলির উল্লেখ মাত্র করে মুহূর্তে চলে গেছেন জ্যোৎস্নায়। জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচ যে তাঁর প্রিয় বিষয়। সম্পূর্ণ নাচের উৎসবটাই হচ্ছে জ্যোৎস্নায়, গোধূলিসন্ধি অনেক পিছনে পড়ে রইল, যুদ্ধের পর পৃথিবী সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায়নি।

ঘুমন্ত নারীর বর্ণনা যেমন ভালেরির কবিতায় ফিরে-ফিরে আসে, তেমনি জীবনানন্দের কবিতায় মেয়েদের নাচের উৎসবের কথা বারবার; 'মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে' ('অবসরের গান'), 'ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ' (১৯৪৬-৪৭)। ওদিকে কামানের গর্জনে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাংহাই, যাক, কয়েকটি নাচের পায়ের ভঙ্গির নীচে পড়ে আছে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ, পুরুষরা নিবিড় চুম্বনে সেই নারীদের বিছানায় টেনে নিয়ে গেলেও ঘুমে আর তৃপ্তি নেই। যেখানে পৃথিবী যুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে— সেখানেও ভেসে যাচ্ছে এই নাচের লহরি। বস্তুত এ-কথাই ঠিক, যুদ্ধে আর পৃথিবীর কিছুই ভাঙতে পারবে না, মানুষের নিজের মধ্যে ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে। কবিতার 'বিষয়' এইটুকুই, বাকি সব আবহাওয়া— অর্থাৎ বিষয় বাদ দিয়ে বাকি অংশই কবিতা।

নাচটা হচ্ছে কোথায়— কোনও বিদেশে কি— কেন না 'পৃথিবীর শেষে'। কিন্তু হরিতকী গাছ ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা জানি না, বোধহয় নেই, 'হরিতকী' শব্দটায় এমন সংস্কৃত গন্ধ যে মনে হয় এ-সব গাছ খুবই আমাদের নিজস্ব, বাংলাদেশের গোপন অরণ্যে ভিড় করে থাকে। তা ছাড়া কোনও কারণে, জীবনানন্দ বাংলা-দেশকেই পৃথিবীর শেষ বা পৃথিবীর কোণ বলতেন, 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতায়ও সে-রকম উল্লেখ আছে।

নরেশ গুহ

কবিতা-পরিচয়ের তৃতীয় সংকলনে 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটি বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে-প্রবন্ধটি লিখেছেন সে-বিষয়ে দু-চারটি কথা বলার আছে।

এক॥ ভুলছন্দের অভিযোগ: 'পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন' এবং 'যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন'— ভুল, না মিশ্র ছন্দ? ম-য়ে রেফ এবং র-য়ে ঔকার দুমাত্রা পড়া হচ্ছে, অন্যত্র যদিও একমাত্রা, এই তো? পড়তে কানে লাগছে কি? না-লাগলে ছান্দসিকের তর্ক তোলা কেন? এই কবিতাতেই 'জ্যোৎস্নায়' কথাটিও তো চারমাত্রা! তাছাড়া পয়ার ছন্দে বারোমাত্রার কৌশলী মিশেলও আধুনিক কাব্যে দুষ্প্রাপ্য নয়। তৃতীয়, যে-স্তবকে 'জ্যোৎস্নায়' কথাটি আছে সেখানে দুইমাত্রা পলাতক, তাই বা বলি কী করে? স্পষ্টতই পরের পংক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ছাব্বিশমাত্রা একত্র পড়তে হবে। পড়ে দেখুন, আর গোলমাল ঠেকছে না। বারোমাত্রার হিসেবি ব্যবহার অমিয় চক্রবর্তীও করেন, তবে তাঁর ক্ষেত্রে ছন্দছুট মাত্রাদুটিকে পরের পংক্তি থেকে পুষিয়ে নেওয়া যায় না, এবং সেটা তাঁর উদ্দেশ্যও নয়। 'বৃষ্টি' কবিতা দ্রষ্টব্য।

জীবনানন্দ কখনও-কখনও খারাপ ছন্দ লিখতেন, কিন্তু প্রথমে তাকে ভুল ছন্দ আখ্যা দিয়ে, পরে তাকেই সুখ্যাতি করাটা একটু অদ্ভুত লাগছে। প্রথমে খটকা লাগলেও, ছন্দোগত যে-কারণে কবিতাটি শেষ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়তে হয় তা বোধ করি এই যে, কোনও-কোনও পংক্তি গদ্যের চালে পড়া গেলেও অচিরেই আমরা আবিষ্কার করি যে আগাগোড়াই কবিতাটি ১০ মাত্রা থেকে শুরু করে ৩৪ মাত্রায় বিন্যস্ত। 'আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস' তার আগেকার পংক্তির সঙ্গে না-মিলিয়ে আলাদা করে পড়া যায় কি? 'হরিতকী (হরীতকী?) শাখাদের' ইত্যাদি দুই পংক্তি বিষয়েও এ-কথা খাটে।

ইচ্ছে করে ভুল ছন্দ কোনও কবিই লেখেন না। আলোচ্য কবিতায় আমরা বিভ্রান্ত হই ভুল ছন্দের কারণে নয়, যতিচিহ্নের অসতর্ক ব্যবহারে। 'চুপে চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়' থেকে স্তবকটি পড়ুন, 'চেয়ে দ্যাখে'-র পরে অকস্মাৎ এক সেমিকোলন! আমার বিশ্বাস কবি কোলন দিয়েছিলেন। সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর ডিবের (ডিমের নয়, ভুল ছেপেছেন। চাঁদ রুপোর ডিবের মতো, এ-কথা শুনতে ভালো না-লাগতে পারে, কিন্তু অতিসচেতনভাবে কবি তা-ই লিখেছিলেন) — সেই রুপোর ডিবের মতো চাঁদের মুখ দেখার মতো ঘটনা প্যাঁচা চেয়ে দ্যাখে। দ্যাখা কাজটিও দ্যাখে, ভালো শোনায় না হয়তো, সে-কথা স্বতন্ত্র। কোলন না-দিলে এই অভিপ্রায় ব্যর্থ হবে। 'পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন' পংক্তিও, আমার বিশ্বাস, প্রথমাবধি ভুল ছাপা হয়ে আসছে। মাঝখানকার ওই কোলনটা কেন? পরের পংক্তির কোলনটিও অকারণ। আমরা ধারণা, এটা ছাপাখানারই কারসাজি, কোনও 'অলৌকিক রীতি'র দৃষ্টান্ত নয়।

দুই॥ যত্র-তত্র মিল দেবার লোভেই বা এ-কবিতায় কোথায়? প্রতি স্তবকেই ২য় আর ৪র্থ পংক্তিতে নিয়মিত মিল দেখতে পাচ্ছি। খারাপ মিল আছে, যেমন 'ঘুমে'-র সঙ্গে 'বরুণে'। 'নবীন'-এর সঙ্গে 'তৃণ'-এর মিলও অস্বস্তিকর, নবীন-কে নবীনতা কিংবা তৃণ পড়া যায় না বলেই।

তিন॥ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মানে থাকবে না (কবিতার সুরের উপযোগী মানে)— তা-ও মানা সম্ভব না। যেমন 'হংকং' কথাটা ফট করে আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আসেনি, কেন এসেছে তা কবিতাটি মন দিয়ে পড়লেই কিন্তু ধরা যায়।

চার॥ সুনীলবাবুর 'ব্যাখ্যা' নিয়ে প্রধান অসুবিধে হচ্ছে এই যে, কোথায় কয়েকটি সর্বনাশপন্থীনারী এক জঙ্গলের মধ্যে সদ্যজ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে, তা আমি কবিতাটিতে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার তো ধারণা, এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা। এজন্য নয় যে 'সাতটি তারার তিমির'-এ সেটাই হচ্ছে বাদী সুর, আরও কারণ রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটির শব্দ-ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখুন: ঝরা পাতা, গোপন জল; শব্দহীন ভাঙা দরদালানের পরিবেশ সৃষ্টি করে কবিতাটির শুরু। সূর্য সেখানে 'চুপে চুপে' ডুবে যায়, এবং সৌরমণ্ডলীর সোনার বল আর রুপোর ডিবের বিখ্যাত (নানা প্রাচীন কাব্যে, বিশেষত কালিদাসে) সাক্ষাৎ একা বসে চেয়ে দ্যাখে কোনও মানুষ নয়, পিপুলের গাছে বসা প্যাঁচা। দিঘির ধারের সান্ধ্য স্তব্ধতায় 'নৃমুণ্ডের আবছায়া' কেন? (দরদালানের ভগ্নদশা আভিজাত্য যে-ভিতের ওপর এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার উল্লেখ মনে হচ্ছে না?) যে-নারীরা এ-কবিতার অন্যতম বিষয়, তাদের কি কবিতার সীমার মধ্যে সত্যি কোথাও হতুকি বনে নবীন যুবক সমভিব্যাহারে নৃত্যরত দেখা যাচ্ছে? নাকি বলা হচ্ছে যে তাদের দেহের গড়ন প্রাচীন ভাস্কর্যগত ঈশ্বরীর মতো, এবং তারা কৃতকর্ম ও নবীন পুরুষদের জয় করে নেবার মতো চোখ আর চুলের সংকেতে 'মেধাবিনী'? নিঃশব্দে উৎসারিত প্রকৃতির বিষণ্ণ ঝরাপাতারাও বোধ করি টের পায় 'বিনষ্ট হতেছে সাংহাই' কিন্তু ঘনিষ্ঠ চাঁদের তলায় যূথচারী এই ঈশ্বরীরা পান না। সাংহাই ধ্বংস হোক, কিন্তু তাদের রকমসকম দেখে অনুমান হয় তাদের পায়ের তলায় ইংরেজ-কলোনি হংকঙের আপাত-নিরাপদ ঘাস, এবং খোঁপায় নরকের নবজাত কালিমা। শেষ অংশে প্রথম পংক্তির পরে নিশ্চয়ই কমা হবে, কিন্তু কেন আর মানবীয় ঘুমে সেই ঈশ্বরী রমণীদেরও স্বাদ নেই, আমি জানি না। হয়তো বা বুঝতে হবে— মধ্যযুগীয় আভিজাত্যের কাল শেষ হয়ে এসেছে। ইতিহাসের 'ক্রূর পথ' এই নিস্তেজ, নিরুদ্বেগ, নিচু পৃথিবীর মাঠ থেকে রণরক্তময় চূর্ণ, ভূখণ্ডের বাতাস-বরুণকে অতিক্রম করে অন্য এক হরীতকী বনে— জ্যোৎস্নায় এদের নিয়ে যাবে যেখানে নিরাময় লভ্য, এবং যেখানে তুলোর বালিশে মাথা রেখে মানবীয় ঘুমের চাইতে প্রগাঢ়তর চুম্বন কাম্য। কবিতার শেষ তিন পংক্তিতে সেই ভাবীকালের স্বপ্ন। যূথচারী ঈশ্বরীদের পায়ের তলায় সেদিন হংকঙের তৃণ থাকবে না, থাকবে সৃষ্টির রাশিচক্র।

'বিখ্যাত' কথাটির আশ্চর্য প্রয়োগ মনে করিয়ে দেয় 'Among School Children' কবিতায় ওই শব্দেরই ইয়েটস-কৃত অনুরূপ ব্যবহার; সেও ঠাট্টার সুরে বলা: world famous, golden-thighed Pythagoras.

অরুণকুমার সরকার

কবিতা-পরিচয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ সংকলনে জীবনানন্দ দাশের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটির ওপরে যথাক্রমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং নরেশ গুহ-র আলোচনা পড়লাম। প্রথমজন কবিতাটির মধ্যে একটি মনোরম নাচের ছবি দেখতে পেয়েছেন, তাঁর কাছে 'এ-কবিতায় নৃত্যই প্রধান'। দ্বিতীয়জনের ধারণা 'এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা'। উভয়ের মতামতই আমার কাছে খুব মজাদার বলে মনে হল। কেননা আলোচিত কবিতাটি এ-যাবৎ আমার মনে যে-অর্থ বহন করে এসেছে সেটা নাচেরও নয়, ঠাট্টারও নয়, শুনে চমকে উঠবেন না যেন, একটি পরিব্যাপ্ত বিষাদের।

হেগেলের দোহাই না পেড়েও জোরগলায় বলা যেতে পারে যে প্যাঁচা প্রজ্ঞারই প্রতীক। মহাকালেরও। এই কবিতায় যে-ছবিগুলি আসছে যাচ্ছে, তালগোল পাকিয়ে মিশে যাচ্ছে, প্যাঁচাই তার একমাত্র নীরব দর্শক। তার দৃষ্টি মোহমুক্ত। সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর ডিবের মতো চাঁদ— দিনের পর রাত, রাতের পর দিন— তার চোখের সামনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছে। সোনার বল আর রুপোর ডিবের উপমাটা তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই গতানুগতিক এবং কিছুটা-বা শ্লেষাত্মক। এই কবিতায় উপস্থাপিত ছবিগুলি যে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ম্লান জ্যোৎস্নাই তার একমাত্র কারণ নয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত্রিকালের ঘটনা এখানে এসে মিলিত হয়েছে বলেও বটে। হরীতকী শাখার নীচে একটি 'হীরের স্ফুলিঙ্গ'র মতো চৈতন্য-উদ্ভাসিত মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে 'স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস', অর্থাৎ, বর্তমানকালকে; 'নৃমুণ্ডের আবছায়া— নিস্তব্ধতা— বাদামী পাতার ঘ্রাণ', অর্থাৎ, অতীতকালকে: 'মধুকুপী ঘাস', অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালকেও। কবিতাটির বক্তব্য, যে-কোনও ভালো কবিতার মতোই, অতীব সাধারণ। নেহাৎ ছাত্রপাঠ্য ব্যাখ্যার মতো শোনালেও ব্যাপারটা মোটামুটি এইরকম: মানুষের সমস্ত উদ্যম, উত্তেজনা এবং উৎসাহের পিছনে এক বা একাধিক নারীরূপী সৃষ্টিক্রিয়া কাজ করছে। সৃষ্টিধর্ম অদৃষ্টকে স্বীকার করে না, অবধারিতকে পায়ের নীচে রেখে দেয়, নিত্য-নব নরকের, অর্থাৎ নবতম যন্ত্রণাকে ভূমিষ্ঠ করে এবং অবশেষে মানুষকে ক্রূর পথে উলঙ্গ সত্যের সামনে টেনে নিয়ে যায়। তখন, সেই গোধূলিসন্ধির হীরকোজ্জ্বল মুহূর্তে, মানুষের চৈতন্য জেগে ওঠে, বালিশে মাথা রেখে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না, চেয়ে দ্যাখে দরদালানের ধ্বংসস্তূপ, শেষ নিয়তি-নির্দিষ্ট তার যে পরিণতি।

কয়েকটি সংকেত কবিতাটিকে বুঝতে সাহায্য করে। যে-যূথচারী নারীদের এই কবিতায় হাজির করা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে, তারা বিলাসিনী নয়, তারা 'ঈশ্বরী', তারা 'মেধাবিনী'। তাদের শরীরের যে-প্রত্যঙ্গগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলি হল মাথা, চোখ এবং পা। একটি চিন্তার কেন্দ্র, দ্বিতীয়টি দৃষ্টিভঙ্গির, তৃতীয়টি গতির। এই নারীদের চুল আলুলায়িত নয়, তাদের খোঁপা জটিল চিন্তার পরিচায়ক। ফলত, তাদের চুলের বিনুনির মধ্যেই কল্পনা করা হয়েছে 'নরকের নবজাত, নির্বচন মেঘ'কে। মেঘ মানে সম্ভাবনা; নবজাত, তাই এখনও তার কথা ফোটেনি। প্রশ্ন উঠতে পারে নরককে টেনে আনা হল কেন? মানুষের যে-কোনও উদ্যম, মহাকালের চোখে, শেষ পর্যন্ত অনর্থকারী, নবতর যন্ত্রণারই জনক। তাই কি? যাই হোক, এই নারীদের পায়ের নীচে একবার দেখতে পাচ্ছি তৃণদের, অর্থাৎ, নতুন সৃষ্টি এবং আগামীকালের সম্ভাবনাকে, অন্যবার দেখতে পাচ্ছি বৃশ্চিক, কর্কট, তুলা, মীন ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় রাশিচক্রকে। এর মানে হল এই নারীরা ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ অথবা অদৃষ্টকে পদদলিত করছে।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রাহ্য না-হলেও ক্ষতি নেই। ফলত 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' ভিন্নতর কারণেই পাঠককে আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ সম্ভবত এই কবিতার প্রবহমান কালচেতনা। এখানে শুনতে পাচ্ছি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অবিরাম পাতা ঝড়ে পড়ার শব্দ; দেখতে পাচ্ছি জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারে শব্দহীন ভাঙা দরদালানের ভিড়, শত শত সাম্রাজ্যের কীর্তিসৌধ ও মিনার-প্রাসাদের, ধ্বংসাবশেষ; অনুভব করছি গোপন জল ম্লান হয়ে আবার কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আর এই কবিতার যে-কয়েকটি পংক্তি ভূতের মতো পিছু নেয় তা আমাদের জীবনের নিষ্ঠুর অর্থহীনতারই ইঙ্গিতবহনকারী:

এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে-বরুণে
ক্রূর পথে নিয়ে যায় হরিতকী বনে— জ্যোৎস্নায়।

চি ঠি

২ জুন ১৯৬৬

প্রিয়বরেষু,
'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য আন্তরিক তারিফ জানাচ্ছি। খুব ভালো এবং সাহসী চেষ্টা। আশা করি চলবে। আমরা কবিতা-র প্রতি মনোযোগ না দিয়ে যাতে কবির দর্শন-জীবনী ইত্যাদি বিষয়ে মন দিই, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় সফলকাম। তাই এরকম চেষ্টা বিশেষ করেই সার্থক।
অমিয়বাবু-কে এককপি পাঠাবেন? তিনি খুশি হবেন। অনুরোধ করলে লিখতেও পারেন।
শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আমি একজন অল্পশিক্ষিত মিস্ত্রি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি'-র চেয়ে বেশিদূর নয় আমার মতো মিস্ত্রিদের কবিতা-পরিচয়। সুতরাং আমা হেন অধমের পক্ষে 'মনে করো, শিশুর কাঁধে মরার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা— পরপারে বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—' অথবা '—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে বেদনার গাঢ় রসে অপক্ব রক্তিম হলো ফল।' ইত্যাদির রসাস্বাদনের অপারগতার বেদনায় কখনও কোনও নির্জন মুহূর্তে নিষ্ফল মনে হত এই মিস্ত্রির জীবন।
গতবছর আমারই এক সহকর্মী এই দুঃখ অবসানের জন্য আপনার পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু আমি বহু স্টলে খোঁজ করে, বহু বাংলা অনার্স ইত্যাদির কাছে অনুসন্ধান করে এর দেখা আর পাইনি। হঠাৎ গত সপ্তাহে আর এক মিস্ত্রি বন্ধুর কাছে জুন সংখ্যাটি দেখে তার কাছ থেকেই নগদানগদি কিনে ফেলি।
আপনার নিকট তাই এই বঞ্চিত রসপিপাসুর বিনীত নিবেদন এই যে, প্রিভিয়াস ইস্যু কতগুলি আমি পাইতে পারি তাহা যদি অনুগ্রহপূর্বক জানান তবে বড়ই বাধিত হইব এবং আগস্ট হইতে আমি একবৎসরের জন্য গ্রাহক হইতে সমুৎসুক; তবে রেজিঃ ডাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে 'ডাক ও তার' আমার 'কবিতা-পরিচয়'-এ ব্যাঘাত ঘটাইবার সুযোগ কম পাইত। এমতাবস্থায় এক বৎসরের জন্য কত টাকা পাঠাইব তাহা যদি জানিতে পারিতাম, বড়ই সুবিধা হইত।
জুলাই সংখ্যা কি বেরিয়েছে? কলকাতায় কোন কোন স্টলে আমাদের 'কবিতা-পরিচয়' পেতে ব্যর্থমনোরথ হতে হবে না তা কি আপনার পক্ষে জানানো সম্ভব?
অশেষ ধন্যবাদান্তে ইতি, ১৩ জুলাই, ১৯৬৯,

দেবপ্রসাদ দাস
৪/ই, পোড়াবাজার লেন, পোঃ এলগিন রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

গ্রামের পুবদিকে হাসপাতালের চালাঘর, পশ্চিমে মরা নদী। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে তার ওপর দিয়ে ঝিঙে-চিচিঙ্গা বোঝাই গোরুর গাড়ি চলে, রাস্তা সংক্ষেপ করতে চালের সাইকেল ছোটে। পশ্চিমের মরা নদীর ওপার থেকে ফুঁসতে ফুঁসতে কালবৈশাখী এসে পুবের গ্রামীণ হাসপাতালের প্রসবকালীন আর্তনাদও উড়িয়ে নিয়ে যায়। মাইলের পর মাইল শূন্য ভূমির ওপর হাওয়ার শব্দ কখনও হা-রে-রে-রে, কখনও হাহাকারের মতো শোনায়।

মন্থরোর মা সিকিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে সামনের দিকে বৃথা খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'দিন আর কাটে না বাবা। ওজ সুয্যি উঠতিছে, ওজ সুয্যি ডুবতিছে, কিন্তু মনি হয় ঝ্যানো সুয্যি উঠতিছেও না, ডুবতিছেও না।'

একশো বছর আগেও এই নদী বইত। এই সেদিনও খাল, নালা, জল-কাদার চেহারা ধরে আনুমানিক ভাবে বেঁচে ছিল নদীটা। এখন দীর্ঘ বাদা অঞ্চলের পাশাপাশি আরও দীর্ঘ শুধুই নদীর কবর, মাঝে মাঝে দুয়েকটা রক্তমাখা ভাঙা পাঁজরের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া নালা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বাদা শুকিয়ে গেলে খালও শুকিয়ে যায়। গ্রামের বৃদ্ধরা শুধু হাওয়ায় নদীর দীর্ঘশ্বাস শোনে। এ-ভাষাও তাদের। তাদেরই কেউ কেউ এখনও বলাবলি করে— এই নদী বেয়ে ভেলায় লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিল। কেউ বলে লখিন্দরের বাবা চাঁদ সদাগর এ পথে নৌকোযাত্রা করেছিল। কারও কারও মতে, এটা বড় কোনও নদীই নয়, নামহীন একটা শাখানদী মাত্র।

গোটা বালিসোনা গ্রামেই ঘরদোর কম, রাস্তাও কম, একটাই অপ্রশস্ত পিচরাস্তা, তিন জায়গায় বাঁক খেয়ে বড় শহরের দিকে চলে গেছে। সবুজই এগ্রামে বেশি। শুধু বালিসোনা গ্রামেই না, আশপাশের আরও ষোলটি গ্রাম জুড়ে গোটা বালিসোনা অঞ্চলেই অসীম, অঢেল সবুজ।

এতো গাছপালা পরের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই ক্রমশ শেষ হয়ে যাবে। ঘরবাড়ি দোকান-বাজার, সেলুন, টিউটোরিয়াল হোম, মলমূত্ররক্ত পরীক্ষার ক্লিনিক, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টোর‍্যান্ট, আর মানুষের অবিরাম ভিড়ে এই নির্জন গ্রাম সব সময় চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকবে। ক্রমশ এখানে দেখা যাবে অসংখ্য বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন, নার্সিং

হোম (গোপন গর্ভপাতের ব্যবস্থাসহ), লাইসেন্সড ও বিনা লাইসেন্সের বার, মদের দোকান, জুয়ার আড্ডা, রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক অফিস, চওড়া রাস্তা, বাস, লরি, রিকশা, জিপগাড়ির ভিড়।

তখন হারানো নদীরও নতুন আখ্যান রচিত হবে।

হাসপাতালের মাটির ঘরে তার প্রথম সন্তান ফুটফুটে এক কন্যা— প্রতিবেশিনীর মুখে ভর সন্ধেবেলা এই সংবাদ শুনে সদ্য জমিদারি প্রথার অবসানে অসহায় অবনীমোহন চৌধুরী বটতলার জনশূন্যিমোড়ের 'গাঁজা ও আফিংয়ের দোকান' থেকে কেনা এক ডেলা আফিং মুখে ফেলে দিলেন। মাথার ওপর বাপ আর বড় দাদারা থাকায় নিজের মধ্যে তাঁর কখনও জমিদারির বোধ ছিল না। তার ওপর বার বার নিজেদেরই বাগানের আম-কাঁঠাল চুরি করার অপরাধে দুমাস আগে তিনমাসের মেয়াদে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে। জমিদারবাড়ি ছেড়ে এখন কাছেই একটা ছোট একতলা বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা। প্রথম সন্তানও ভূমিষ্ঠ হল তাঁর এই চরম দুঃসময়ে।

তালাক দেওয়ার মতো ত্যাজ্যপুত্র করার আদেশ শুনে ভুবনমোহন চৌধুরীর পঞ্চম সন্তান অবনীমোহন দমকা হাওয়ার মতন বাবার ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'আপনি কি চান সরোজিনীকে নিয়ে আমি হাতানিয়া-দোয়ানিয়ায় গিয়ে ঝাঁপ দিই?'

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের বউ তার ভাগের সকালের জলখাবার এক পোয়া নীলচে দুধ আর সিকি পাউন্ড পাউরুটি নার্সের চোখ এড়িয়ে তার ছেলের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় ঢেলে দিচ্ছে, পাশের খাটিয়ার ছোট জমিদারগিন্নি তাঁর বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখে হাসল। সেই হাসিতে সসংকোচ অপরাধ ও অভ্যস্ত প্রণাম। নার্স চলে যেতে আরও কয়েকজনের আসন্নপ্রসবা স্ত্রী তাদের বরাদ্দ দুধ-পাউরুটি ঘর থেকে আসা তাদের ছেলেমেয়েদের কৌটোয় সন্তর্পণে ঢেলে দিল।

'তোর বাপকেও দিস এট্টু। রোজ দিস তো? গাছ থেকে পড়বার পর একবারে অথব্ব হয়ে গেছে!' এক চাষী-বউ তার চার বছরের ছেলের মাথার চুল হাত দিয়ে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল।

ছেলেটি ডাইনে মৃদু মাথা হেলিয়ে জানায়, দেব। তার চোখদুটিতে সব সময় ঘুমভাঙা স্বপ্নের ঘোর লেগে থাকে, তাই সবাই তাকে নিন্দা বলে ডাকে। ভালো নাম কেউ এখনও দেয়নি।

বাপের নাম ফণাধর পদ্মরাজ। জন্মের পর-পরই শিশুর শিয়রে ফণাধর সাপ এসেও ছোবল না দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল, সেই গল্প দিনে অসংখ্যবার অসংখ্য জনকে বলতে বলতে নামই হয়ে গেল ফণাধর।

ছোট জমিদারগিন্নি সরোজিনীকে তিন বছর আগের ফুলশয্যার রানির সাজ ছাড়াই পরমাসুন্দরী বলে চেনা যায়। শিশুকন্যা সহ রিকশায় তুলে তাদের আলাদা ছোট বাড়িতে নিয়ে গেলেন জমিদার বাড়ির সেজোগিন্নি।

'কী দিয়ে মেয়ের মুখ দেখবে দ্যাখো, ঠাকুরপো!'

অবনীমোহন নিজের ঘরেই দেওয়ালে আয়না ঝুলিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। মেয়ের মুখ দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পিতৃমুখী মেয়ে। যদি তার মায়ের সঙ্গে তাঁরও রূপ পায় তাহলে তো দারুণ সুন্দরী হবে, কিন্তু যদি বাপ-মার ভাগ্যও পায়, তাহলে?

মেয়ের নাম রাখা হল— লক্ষ্মীপ্রতিমা।

ছোট ছেলেকে সাময়িক ত্যাজ্যপুত্র করলেও ভুবনমোহন চৌধুরী তাঁর বড় ছেলের অকালমৃত্যুর পর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৌত্র-পৌত্রীদের আনুমানিক সংখ্যা ধরে সকলের শিক্ষাখাতে সমপরিমাণ অর্থের আলাদা তহবিল তৈরি করে দিয়েছেন। সেই তহবিল থেকে লক্ষ্মীপ্রতিমাকে ভরতি করা হল গ্রামেরই বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ে। কয়েক বছরেই দেখা গেল গণিতে তার অসাধারণ ক্ষমতা। বড় বড় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সে নিমেষে করে ফেলে, অনেক সময় খাতায় না কষে মুখে মুখেই ফল বলে দেয়।

প্রতি বছর ক্লাসে ওঠে ফার্স্ট হয়ে। তার রূপে ক্লাসঘর আলো হয়ে যায়। মায়ের আগ্রহে ও যত্নে চলতে লাগল তার নৃত্যশিক্ষা, ব্যায়াম যোগব্যায়াম। একদিন হেড মিস্ট্রেস নিজে এসে সরোজিনীকে বললেন, 'বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু না বলে পারছি না। আপনার মেয়ের যা রূপ, ওকে আপনি স্কুল ছাড়িয়ে দিন। বাড়িতে রেখে পড়ান, স্কুলের পর একেকদিন একেকজন আমরাই না-হয় স্কুল থেকে এসে ওকে পড়িয়ে যাব। পরে শুধু পরীক্ষাটা সেন্টারে গিয়ে দেবে।'

ফলে তেরো বছর বয়সে তাকে কলকাতায় তার মেজজ্যাঠার বাড়িতে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হল। সেখানে তার বিধবা জ্যাঠতুতো দিদির সস্নেহ তত্ত্বাবধানে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত যাবতীয় লেখাপড়া ও রূপচর্চা।

ভণ্ডুল বরাবর বেলায় গিয়ে রেলস্টেশনের চায়ের দোকান থেকে যোল নয়া পয়সায় 'যুগান্তর' এনে দেয়। 'যুগান্তর' না পেলে পনের নয়ায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। যুগান্তরের প্রথম পাতায় একদিন তাদের লক্ষ্মীপ্রতিমার বড় ফটো দেখে চৌধুরীবাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল।

অবনীমোহনের সন্ধের আফিংয়ের নেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গতবছর নয়া পয়সা চালু হওয়ার আগের মুদ্রা জমানো। মেয়ের রূপ নিয়ে কোনও বিপদের আশংকা তার মনেই আসে না। মেয়ে তার মুখশ্রী পেয়ে রূপবতী হয়ে বেড়ে উঠছে দেখে তার ভালো লাগে। মেয়ের ভাগ্য নিয়েও তার ভয় কেটে গেছে। সে নিজে ম্যাট্রিকে দুবার অঙ্কে ফেল করে তৃতীয়বার ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। মেয়ে প্রথম থেকেই অঙ্কে একশোয় একশো পেয়ে আসছে। গুণেই যখন এতটা তফাৎ, ভাগ্যও তখন নিশ্চয়ই তার বিপরীত হবে।

কতটা বিপরীত তা বোঝা গেল কয়েক বছর পর।

ভণ্ডুল বরাবর বেলায় গিয়ে রেলস্টেশনের চায়ের দোকান থেকে ষোল নয়া পয়সায় 'যুগান্তর' এনে দেয়। 'যুগান্তর' না পেলে পনের নয়ায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। যুগান্তরের প্রথম পাতায় একদিন তাদের লক্ষ্মীপ্রতিমার বড় ফটো দেখে চৌধুরীবাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল। লক্ষ্মীর মাথায় রানির মুকুট। বুকের ওপর উত্তরীয়ের মতো চওড়া ফালির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা— MISS INDIA.

ছোট মেয়ে সরস্বতীপ্রতিমারও বিদ্যাভাগ্য নিয়ে অবনীমোহন যতটা নিশ্চিন্ত, প্রথম জীবনে তার সাংঘাতিক ভাগ্যবিপর্যয় বিষয়ে ততটাই অজ্ঞ ছিল। মেয়ের সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ভুবনমোহনকে কোনওদিন জানানোই হয়নি।

ভুবনমোহনের রোজকার অভ্যাস বিকেল চারটে থেকে সন্ধে নামার আগে পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ি থেকে তিনশো পঞ্চাশ পা হেঁটে এসে রাস্তার ধারে শিরীষগাছের তলায় তাঁর ঠাকুরদার কবরের অদূরে চেয়ারে বসে পথচলতি মানুষকে কুশলজিজ্ঞাসা করবেন। কাউকে কাউকে ডেকে বাড়িতে এসে একদিন ভোজ খেয়ে যাবার নেমন্তন্নও করবেন। তাঁর পরনে রোজই ধপধপে ফিনফিনে ধুতি আর ঘিয়ে রঙের সিল্কের ফতুয়া। আগের আমলের অনেকেই, চাষি, ধোপা, মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, আসা-যাওয়ার পথে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে যায়। তাদেরও নেমন্তন্ন করেন। 'একদিন' মানে কোন দিন তা কখনও বলেন না। যারা তাঁকে চেনে তারা তৎক্ষণাৎ হেসে সম্মতি জানিয়ে যে যার পথে চলে যায়। অচেনাদেরও অনেকে থেমে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহনের কথা শোনে, কেউ অবাক হয়, কেউ 'নিশ্চয়ই আসব একদিন' বলে মুচকি হেসে নিজের পথে এগোয়। কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করে।

সন্ধের ঠিক আগে তার খাস চাকর ভণ্ডুল যখন ভুবনমোহনের পূর্বপুরুষের ভারি চেয়ারটা তুলে নিয়ে যেতে আসে, ভুবনমোহন লাঠি ভর করে তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলেন, 'জেলেদের বলে রাখিস, এবার বড় পুকুরে জাল ফেলতে হবে। চাঁদোখালির গয়লাদের একবার দেখা করতে বলিস। এবার অনেককে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে।'

ভুবনমোহন আগে বসতেন তাঁদের রাসমাঠে, প্রতিবছর রথযাত্রার পরে যেখানে তাঁদের পারিবারিক পাঁচতলা রথ ধুলো খায়, গায়ে মাকড়শা জাল বোনে, চৈত্র-বৈশাখে কাক বুলবুলি বাসা বাঁধে, সেই রথের ছায়ায়। যেদিন রাসমাঠে তেমন তেমন হাওয়া দেয় সেদিন শিরীষের ডালপালা তার মাথায় চামর দোলায়।

এখন বসেন ঠাকুরদার কবরের কাছাকাছি, বাসরাস্তার ধারে।

এই কবর তাঁদের বংশের প্রথম কবর। ঠাকুরদার আমলেই দাহ করার বদলে কবর দেওয়ার সূচনা।

ভুবনমোহনের ঠাকুরদা মুরলীমোহন পরমাসুন্দরী পত্নী কুসুমবালাকে তার প্রথম যৌবনেই হারিয়ে দুঃখে পাগল হয়ে অবিকল-ঘুমন্ত স্ত্রীর শবদেহ আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, 'কুসুমকে আমি পোড়াতে দেব না!'

সবাই মিলে অনেক বুঝিয়েও তাকে শান্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কবিরাজের পরামর্শে নানা কৌশলে অনেকটা আফিং খাইয়ে দেওয়া হল। তাতেও তাঁকে ঘুম পাড়ানো গেল না, তাঁর কুসুমকে কিছুতেই কাছ ছাড়া করবেন না।

শ্মশানযাত্রার পুরো পথটাই তাঁকে শবদেহের পাশাপাশি চলতে দেখা গেল। কয়েকবার তাঁর আকুল অনুনয়-বিনয়ে ফুলে ঢাকা শববাহী খাট তাঁর চোখের নাগালে নামিয়ে আনতে হল। ঘুমন্ত কুসুমবালার মুখ থেকে তিনি চোখ আর সরাতে পারেন না। হরিধ্বনি সহকারে খাট আবার ওপরে উঠে গেলে তাঁর দৃষ্টি আরও ওপরের আকাশে প্রিয় পত্নীর উপযুক্ত বাসভবনের জমি খুঁজে বেড়ায়।

বালক ভুবনের জ্বলন্ত প্যাঁকাটি ধরা হাত দুহাতে ধরে কুল-পুরোহিতকে শবদেহের মুখাগ্নি করিয়ে দিতে দেখে মুরলীমোহন অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে দাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিতার আগুনের নৃত্যরত শিখার দিকে চেয়ে রইলেন।

সে-বছরই পৌষমাসে পাশের ছ-আনির জমিদার অধিকারী বৈষ্ণবদের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলেন। অধিকারীরা মৃত্যুর পর শব দাহ করে না, গর্তে বসিয়ে কবর দেয়।

'জীবনের অন্ত্যে তোমার আর তোমার সন্তানদের দেহ যদি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিতে চাও, সে তোমার সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি আমার পিতৃ-পিতামহের শাস্ত্রের বিধান পাল্টে দিতে পারব না। আমাকে আর তোমার গর্ভধারিণীকে যেন শাস্ত্রমতে শ্মশানে নিয়েই দাহ করা হয়।'

ঠাকুরদা তাঁর বাবার আদেশমতো প্রথমে মা ও পরে বাবার মরদেহ শ্মশানে দাহ করার পর নিজেকে দিয়েই চৌধুরী পরিবারে কবরপ্রথা চালু করেন।

ছাদহীন, ঘুনধরা, ইট বের করা দেওয়ালে ঘেরা এই কবরগৃহের কাছে বসে রাস্তার মানুষ দেখা ভুবনমোহনের নেশার মতো।

আরও কয়েক বছর পরে ভণ্ডুল তাঁকে ধরে ধরে বসিয়ে দিয়ে যাবে বাড়ির সামনের পায়ে-চলা রাস্তার পাশে বকুলবেদির গা ঘেঁসে।

শিরীষতলা থেকে বাড়ি ফিরে ভুবনমোহন শ্বেতপাথরের গেলাসে বংশের ধারা মেনে রোজকার মতো হুইস্কি সোডা ও বরফকলের কাঠের গুঁড়োমাখা বরফ নিয়ে বসলেন। চাকরই বরাবরের মতো টেবিলে সাজিয়ে দিল।

তাঁর বাবার আমলে দারোগাকেও এই টেবিলেই হুইস্কি পানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিজেরা নতুন বৈষ্ণব, সম্পূর্ণ নিরামিষাশী, তাই আস্তাবলে মুসলমান সহিসকে দিয়ে আগেই আস্ত মুরগি রোস্ট করা হয়েছে।

সরু বাসরাস্তা যেখানে মরা নদীর দিকে বেঁকে গেছে, সেই রাস্তার দুধারে তিনমাইল-কপিখেতে ভোরবেলা চাষিদের ওপর লাঠি বর্শা বল্লম নিয়ে জমিদারের লেঠেল বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়ার দিনই বেলার দিকে এই দারোগা-আপ্যায়ন। আক্রান্ত হয়েই চাষিরা তাদের হাতের কাস্তে কোদাল নিড়ানি নিয়ে লড়াই শুরু করার পরে পরেই গ্রামের সব মেয়ে-বউ বঁটি, খুন্তি, কাটারি, শাবল হাতে, অঘ্রাণের হিমেল হাওয়ায় শত্তুরের উদ্দেশে শাপ-শাপান্ত ছড়িয়ে স্বামী সন্তান ভাই ভাসুরদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভুবনমোহনের তখন যৌবনকাল।

দূর-শহরের এক শিল্পপতির কাছে এইসব জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, অথচ চাষিরা তখনও তাদের চাষ ছাড়েনি, তাই এই আক্রমণ। এখন সেই সুদীর্ঘ কপিখেতে প্লাইউডের কারখানা, গ্রিল কারখানা, আলকাতরায় লেখা 'সাইট ফর

বৈশাখ মাস, কালবৈশাখির দেখা নেই, রাস্তার পিচ গলন্ত, মলের ভরা ড্রাম মাথায় গয়ানাথের সারা মুখ গলা দরদর করে ঘামছে। অম্বরীশ রাগে উত্তেজনায় বেদী থেকে এক লাফে নেমে এসে হুংকার দিয়ে বলল, 'এই শুয়োর! এ রাস্তায় তোকে দুপুরে আসতে বারণ করেছি না!' 'আপনাদের গু নিয়েই তো যেতে হয়।' 'জুতিয়ে তোর মুখ লম্বা করে দেব, শুয়ার!' হঠাৎ কী হল, গয়ানাথ তার মাথার ড্রামটা অম্বরীশের মাথায় উপুড় করে দিল।

গণপতি বিড়ি ফ্যাক্টরি', রাস্তার ধারেই নতুন দেখা যাচ্ছে পাঁচিল-ঘেরা 'সাইট ফর ঝুনঝুনওয়ালা টাইলস'।

এখনও জমিদারের সেই চাষি-উচ্ছেদ 'কপিখেতের যুদ্ধ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। জেলার একপৃষ্ঠার পাক্ষিক সংবাদপত্রে সেসময় এই যুদ্ধের বিবরণ ছাপা হয়েছিল। সেবার চাষিদের সাতটি শবদেহ ভোরের কুয়াশা থাকতে থাকতে বাদার শুকনো নদীবক্ষ খুঁড়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোর দেওয়া হয়।

রোস্টেড মুরগি সহযোগে মদ্যপান ছাড়াও নগদ পাঁচশো টাকা, সেইসঙ্গে এক কার্টন ভ্যাট সিক্সটিনাইন নিয়ে দারোগাসাহেব ভুবনমোহনের পিতৃদেব জগন্মোহন চৌধুরীকে মার্বেলের মেঝেয় সশব্দে পা ঠুকে স্যালুট করে থানার অন্দরে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যান। বিকেলে থানায় এসে রিপোর্টে লেখেন— ভোরে অত্যধিক ঘন কুয়াশায় জমির পারস্পরিক সীমানা-বিভাজক আলগুলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় চাষিরা নিজের নিজের খেতের অধিকার নিয়ে প্রথমে বচসা, তা থেকে অ্যাবিউজিং ও তা থেকেই কোদাল কাস্তে নিড়ানি নিয়ে প্রচণ্ড মারামারি করে আহত হয় ও আহত করে। তবে কারও আঘাত মারাত্মক নয়। জমিদারের লোক খবর পেয়ে স্থানীয় হাসপাতালের টিংচার আইডিন প্রয়োগে সকলকে সুস্থ করে তোলে।

জেলার এস পি সাহেবকে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করে দারোগাসাহেব নিজের জিপে বেরিয়ে যান।

জমিদারির শেষ যুদ্ধের রক্তপাতের পর এই অঞ্চলে আর কোনও বড় রক্তপাত কেউ দেখেনি। আবার রক্তের ধারা বইতে দেখা যাবে এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, ততদিনে পুরো জেলাটা ভেঙে দুটো আলাদা জেলা করা হবে। বালিসোনা হবে জেলার সদরদপ্তর।

২

অবনীমোহনের ছোট মেয়ে সরস্বতীপ্রতিমার জ্ঞানহীন দেহ প্রথম দেখেছে মন্থরোর মা বাদায় মরা নদীর শুকনো বুকে। শাড়ি শায়া ব্লাউজ ধুলো-কাদা মাখা দূরে পড়ে আছে। চোখ মুখ গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, দুহাত বাঁধা গোরুর দড়ি দিয়ে। কলকাতায় পার্ক সার্কাস এলাকায় স্থানীয় বন্‌ধ ঘোষিত হওয়ায় লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজও আজ বন্ধ। হঠাৎ ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেলা থাকতে থাকতে সরস্বতী গিয়েছিল দূরে কোথাও নদীর কোনও ঘাটে বসে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন বা লিখতে শুরু করেছিলেন তার খোঁজে।

মন্থরোর মা আসছিল জমিদারের বড় নাতি দিল্লি থেকে এসেছে, তাকে এক ডজন তিতির দিতে অর্থাৎ বিক্রি করতে। চোখে ভালো দেখে না। কোমর প্রায় নব্বই ডিগ্রি ভেঙে হাঁটে, বাদা দিয়ে আসবার সময় সরোকে সে ঠিকই চিনিছে। দুই বোন লক্ষ্মীপ্রতিমা আর সরস্বতীপ্রতিমাকে শিশুকাল থেকে সবাই 'নকো-সরো' বলেই ডাকে।

অবনীমোহন সেজো ও ন'বউকে নিয়ে মন্থরোর মার সঙ্গে প্রায় ঝড়ের মতো যখন অকুস্থলে পৌঁছলেন তখন সেখানেও আদিগন্ত বাদার বুকে হু হু হাওয়ার হাহাকার। অদূরে একটা গাবগাছের নিচু ডালে সরস্বতীপ্রতিমার বডিস গাছে আটকানো কাটা ঘুড়ির মতো ওলোট পালোট খাচ্ছে।

সেজো বউ সঙ্গে আনা শাড়ি-চাদরে সরোকে ঢেকে দিল। হাত-মুখের বাঁধন খুলতে অবনীকে হাত লাগাতে হল। সরস্বতী গোঙাচ্ছে, হয়তো জ্ঞান এসেছে।

বার বার কোল বদল করে দুই বউ সরোকে বাড়ি এনে মাদুরে শুইয়ে দিল। রক্ত ধুলো কাদা ধুইয়ে পরিষ্কার করে এবার শুরু হল রক্ত বন্ধ করার পারিবারিক টোটকা চিকিৎসা। পুলিশকে খবর দেওয়া যাবে না। অবনীমোহন মেয়ের ঠোঁট ফাঁক করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোমিওপ্যাথি আর বায়োকেমিক ওষুধ খাওয়াতে লাগলেন।

সরোজিনী স্বামীর তিন মাস নির্বাসনের মধ্যে একবার শীতলক্ষার মন্দিরে গিয়েছিলেন। বহু বছর পর আজ আবার দুই মেয়ের জন্য মানত করে ইট বাঁধতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে ঘটনা শুনে প্রথমে থম মেরে গেলেন, তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন, তারপর কান্না থামিয়ে মাঝে মাঝেই শুধু ভারি দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলেন।

লাস্ট ট্রেনে রাত সাড়ে বারোটায় অবনীমোহনের পিঠোপিঠি ভাই, বছর খানেকের ছোট অম্বরীশ বহুদিন পরে সেদিনই বাড়ি ফিরল। গায়ে ছাইরঙা শক্ত মোটা কাপড়ের শার্ট প্যান্ট, স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে অনেক ভালো। শক্তপোক্ত, পেটাই করা চেহারা, মুখটা পাথরের। অনেক বছর আগে গয়ানাথ মেথর ক্রুদ্ধ বচসার সময় মাথার মলভর্তি ড্রাম অম্বরীশের মাথায় ঢেলে দিয়েছিল। সদ্য-তরুণ অম্বরীশ রোজকার মতো দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে সামনের বকুলবেদীতে দাঁড়িয়ে মুখে দেবে বলে এলাচের খোসা ছাড়াচ্ছিল, দুপুরের এই সময়টা সে প্রায়ই

বাড়ির সামনে এই বকুলবেদীতে দাঁড়িয়ে একটা গোটা এলাচ একটু একটু করে খায়, তখন এ রাস্তা দিয়ে গয়ানাথকে যেতে এর আগেও কয়েকবার নিষেধ করেছে, অনেকদিন পর আজ আবার এপথে বকুলবেদীর সামনে দিয়ে ভরা মলপাত্র মাথায় মিউনিসিপ্যালিটির মেথর গয়ানাথকে যেতে দেখে তার মাথায় আগুন ধরে যায়। বৈশাখ মাস, কালবৈশাখির দেখা নেই, রাস্তার পিচ গলন্ত, মলের ভরা ড্রাম মাথায় গয়ানাথের সারা মুখ গলা দরদর করে ঘামছে।

অম্বরীশ রাগে উত্তেজনায় বেদী থেকে এক লাফে নেমে এসে হুংকার দিয়ে বলল, 'এই শুয়োর! এ রাস্তায় তোকে দুপুরে আসতে বারণ করেছি না!'

'আপনাদের গু নিয়েই তো যেতে হয়।'

'জুতিয়ে তোর মুখ লম্বা করে দেব, শুয়ার!'

হঠাৎ কী হল, গয়ানাথ তার মাথার ড্রামটা অম্বরীশের মাথায় উপুড় করে দিল।

এরপর থেকে গয়ানাথ নিরুদ্দেশ।

অম্বরীশ গয়ানাথের খোঁজে সেই যে বেরল আর ফিরল না।

বহুবছর পর যেদিন কলকাতা থেকে লাস্ট ট্রেনে অম্বরীশ ফিরে এল, আশপাশের গ্রাম ধরে পুরো অঞ্চলটাই কিছুটা বদলে গেছে। সেদিনই সকালে সরোকে বাদা থেকে তুলে আনা হয়েছে। অত রাতেই সে ঘটনাটা বিস্তারিত শুনে, সরোর জ্ঞান ফিরেছে জেনে তার ঘরে গিয়ে মেয়েটার মাথায় খানিকক্ষণ হাত বুলোল, তারপর বলল, 'ওরা ক'জন ছিল?'

অনেক সান্ত্বনা ও সাধাসাধির পরও বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সরো উত্তর দেয় 'দুজন'।

'চিনতে পেরেছিলি?'

আবার চুপ, তারপর কঁকিয়ে উঠে বলে, 'গগন আর জালালউদ্দীন।'

অম্বরীশ জিজ্ঞাসু চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায়।

অনেক সময় নিয়ে অবনীমোহন প্রায় অচেনা স্বরে বলে, 'দুজনের ঠাকুরদাই কপিখেতের যুদ্ধে ঠাকুরদার বাহিনীর বল্লমে প্রাণ দিয়েছে। ভোরের কুয়াশায় অন্যদের সঙ্গে এদেরও বাদায় পুঁতে ফেলা হয়েছিল। তুইও তো জানিস।'

'এদের ছেলেদের, তাদের ছেলেদেরও চিনি। আমি আসছি।'

ওই পোশাকেই রাতের অন্ধকারে অম্বরীশ বেরিয়ে যায়।

ফিরল প্রায় তিনঘণ্টা পর।

অবনীমোহন কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করে বলল, 'এত রাতে গিয়েছিলি কোথায়?'

> 'তোমার বাবা-কাকারা আমার মুখের ওপর কোনওদিন কথা কয় না, দু-দিন দিল্লি গিয়ে তুমি আমার সাতপুরুষের জায়গা-জমির চরিত্র বুঝে গেলে?'
> 'আপনার মুশকিল হচ্ছে বাইরের পৃথিবীটা আপনি একদমই জানেন না।'
> ভুবনমোহন হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কণ্ঠে হুংকার দিয়ে উঠলেন— 'চোপ!'
> শতবর্ষ পূর্ণ হবার তেরোদিন আগে সে-ই তাঁর শেষ কথা। এরপর আবার তিনি কণ্ঠস্বর ফিরে পাবেন একশো তিন বছর বয়সে, মৃত্যুর ঠিক এগারো মাস আগে।

অম্বরীশকে নিরুত্তর দেখে এবার বলল, 'তুই কি আর্মিতে আছিস? গয়ানাথের খোঁজ পেয়েছিলি?'

'ওর খোঁজেই এসেছি। তুই জানিস কিছু? নিশ্চয়ই ফিরে এসেছিল?'

'তুই যাবার কিছুদিন পরই ফিরেছে। চাকরির কথা বললি না তো?'

'আর্মিতে ছিলাম। তারপর জাহাজে। এমাসেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। মুসৌরিতে একটা বাড়ি কিনেছি, এরপর ওখানেই থাকব।'

'বিয়ে করেছিস?'

'করবও না। প্রথম সবজির ট্রেনটা ক'টায় যেন এখানে আসে?'

'রাত ৩টে ৫৪-য়।'

'বাবা এখন কীরকম?'

'একইরকম। এখনও গিয়ে বসে, সবাইকে নেমন্তন্ন করে।'

'সরোকে বলিস, যারা ওর সর্বনাশ করেছে তাদের সঙ্গে ওর আর কখনওই দেখা হবে না। আর আমি যে বালিসোনায় এসেছি সেকথা কেউ কখনওই যেন না জানে।'

গয়ানাথকে তার চালাঘরে নয়, যে ঘাস-ওঠা সরু পথটা পুকুরপাড় ঘেঁসে তার গোবর নিকোনো উঠোনে ঢুকে গেছে, সেই মেটেপথের ওপর পাওয়া গেল। চোলাই খেয়ে দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় মুখ হা করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের দুটো গুলিতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার পরও পা দিয়ে ঠেলে তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হল।

পরদিন একপৃষ্ঠার 'পাক্ষিক সংবাদ'-এ বড় হরফে ছাপা হল— 'আততায়ীর গুলিতে তিন তাজা প্রাণ হল বলিদান। পুলিশ যাই বলুক, জালালউদ্দীন ও গগনকে গুলি করেই মারা হয়েছে। গয়ানাথের মৃত্যুও জলে ডুবে নয়, গুলিতে।'

জালালউদ্দীন আর গগন দুজন তাদের পাড়ার দুপ্রান্তে থাকে, কিন্তু দুজনকেই পাওয়া গেল বাদার গাবগাছের ডালে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

এর কয়েক বছর পর মুসৌরি থেকে এসে অম্বরীশ কলকাতায় বসবাস শুরু করবে ও একটা সমিতি গড়ে সে জনসেবায় মেতে উঠবে। পরের বছরে সে বরাবরের বিজয়ী দলের টিকিটে বিধানসভার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। হেরে গিয়ে কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে জনসেবা সমিতি তুলে দিয়ে নিজেদের লুপ্ত জমিদারিতে ফিরে মিউনিসিপ্যালিটি ভোটে জয়ী হয়ে তার চেয়ারম্যান হবে।

৩

ভুবনপ্রসাদ বাড়িতেই রেজিস্ট্রার আনিয়ে 'তেইশবিঘা-আমবাগান' বিক্রির দলিল রেজিস্ট্রি করাচ্ছেন, এমন সময় প্রদীপ, অকাল-প্রয়াত জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র সন্তান, যে দুদিন আগে দিল্লি থেকে ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে, ঘরে ঢুকে বলল, 'ঠাকুরদা, আপনি নাকি সব বাগান বেচে দিচ্ছেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে গ্রামে বা যে শহরে আমাদের বসবাস সেখানকার কোনও রূপান্তর উচিত না অনুচিত আগে সেটা বিচার করা দরকার?

ঠাকুরদা অবোধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন দেখে প্রদীপ বলে চলল, 'সময়ের

সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় কতগুলো অদলবদল ঘটে, সেটা ভালোর দিকে, না মন্দের দিকে যত আগাম বোঝা যায় ততই মানুষের ভালো।'

'বাগান না বিক্রি করলে আমাদের চলবে কী করে? নেমন্তন্নও তো অনেক লোককে করতে হয়। বিক্রি করছি শুধু তেইশ-বিঘাটা।'

'কাকাদের মধ্যে যারা কোনওদিন কিছু করেনি তাদের কাজ করতে বলুন। চাকরি বা ব্যবসা যে-কোনও একটা কাজে লাগতে বলুন। বাগান বেচে না দিয়ে বাগানের ফল বেচেও তো ব্যবসা হতে পারে। তেইশ বিঘা বাগান অন্যের হাতে গেলে তারা হয় গাছ কেটে কারখানা বসাবে, নয়তো সিনেমা হল বানাবে। আগে সিনেমা দেখতে এখানকার লোককে ট্রেনে পনেরো মাইল যেতে হত, এখন এখানেই তিনটে সিনেমা হল। এভাবে এই অঞ্চলটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুরদা। জায়গাটার চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। এ তো কুরূপান্তর। বদলাতে হলে চাই সুরূপান্তর। যাতে মানুষের ভবিষ্যৎটা ভালো হয়।'

ঠাকুরদা নাতির মুখে একসঙ্গে এত কথা কোনওদিন শোনেননি। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার বাবা-কাকারা আমার মুখের ওপর কোনওদিন কথা কয় না, দু-দিন দিল্লি গিয়ে তুমি আমার সাতপুরুষের জায়গা-জমির চরিত্র বুঝে গেলে?'

'আপনার মুশকিল হচ্ছে বাইরের পৃথিবীটা আপনি একদমই জানেন না।'

ভুবনমোহন হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কণ্ঠে হুংকার দিয়ে উঠলেন— 'চোপ!'

শতবর্ষ পূর্ণ হবার তেরোদিন আগে সে-ই তাঁর শেষ কথা। এরপর আবার তিনি কণ্ঠস্বর ফিরে পাবেন একশো তিন বছর বয়সে, মৃত্যুর ঠিক এগারো মাস আগে।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের তিনমাস পর যখন তাঁকে কলকাতার হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনা হল, তখন কথা বলতে গেলে ঠোঁট বেঁকে যায়, গালের মাংস কাঁপে। কথা যেটুকু মুখ থেকে বেরোয় বোঝা যায় না। অথচ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় চারপাশের সবই তিনি নিরীক্ষণ করছেন ও বুঝতে পারছেন। শুধু বোঝাবার ক্ষমতাই নেই। স্লেটে বা কাগজে লিখে বোঝাতে গেলে তাঁর হাতের আঙুল এতই কাঁপতে থাকে যে তিনি স্লেটের ওপর চকখড়ি বা কাগজের ওপর কলম ধরতেই পারেন না। আরও একটু সুস্থ হলে ভুবনমোহনকে তার খাস চাকর ধরে ধরে পূর্বপুরুষের একই চেয়ারে বাড়ির কাছেই পায়ে-চলা পথের ধারে বকুলগাছের বেদীর সামনে বসিয়ে দিয়ে আসে। বাসরাস্তার তুলনায় এ রাস্তায় লোক চলাচল কম। চেনা-জানারা, একদা-প্রজা চাষি-মজুররা কত্তাবাবুর সামনে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কেউ হাতজোড় করে, মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে।

ভুবনমোহন সবাইকেই কিছু বলেন, কাউকে কাউকে নেমন্তন্নও করেন, কিন্তু তার সেই কথা কণ্ঠ পায় না।

আগের বার প্রদীপকে তিতির দেওয়া হয়নি, 'সে যা একখানা বেজন্মা দিন গিয়েলো, হাতে তিতির, কিন্তু মাথার ঠিক ছেলো নি।' এবার প্রদীপ আসার খবর পেয়ে মন্থরোর মা আবার চারটে তিতির ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে কত্তাবাবুদের বাড়ি এসে হাজির।

চত্বরের লাগোয়া বারান্দায় প্রদীপকে পেয়ে বলল, 'কলকেতা থেকে নাতি আসবে বলেছেল, এলোনি, ইদিকে সাঁঝ নাগতে নেগেছে, ভাবলুম পাখি কটা তবে খোকাকেই দে'আসি। দাও বাবা, চার আনা পয়সা দাও।'

চারটে তিতির পাখি প্রদীপের সামনে নামিয়ে রেখে মন্থরোর মা হাত পাতল। পাখিগুলির একটার সঙ্গে আরেকটার পা সুতলি দিয়ে বাঁধা, সেই অবস্থায় তারা ডানা ফরফর করে মাঝে মাঝে ওড়ার চেষ্টা করছে, হাঁপিয়ে গিয়ে দম নেবার চেষ্টায় তাদের ছোট্ট পেট ফুলে ফুলে উঠছে।

প্রদীপ বেশ মুশকিলে পড়েছে। মন্থরোর মা জানে না, বেশ কিছুদিন হল সে আমিষ ছেড়ে দিয়েছে। যদি তিতিরগুলো কিনে নিয়ে পরে উড়িয়েও দেয়, তার দাম মাত্র চার আনা?

জোর করে বেশি দাম দিতে গেলে সে কিছুতেই নেবে না। বোঝাতে গেলে বা বেশি জোর করলে সে এই বলে কাঁদতে বসবে— 'খোকাও আমায় ভিখিরি ভাবলি বাবা!' প্রদীপ আগেও অনেকবার দেখেছে। বছর কয়েক আগে, একবার মন্থরোর মা দুটো নারকেল নিয়ে এসে এক টাকা চাইল। বাজারে দুটো নারকেলের দাম তখনই সাত-আট টাকার কম নয়, কিন্তু সেকথা বোঝায় কে! শেষ পর্যন্ত তাকে সাহস করে প্রদীপ একটা দু টাকার নোট দিল। চোখে তো প্রায় দ্যাখেই না, একটাকা আর দু-টাকার নোটে নিশ্চয়ই তফাত করতে পারবে না। মন্থরোর মা নোটটার ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে প্রথমে তার ধারগুলো ও পরে জমি ও তারপরে দুটোই একসঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল— 'তুমিও আমায় ভিখিরি ভাবলে বাবা! তোর দরজায়

মন্থরোর মা নোটটার ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে প্রথমে তার ধারগুলো ও পরে জমি ও তারপরে দুটোই একসঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল— 'তুমিও আমায় ভিখিরি ভাবলে বাবা! তোর দরজায় আমি কি ভিখিরি এয়েছি, খোকা!'

আমি কি ভিখিরি এয়েছি, খোকা!'

প্রদীপের দিক থেকে সাড়া না পেয়ে মন্থরোর মা অধৈর্য হয়ে বলল, 'দাও বাবা, চার আনা পয়সার জন্যি আর বোস থাকতি পারি না। অ্যাতটা আস্তা, ঘরে ফিরতি আত হয়ে যাবে।'

প্রদীপ একটু নির্দয় হয়ে বলল, 'মাছ-মাংস আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদিমা।'

সে যখন এই বাড়িতে হামাগুড়ি দেয় তখন থেকেই (পরে শুনেছে, তারও অনেক আগে থেকে) মন্থরোর মা তাদের বাড়িতে ডিম, দুধ, নারকেল এইসব দিয়ে যেত। কথা বলতে শিখে মন্থরোর মাকে সে দাদিমা বলে ডাকত। তার রাঙাকাকিই শিখিয়েছিলেন। আরও কেউ কেউ মাঝে মাঝেই মাছ ডিম দুধ মধু ইত্যাদি দিত, তারা ছিল ব্যাপারী, সেসব ছিল জমিদারের সেবায় তাদের ভেট।

'তুমি কি নিমাই সন্নিসি হবে নাকি? কচি বয়েস, মাংস না খেলি চলে? এখনও বে-শাদিও করলে নি!'

আসলে মন্থরোর মার সঙ্গে আজকাল তার বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় না। থাকে দিল্লিতে, কালে-ভদ্রে ছুটি নিয়ে দু-চার দিন আসে, আসে বালিসোনার সবুজের টানে। ছোটবেলা থেকেই গাছপালা আর লেখাপড়ার শখ, এর কোনওটাতেই সময় তত দিতে পারে না— এই তার এক ক্রমবর্ধমান দুঃখ।

'কই, বাবা?'

অগত্যা ঘর থেকে একটা সিকি এনে মন্থরোর মার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার কাজকম্ম কেমন চলছে, দাদিমা?'

মন্থরোর মা সিকিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে সামনের দিকে বৃথা খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'দিন আর কাটে না বাবা। ওজ সুয্যি উঠতিছে, ওজ সুয্যি ডুবতিছে, কিন্তু মনি হয় ঝ্যানো সুয্যি উঠতিছেও না, ডুবতিছেও না।'

মন্থরোর মার আসল নাম কী কেউ জানে না। আদপেই তার কোনও নাম আছে বা ছিল কিনা, জানার দরকারই হয় না। এ বিষয়ে কেউ কখনও কিছু ভাবেও না। পাড়ার কেউ মন্থরোর মার উঠোনে দাঁড়িয়ে মন্থরোকেই জিজ্ঞেস করে, মন্থরোর মা মাঠ থেকে ফিরেছে রে, মন্থরো?

দাঁত খোঁটা মন্থরোর আযৌবন অভ্যেস, দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সেও জবাব দেবে, 'মন্থরোর মা কি তোমার ঝ্যামন-ত্যামন বংশের মেয়েছেলে নাকি গো, বেলা তিনটেতেও মাঠে-ঘাটে ঘুরে মরবে? কী, বিছের ওযুধ নিতে এয়েছো, না কাছিমের ডিম?'

'দাউদ ফিরবে সাঁঝের বেলা ব্যাঙ নে'। থলেয় ভরে নে' আসে। তা ফড়েদের আসবার তো কোনও টাইম নেই। আতেও আসতি পারে, কাল ভোরেও আসতি পারে। থলের মধ্যি গাদাগাদি ব্যাঙ কি অতক্ষণ বাঁচে? ঝুড়ি চাপা দে রাখলি নিশ্চিন্দি। মরা ব্যাঙ ফড়েরা আঙুল দে তুলে হুই বাদায় ফেলে দেবে।'

বা হয়তো বলে (বিশেষ করে সন্ধেবেলা কেউ এসে ডাকলে), মন্থরোর মা কি তোমার জন্যি ডুমুরের মধু নিয়ে বসে ওয়েছে যে অ্যাগবারে হত্যে দিয়ে পড়লে?

ডুমুরের মধু মানে অবশ্য চোলাই মদ। মন্থরোর মা নিজে চোলাই করে না, শুধু ছাপ্লাই দেয়।

শুধু মন্থরোই না, মন্থরোর মাও তার আব্বাকে লতায়-পাতায় মুর্শিদাবাদের নবাবের বংশধর বলে বিশ্বাস করে।

মন্থরোর মা'র 'নানা' ভাতের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের লালবাগে গোরুর মেটের মতো পাতলা ইটের জরাজীর্ণ আব্বা-নানার ভিটে আর তাদের পরিবারের নিজস্ব কবরস্থানের মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বালিসোনার এই পশ্চিম সীমানায় এসে যখন ডেরা বাঁধে তখন এখানকার এইসব গ্রাম বলতে ছিল শুধু বন-জঙ্গল। জঙ্গলের শেষে জলা। মন্থরোর মা'র নানা জঙ্গল কেটে প্রথমে নিজের চাষ-বাস ও পরে ক্রমশ আরও পাঁচজনের চাষ-বাসের ব্যবস্থা করে। ক্রমে ক্রমে এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চাষি তাঁতী জেলে কামার কুমোর গয়লাদের এনে বসায়। প্রথম প্রথম সে জমিদারকে কোনওরকম খাজনা দিত না। জঙ্গল কেটে জমি চাষ-বাসের যোগ্য করে তুলে সে নিজেকে এই নতুন জনবসতির একরকম জমিদারই ভেবে নিয়েছিল। তার পত্তন করা এলাকার নামও দিয়েছিল 'ছোট লালবাগ'। পরে চৌধুরীবাড়ির চোরা কুঠুরিতে তিন রাত কয়েদ খেটে সে জমিদারের বশ্যতা মেনে নেয় ও খাজনা দিতে শুরু করে। তার শাদিও হয় এই নতুন বসতি করা ঘরের মেয়ের সঙ্গে। মাটিও নিল এখানেই। নানা বেঁচে থাকতে থাকতেই মন্থরোর মা'র আব্বার শাদিতে কার্বাইডের বড় বড় বাতি জ্বালিয়ে ঘটা করে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তারপর গৌরবর্ণা সুন্দরী কিশোরী মন্থরোর মা'র শাদি হল, এই গাঁয়েরই ছেলের সঙ্গে। বছর চোদ্দ-পনেরো পরে চার ছেলে তিন মেয়ে রেখে সে-মানুষটাও মরে গেল। সেই থেকে মন্থরোর মা-ই সংসার চালায়। সেসময় প্রদীপের মা বুকের শ্বেতিকে কুষ্ঠ ভেবে হতাশায় ভুগছিলেন। তার ওপর অদ্ভুত এক স্নায়ুরোগে কড়া ওযুধ খেয়ে দিনরাতের বেশির ভাগ সময় তার নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটত। সেসময় প্রায় দুবছর মন্থরোর মা-ই তাঁর সবরকম সেবাশুশ্রূষাও করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা রোগী পরিচর্যার জন্য পাশের ছোট ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা ছিল। ডাক্তার, মন্থরোর মা ও ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া সে-ঘরে আর কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। বড় বউরানির গর্ভসঞ্চারের খবর হওয়ার সাত মাস এগারো দিন পর শুধু একজন ধাই ওঘরে ঢুকেছিল। প্রদীপকে ভূমিষ্ঠ করিয়ে সে চলে যায়।

তা সেই এক-দেড় কুড়ি বয়েস থেকে আজ এই চার কুড়ি পেরনো বয়স অব্দি মন্থরোর মাকে করতে হয়নি, গোটা জেলায় এমন কাজ বোধহয় বেশি নেই। তাছাড়া উপায় কী, বাপ-মরা অতগুলো ছানাপোনা নিয়ে বিধবা হওয়া— উদয়-অস্তে তা ধরো গে তোমার এক কুড়ি পেট। মজার কথা, মন্থরোও বুড়ো হত চলল, তবু আজও সে মাকে খাওয়ানো দূরের কথা, মা না হলে তাকেই উপোস করে থাকতে হত।

মন্থরোর নিজের চার ছেলে সেয়ানা হয়ে কে কোথায় ছিটকে-ছড়িয়ে গেছে মন্থরো জানে না। ছোট ছেলেটাও মাঝে মাঝে চলে যায়। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যোগাড় দেয়, জনমজুর খাটে, মাটি কাটে। তখন চুলে খুব তেল দিয়ে টেরি বাগায়। তারপর চুলে ধুলো পড়লে বাড়ি ফিরে আসে। তখন রোজ রোজ শাক-ভাতে কি গুগলির ঝোলে বিরক্ত হয়ে কোনওদিন একমুঠো কাছিমের ডিম, কোনওদিন কয়েকটা পাখিটাখি খুঁজে আনে।

মন্থরোর ছেলেরাই শুধু নয়, মন্থরোর মার মেয়েদের ছেলেমেয়েরাও কে কোথায় আছে,

'শোনো মন্থরোর মা, তুমি যখন দাম নেবে না, কাল থেকে আর আমাদের দুধ-ডিমও তুমি দেবে না।' 'তা বললি হয়! তোমরা না নিলি, গরিব নোক, না খেতি পে মারা যাব, মা!' 'সে তো তুমি টাকা না নিলেও না খেতে পেয়ে মরে যাবে।' 'টাকা নিই কী করে মা! তুমি মা-নখ্যি গত মাসে এক কুড়ি টাকা দেছেলে, বললে, দুখানা কম্বল কিনে নাও মন্থরোর মা, যা শীত! তা সে তো তেনারই টাকা। তিনি আর নেই, দুধ ডিম নারকেল দে সে টাকা শোধ করতি হবে না?'

কে কে বেঁচে আছে, কাদের শাদি হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে— এসব হিসাবও মন্থরোর মা'র ভারি গোলমাল হয়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন আশপাশের দু-চার গাঁয়ের সিকিভাগ ছেলেমেয়েই মন্থরোর মা'র নাতিপুতি। তারাও বেশিরভাগ অন্তত বছরে কোনও না কোনও সময় মন্থরোর মা'র বাড়িতে এসে থেকে যেত। মন্থরোর ছেলেরাও তখন বাড়িতেই থাকত। মন্থরোর মা তখন লোকের বাড়ি-বাড়ি দুধ বেচত, ডিম বেচত, ছালা ভরা নারকেল বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত। তখনও যেটুকু জায়গা-জমি ছিল তাতে শশা ফলাত, বরবটি চিচিঙ্গা ফলাত। পালং মটর বুনত। কাজের তার শেষ ছিল না। তার কারণ মন্থরোর মা'র সারা জীবনে একটাই কাজ— যেভাবে হোক সংসারের দুটো ভাত যোগাড় করা।

কার্তিক মাস শেষ হতে চলল, সন্ধের মুখে এখনই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। মন্থরোর মা এই বয়সে, এই কুয়াশায়, ঝাপসা অন্ধকারে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে যাচ্ছে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে রাস্তার হাত দুয়েক ওপরে প্রায় রাস্তার সমান্তরালে সে হাঁটে। মন্থরোটা একেবারে অপদার্থ। প্রথম থেকেই হাবা-গোবা তো ছিলই, তার ওপর বয়স হবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে যেন ক্রমশ আরও অপদার্থ হয়ে পড়েছে। মন্থরোর মা'র ছোট ছেলে দুটি বেঁচে থাকলে এই বয়সে তাকে হয়তো এত কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত না। মারা যাবার সময় ওদের কত আর বয়স। জন্মেছিল এক বছরের ব্যবধানে, মরল একই বছরে। তার মধ্যেই দুজনে নিজেদের সাধ্যমতো পয়সা এনে মাকে দিয়েছে। ফোজোর ছিল বন-জঙ্গল ঘুরে হরেক পাখি ধরে কলকাতায় নিয়ে বিক্রির ব্যবসা। পাখির বাসা থেকেও ছানা বের করে আনত। ঘরে রেখে তারপর খাইয়ে-দাইয়ে একটু বড় করে বিক্রি করে দিত। দু-তিন বছরেই এই কাজে সে দিব্যি হাত পাকিয়ে ফেলেছিল। একবার চৈত্রমাসে আমলকী গাছের কোটরে হাত গলিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে গাছ থেকেই মাটিতে পড়ে যায়। মন্থরোর মা-ই প্রথম খবর পেয়ে দৌড়ে এসে ছেলেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যায়। উঠোনে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে সে নাকি সারা দিন শুধু কেঁদেছে। সে তো তখন জানত না মাস কয়েক পরে তাকে আবার এভাবেই কাঁদতে হবে!

এরই মাস কয়েক পরে, প্রদীপ সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিয়ে গ্রামে এসে মন্থরোর মার বাড়ি গিয়ে দেখে সে উঠোনে বসে একমনে বেতের ঝুড়ি বুনছে।

ক'মাস আগে ফোজো মারা গেছে, কী বলা যায় ভেবে না পেয়ে খানিকক্ষণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে বলে, 'দাদিমা কি আজকাল বেতের কাজও করছ নাকি?'

একটু দূরে, কোনাকুনি দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ দেখতে পায়নি। গলার স্বর শুনে মন্থরোর মা মুখ তুলে তাকে দেখে বলল, 'কবে এলে বাবা? ক'দিন আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া হয়নি। ফোজো নেই, পাখির ছানা ধরতে গে'— বলতে বলতে মন্থরোর মা মাথা নামিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকা দিল।

তারপর চোখ মুছে হাতের কাজ করতে করতে আবার বলল, 'দাউদ ফিরবে সাঁঝের বেলা ব্যাঙ নে'। থলেয় ভরে নে' আসে। তা ফড়েদের আসবার তো কোনও টাইম নেই। আতেও আসতি পারে, কাল ভোরেও আসতি পারে। থলের মধ্যি গাদাগাদি ব্যাঙ কি অতক্ষণ বাঁচে? ঝুড়ি চাপা দে রাখলি নিশ্চিন্দি। মরা ব্যাঙ ফড়েরা আঙুল দে তুলে হুই বাদায় ফেলে দেবে।'

কথা বলতে বলতে ওরই মধ্যে শক্ত দেখে একটা ঝুড়ি প্রদীপের সামনে উপুড় করে দিয়ে বলল, 'দেঁইড়ে কেন বাবা, বোসো। এর উপরিই বোসো। হ্যাঁ বাবা, বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করো, সেখানকার সাহেবরা নাকি ব্যাঙের ঠ্যাং খেতে ভালোবাসে? ফড়েদের মহাজন নাকি বরফ চাপা দে সে-দেশে ওজ এলগাড়িতে ব্যাঙের ঠ্যাং পাঠাচ্ছে?'

প্রদীপ হুঁ-হাঁ করে উত্তর দিয়ে বলল, 'তোমার বড় ছেলে কাজকম্ম কিছু ধরেছে?'

'ওই দ্যাখো না, কদমতলায় গামছা পেতে শুয়ে শুয়ে দাঁত খুঁটতিছে।'

প্রদীপ সেবার কর্মস্থলে ফিরে যাবার আগেই দাউদ মারা গেল ব্যাঙ ধরতে গিয়ে, সে-ও সাপের বিষে।

কলকাতার নাতি মানে ফোজোর ছেলে, সুজা। ফোজোর অপঘাত মৃত্যুর সময় একেবারে শিশু ছিল। ছেলেটা কিছুদিন তাদের বাড়িতে রাঙাকাকির ফাইফরমাশ খেটেছিল। রাঙাকাকির ফুলবাগানের কাজকর্ম করত। প্রদীপ দুয়েকবার ছুটিতে এসে ওকে একটু লেখাপড়াও শিখিয়েছিল। তারপর সুজাও একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। মন্থরোর মা বলে, এখন নাকি কলকাতায় কোন লটারির দোকানের গাড়ি চালায়।

মন্থরোর মা সেই নাতির জন্যেই সেদিন তিতির রাঁধবে ভেবেছিল। ছেলেটা নাকি তিতিরের মাংস খুব ভালোবাসে। নাতি না আসায় পাখিকটা প্রদীপকে গছিয়ে গিয়েছিল।

মন্থরোর মা'র জীবন ছেলেবেলা থেকে প্রদীপ যতটুকু দেখেছে, মা-বাবার কাছে যতটুকু শুনেছে, তা হল দারিদ্র থেকে আরও দারিদ্রের মুখে ধাবমান একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। এর মধ্যে যা কিনা চরম বিস্ময়ের, তা হল তার অদ্ভুত সততা আর আত্মমর্যাদা বোধ। সে তার সংসারের দুমুঠো ভাতের জন্য কী না করে! তারপরও হয়তো উপোস করে, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে দুটো পয়সা চাইবে না। কাউকে ঠকানো তার স্বভাবেই নেই, বরং নিজেই ঠকবার জন্য স্বভাবটিকে বাগিয়ে রেখেছে। প্রদীপের বাবার অকালমৃত্যুর পর মন্থরোর মা দুধ ডিম নারকেলের দাম নেওয়া ছেড়ে দিল। মনে আছে, তার মা বহু চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুটা রেগে গিয়েছিলেন।

'শোনো মন্থরোর মা, তুমি যখন দাম নেবে না, কাল থেকে আর আমাদের দুধ-ডিমও তুমি দেবে না।'

'তা বললি হয়! তোমরা না নিলি, গরিব নোক, না খেতি পে মারা যাব, মা!'

'সে তো তুমি টাকা না নিলেও না খেতে পেয়ে মরে যাবে।'

'টাকা নিই কী করে মা! তুমি মা-নখ্যি গত মাসে এক কুড়ি টাকা দেছেলে, বললে, দুখানা কম্বল কিনে নাও মন্থরোর মা, যা শীত! তা সে তো তেনারই টাকা। তিনি আর নেই, দুধ ডিম নারকেল দে সে টাকা শোধ করতি হবে না?'

সন্ধ্যা গাঢ় হতে হতে ক্রমশ রাত নামছে। লেবু গাছগুলোর মাথায় ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি। ঠাকুরদার ঘরের মাথায় চিলেকোঠায় বাড়ির পোষা তক্কক তালে তালে ডাকতে শুরু করেছে। তিতিরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, বিশেষ সাড়াশব্দ নেই। ঘর থেকে গোঁপ-ছাঁটা কাঁচি এনে প্রদীপ পাখিগুলোর পায়ের সুতলি কাটার চেষ্টা করতেই একসঙ্গে চারটি পাখিই প্রবল ডানা ঝাপটাতে লাগল।

শনিবার ঘুম ভেঙেই প্রদীপের মনে পড়ল, রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে হবে। সোমবার থেকে আবার অফিস।

অনেক কাল পর সে সকালে দিঘিতে স্নান করতে গেল। আসলে দিঘিটা দেখারও ইচ্ছে। দিঘিতে যাবার পথে কিছুটা ঘুরে মন্থরোর মার বাড়ি গিয়ে দেখে মন্থরোর মা বাড়ি নেই। উঠোনেও নেই, ঘরেও নেই।

ফিরে আসতে আসতে ঝোপঝাড়ের এদিকে-ওদিকে তাকাল, যদি কোথাও উবু হয়ে বসে শাকপাতা কাটে কী আর কিছু করে। চোখে পড়ল না।

আরও খানিক এগোতেই দেখা হল মন্থরোর সঙ্গে। কোত্থেকে ফিরছে। মাথায় কাপড়ের টুপি, হাতে একটা গাছের ডাল— লাঠির মতো ধরে আছে।

প্রদীপকে দেখেই বলল, 'ফিরি যাচ্ছ খোকা?'

'মন্থরোর মাকে দেখলাম না—'

'তার কি কাজের কামাই আছে? তার বসি থাকলি চলে?'

প্রদীপ বিরক্তি চাপবার চেষ্টা করে বলল, 'তা বুড়ো মাকে এবার ছুটি দিয়ে নিজে কিছু করলেও তো পারো?'

'আমি ফকির হয়িছি।' বলে মন্থরো দাঁত বের করে একগাল হেসে হাত বাড়াল 'একটা সিগ্রেট দাও দিকি খোকা।'

'চান করতে যাচ্ছি, সিগারেট কোথায় পাব? তাছাড়া সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'তা'লি দশ নয়া দে যাও।'

মন্থরোর বয়েস এখন কত হবে? ঠিক ঠিক হিসেব করা মুশকিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে হয়তো। অথবা আরও বেশি। ছিল নিষ্কর্মা, হল ফকির!

দিঘিটা বছর-বছর ছোট হয়ে আসছে। জলও আগের মতো তেমন টলটলে নেই। তার ওপর কার্তিক-শেষের ঠান্ডা। তাছাড়া প্রদীপের সময়ও সংক্ষেপ। ১টা ২৩-এর বালিসোনা লোকালে না গেলে হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরা কঠিন।

বালিসোনা-লোকাল প্ল্যাটফর্ম বদলে শিয়ালদামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ট্রেন। জানলার ধারে বসে ঠাকুরদার কথা ভাবতে ভাবতে কানে এল— দুটো পয়সা দে যাও বাবা। আল্লা তোমার ভালো করবে, গরিবকে দুটো পয়সা দে যাও বাবা—

মন্থরোর মা কোমর থেকে প্ল্যাটফর্মের সমান্তরালে ঝুঁকে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনওক্রমে তার সাদা মাথা তুলে আশপাশের লোকেদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

এক দম্পতি বোধহয় তাদের ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভদ্রলোকটি ভুরু কুঁচকে মন্থরোর মার বাড়ানো হাতে ছোট কোনও একটি মুদ্রা ফেলে দিল। মন্থরোর মা হাতের লাঠিটা গলা আর কাঁধের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে খুব যত্ন করে পয়সাটা আঁচলে বাঁধল। তারপর লাঠি ঠুকে ঠুকে আরেক দলের কাছে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল— দুটো পয়সা দে যাও বাবা—

ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল।

প্রদীপ পার্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মন্থরোর মাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল। মন্থরোর মা যাদের কাছে ভিক্ষে চাইছিল সেখানে কিছু না পেয়ে পাশের লোকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ডাকল— দাদিমা! এই নাও— এদিকে, এই যে, ট্রেনের জানলায়—

মন্থরোর মা মাথা এদিকে ওদিক ঘুরিয়েই প্রদীপকে দেখতে পেল। অথবা তার গলা শুনে আন্দাজে তাকাল।

'এসো তাড়াতাড়ি। ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

মন্থরোর মা লাঠি ঠুকে এগিয়ে এল— 'খোকা! কবে এলি বাবা?'

'এলাম কী, যাচ্ছি। দিল্লি যাচ্ছি। তুমি তো আর তিতির নিয়ে এলে না?'

'তিতির ভালো নেগেছে তো খোকা? বর্ষায় এয়ো, কাছিমের ডিম দেব। কাত্তিক অব্দি থাকলি তালের আঁটির ফোঁপরা দেব।'

শেষবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল।

প্রদীপ নোট-সুদ্ধ হাতটা জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিল।

মন্থরোর মা নোটটা দেখে নিমেষের জন্য থমকে গেল।

'ধরো, ধরো।'

মন্থরোর মা হাত বাড়াল না, শুধু তার লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ট্রেনের পিছন দিকে মিলিয়ে গেল।

পরের বছর বাদায় হাতের আন্দাজে শাক তুলতে তুলতে সাপের ছোবলে নেতিয়ে পড়ার পর-পরই চৌধুরীবাড়ির দুজন মুনিষ কাঁধের গামছা পাকিয়ে মন্থরোর মার বাহুতে বাঁধন দিয়ে কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ভণ্ডুলের মুখে খবর পেয়ে সরোজিনী প্রদীপকে তাড়া লাগায়, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। এখনও যদি জ্ঞান থাকে, নিজের হাতে ওর মুখে একটু জল দিয়ো। এসো তাড়াতাড়ি।'

প্রদীপের মা এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে বললেন, 'না, খোকার যাবার দরকার নেই!'

এরপর আগামী সংখ্যায়

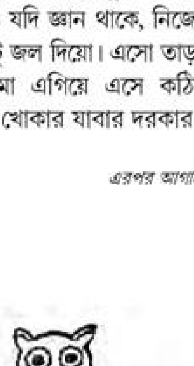

খোলা খাতা

যে-কোনও বিষয়ে যে-কেউ 'খোলা খাতা'য় তাঁর মন্তব্য বা বক্তব্য লিখতে পারেন। কাউকে আঘাত বা অসম্মান নয়, খোলা মনের ভাববিনিময়ের জন্য এই বিভাগ।

এখানে যারা কথাবার্তা বলেছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই লেখালেখির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কথাবার্তা প্রধানত বই নিয়েই, তবে ভাষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সামাজিক বিষয়ও উঠে আসে। আজকে পাঠকদের জন্য সেরকমই একটি আলোচনা তুলে দিলাম।
একটি আলাপচারিতার সূত্র ধরে শমীক ঘোষ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির মনোভাব সংক্রান্ত এই বিষয়ে আলাপচারিতা শুরু করেছিলেন। নিজে মূলত গদ্য লেখেন। কর্মসূত্রে গুজরাট হয়ে বর্তমানে মহারাষ্ট্রে। অন্য যারা এই আলাপচারিতায় মন্তব্য করার মাধ্যমে অংশ নিয়েছেন, তারা প্রায় সকলেই কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেই থাকেন।

▶ শমীক ঘোষ

"বাংলা ভাষাকে বলছে আঞ্চলিক,
হিন্দি রাষ্ট্র মতবাদ গড়ে তুলে,
দরকার হলে আমি খুব প্রাদেশিক
রাষ্ট্র মানি না নিজের ভাষাকে ভুলে।
প্রতিটি ভাষাই জাতীয় ভাষার দাবি,
কেউ কারও চেয়ে কম নয় বেশি নয়,
তবুও আমার স্বপ্নলোকের চাবি,
বাংলায় পাব পৃথিবীর পরিচয়।"
—কবীর সুমন

নিজেদের ভাষাকে নিজেদের সাহিত্যকে আমরাই যদি আঞ্চলিক বলি তাহলে আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই সব লেখা কেন পড়বে? কী দরকার? গুজরাতে দেখেছিলাম পুলিশ ডায়েরি লিখছে গুজরাতিতে, ভোদাফোনের কানেকশানের ফর্ম গুজরাতি, বাড়ির দলিল গুজরাতি এমনকি বাসের নম্বর গুজরাতি হরফে। গুজরাত বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগে ভারতবর্ষের সব থেকে এগিয়ে থাকা একটা রাজ্য। তারা যদি বিশ্বকে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি নিজের ভাষাকে আঞ্চলিক ভেবে হীনম্মন্যতায় না ভোগে, তাহলে আমাদের ভারতীয় বাঙালিদের এত হীনম্মন্যতা কেন?

▶ উদয়ন ঘোষ (কবি)

ঔপনিবেশিকতার অজুহাত আর আমাদের মেরুদণ্ডহীনতা, হীনম্মন্যতা শুধু গুজরাত কেন? মুম্বইয়ে সব সরকারি কাজ মারাঠি ভাষায় (বাসের নম্বরও)। তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি? যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সেখানে হয়, আর কোন আঞ্চলিক ভাষা শুনে চমকে যাই, "মা, জল খাবো।" কাল দাদাগিরিতে দেখলাম, তিন বছরের একটি বাচ্চা বলছে "অ্যাস"। মিঠুন বললেন, 'বাংলায় বলো'। মেয়েটি প্রচুর চিন্তা করে বলল, 'ডঙ্কি'। শেষে মিঠুন নিজেই বাংলাটা বলে দেওয়ায় বাচ্চাটি বলল, 'মা এটা শেখায়নি'।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী (কবি, অনুবাদক)

গুজরাতিরা ভারি অবলীলায় বলতে পারে, "গুজরাতে থাকতে হলে তো গুজরাতি ভাষা জানতেই হবে, নইলে বেশি দিন থাকতে পারবে না।" মহারাষ্ট্রে মারাঠি জেনে ও না-জেনে মারাঠি মানুষের সঙ্গে মেশার মধ্যে অনেকটা প্রভেদ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমরা, বাঙালিরা অবাঙালিদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের সুবিধার জন্য হিন্দি বলি।

কোনও ভাষার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনও বিরোধিতা বা অপছন্দের ভাব নেই, আমি বিভিন্ন ভাষা জানতে পছন্দ করি। কিন্তু বাঙালি হিসেবে বাংলাকে অন্য সব ভাষার ওপরে স্থান দেওয়াটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে মনে করি। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট ভাবে বজায় রাখার মাধ্যমেই অন্যের সঙ্গে মেলবন্ধন সম্ভব। বিগত বহু বছর, বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতা আজ আমাকে এভাবে ভাবায়।

▶ শমীক ঘোষ

উদয়ন, অথচ আমরা মাতৃভাষার জন্য দু'বার অন্তত রক্ত দিয়েছি। অবশ্য আমরা মানে এখানে আমি জাতি হিসেবে বাঙালিদের কথা বলছি, কারণ পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাঙালিরা কখনও ভাষার জন্য রক্ত ঝরাইনি।
দোলনচাঁপা, আসলে গুজরাতিরা তো ব্যবসাদার। ওরা ব্যবসার জন্য ভাষা শেখে, তা ইংরিজি হলে ইংরিজি, বাংলা হলে বাংলা, চায়না হলে মান্দারিন। আর বাড়িতে বলে মাতৃভাষায়। আমরা তো আসলে কেরানি, তাই প্রভুদের খুশি করতে তাদের ভাষায় কথা কইতে চাই। তা সে যতই ভুল হিন্দি হোক না কেন।

▶ প্রার্থপ্রতিম মণ্ডল

আসুন, আমরা সবাই আমাদের শিশুদের মনে বাংলা সম্পর্কে গর্ববোধ গড়ে তুলি।

▶ কণিষ্ক ভট্টাচার্য

অন্তত এই 'খোলা খাতা'য় বাংলায় মতামত প্রকাশ করি, ঠিক বাংলায়। ('সঠিক' নয়, ওটা ভুল)

▶ চন্দ্রাণী ঘোষ

মনে হয় ভাষা নিয়ে যন্ত্রণাটা তারাই বেশি অনুভব করে যাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে এমন একটা জায়গায় এসে পড়তে হয় যেখানে চারপাশে ক্বচিৎ কেউ তার নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। যে রাজ্যে বেশিরভাগ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে সেখানে আজকাল জন্মের কিছুদিন পরেই মা, বা মা চাকুরিরত হলে, ঠাকুমা (যিনি নিজে সাকুল্যে ক'দিন স্কুলে যেতে পেরেছেন সন্দেহ) আত্মীয়বন্ধু বাড়িতে এলেই শিশুকে বলেন, 'নোজ কই, দেখাও তো তোমার নোজ। আর টাঙ্গ, টাঙ্গ। আর আইজ, আইজ। আর বেলি, বেলি'। যদিও প্রথম দিকে বাচ্চা আইজ বললে ছোট্ট জামাটা তুলে পেট দেখায়। ইয়ার বললে দু'বার চোখ পিটপিট করে চোখ দেখায়। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাখি-পড়া করে বলে-বলে ওগুলো গিলিয়ে দেওয়াই হয়। আর ওই প্লে-স্কুল না কী, সেখানে ভর্তির আগে 'হোয়াট ইজ ইয়োর নেম', 'হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার'স নেম', 'হোয়াট ইজ ইয়োর গ্র্যান্ড-ফাদার'স নেম' এসবও গিলিয়ে দেওয়া হয়। তিন বছরের শিশুকে সুন্দরী ম্যা'ম ইংরিজিতে নিজের নাম জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে ফেলে 'মাই ফাদাল'স নেম ইজ অমুক' তবে তো খুব কেলো, ডিস-কোয়ালিফাই। বাবা-মা

ওই ধোকলা আর কেম ছো মজা মা ছাড়া আর কিছু জানি না

রাতদিন ভেবেই আকুল 'আমার ছেলেটা (বা মেয়েটা) পিছিয়ে পড়ল, সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে'। বাংলাভাষী রাজ্যের একটা অংশ এখন এরকমই এক অলীক প্রতিযোগিতায় শুরু থেকে দৌড়চ্ছে। এখন আর তাই আধো-আধো উচ্চারণে শোনা যায় না 'তাদ উতেচে ফুল ফুতেছে... বা ইকিল মিকিল ছাম চিকিল, চামেল কাটা মজুমদাল...।' অথচ স্কুলের বাংলা হোমটাস্ক-টা করছে ঠিকঠাক। আরও বড় হলে খুব কম সংখ্যক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পাবে বলে একটু 'আবোলতাবোল' বা আবৃত্তি শিক্ষকের শেখানো ছড়া সুর করে বলছে। আশ্চর্য লাগে যখন এ শহরে যেখানে আমি থাকি, আমার পাশের বাড়ির বছর পাঁচেকের মিষ্টি ছেলেটার সঙ্গে কিছুতেই আমি ভাব জমাতে পারি না কারণ ও কিছুতেই মারাঠি ছাড়া অন্য ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। তাহলে কি এখানে স্কুলে ভর্তির যোগ্যতার নিয়ম আলাদা? প্রথম প্রথম অদৃশ্য হাত জোড় করে রাখতাম মারাঠি সমবেত কোনও অনুষ্ঠানে। বলতাম (মনে মনে) 'ওহে আমি 'ইকড়ে-তিকড়ে' আর 'পুরে চলা' ছাড়া আর একবর্ণ জানি না, দয়া কর আমার ওপর'। একইভাবে গুজরাতিদের মাঝে ওই ধোকলা আর 'কেম ছো', 'মজা মা', ছাড়া আর কিছু জানি না। আবার প্রতি বৃহস্পতিবার উল্টোদিকের দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হলে সারা সন্ধে দু'হাতে মাথা ধরে বসে থাকি। 'আয়াপ্পা' ছাড়া কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। আসলে নিজেদের ভাষার মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে থাকতে পারার সৌভাগ্যে মনে হয় এইসব বাঙালি নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে ভুলে গিয়ে অহেতুক প্রয়োজনের টানে ছুটছে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি, বিভিন্ন ভাষা শিখতে আমার ভালো লাগে। আর আমার মনে হয় ভাষা একটা মানুষের সঙ্গে অন্য একটা মানুষের সম্পর্ক গড়তে বেশ সাহায্য করে। এজন্য বাঁকুড়ার অখ্যাত এক জায়গায় একটিমাত্র হোটেলের ছেলেটাকে স্থানীয় উচ্চারণে কথা বলতে সে খুশি হয়ে নিজের ভাগের আলু ভাজাটুকুও উপুড় করে ঢেলে দেয় আমাদের পাতে। আবার মহারাষ্ট্রের একজন আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে গ্রামের অন্য বাড়িতে বেড়াতে গেলে শুধু মারাঠি সম্বোধনগুলো জানতাম বলে ওরা আমাকে কত ভালোবেসেছিল। আবার ওই গ্রামেই, যার ত্রিসীমানায় বাঙালির চিহ্ন নেই, সেখানে জন্ম থেকে মানুষ হওয়া আমার ওই আত্মীয়ের পুত্র দুটি যখন এক অক্ষর বাংলা পড়তে না পারলেও বাড়িতে নিজেদের মধ্যে বা আমাদের সঙ্গে প্রান্তিক বাঙাল ভাষায় কথা বলে তখন আনন্দ হয়।

আর হ্যাঁ, এখানে আমি বাংলাভাষীর একটা অংশের কথা

বই-ঠেক

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

▶ বাংলা গদ্যের যাঁরা ইতিহাস লিখেছেন, কেউ-ই তাঁরা উপেন্দ্রকিশোরকে গুরুত্ব দেননি। প্রমথ চৌধুরির 'সবুজ পত্র'-র চলিত গদ্য নিয়ে হৈচৈ শুরু হওয়ার ঢের আগে উপেন্দ্রকিশোর অনবদ্য গদ্যে লিখেছিলেন **টুনটুনির বই**। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'টুনটুনির বই'-এর পুনর্মূল্যায়ন হোক।

▶ আমাদের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সাগরপারের শিশুসাহিত্যের থেকে খুব কিছু কম নয়। আজও তবে এ বঙ্গের বা বহির্বঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা শিশুসাহিত্য পড়ানো হয় না কেন? এম এ-তে স্পেশ্যাল পেপারে কত বিষয়ই তো পড়ানো হয়। পড়ানো হোক না বাংলা শিশুসাহিত্য।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

▶ আমাদের ভিডিও ক্যামেরার সামনে তাঁর **স্তনদায়িনী** গল্পটি পড়তে পড়তে থেমে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন, 'এ কী করে লিখলাম! কীভাবে যেন লেখা হয়ে গেছে!'

'স্তনদায়িনী' বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির একটি বলে আমি মনে করি। 'স্তনদায়িনী'র আগে আমার অনুরোধে প্রথমেই পড়লেন **তালাক**। এই গল্পটিকে আমি গ্রামবাংলার মর্মোৎসারিত শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প বলে ভাবি। গ্রামবাংলার জীবনযাপনের ছন্দ ও জীবিকানির্বাহের দ্বন্দ্ব নিংড়ানো এরকম আরেকটি আশ্চর্য গল্প পড়েছিলাম বহুকাল আগে— গল্পটির নাম **রস**। লেখক, ছোটোগল্পের যাদুকর নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

অমর মিত্র

▶ **দশ লক্ষ বছর আগে** খুব সম্ভবত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস। এই নভেলেটটি মানবজীবন, জিন প্রযুক্তি, জীবের টিকে থাকা, অবলুপ্তি— সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেছে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। দশ লক্ষ বছর আগের একটি প্রাণী বাঘ দশা কোনওরকমে টিকে গিয়েছিল, সে রাতে বেরয় একা একা, বুড়ো লোকটি তাকে দেখতে পায়। কাহিনী বলা সম্ভব নয়, এই নভেলেটটি পড়লে ধরা যাবে লেখার ভেতরে কোথাও এক দৈবী পাগলামি আছে।

প্রেমচাঁদ কিষেণচাঁদের মত লেখকরাও উর্দুতে লিখেছেন

বলেছি। তাদের কথা এর মধ্যে আসছে না, যারা এখনও মন দিয়ে ভাষাটাকেই ভালোবাসে আর যাদের টানে এখন ওই দেশে যেতে ইচ্ছে করে আর যাদের সান্নিধ্য নিয়ে ফিরে এসে কিছুদিন আবার এদেশে কাটানোর জোর পাই।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

(ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। 'বহির্বঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক)

'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' মানে 'আঞ্চলিক' তো নয়। রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কেবলমাত্র একটি চলতি ধারণা। অফিশিয়ালি বলা হয় অহমীয়া, বাংলা এবং হিন্দি— মেজর ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারেই হিন্দি ব্যবহৃত হয়। সুমন ভুল প্রচার করছেন। গান বাঁধলেই আই পি টি এ-এর বৈপ্লবিক সম্মান মেলে না।

▶ শমীক ঘোষ

অরুণ চক্রবর্তী স্যার, আপনার বোধহয় একটু ভুল হল। অফিশিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজেস অ্যাক্ট-এ এই কথাটা ছিল। ভারতবর্ষের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কয়েকটা ভাষাকে চিহ্নিত করা আছে মাত্র। কিন্তু রাজভাষা বলে যে হিন্দির প্রচার চলছে, তা নিয়ে বার বার এত গণ্ডগোল হল, সেটা কি ভুল? ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা পি এস ইউ-তে 'রাজভাষা' বলে একটা দপ্তর থাকে যাদের কাজ শুধু হিন্দি প্রচার করা। আমি যখন চাকরিতে ঢুকি তখন আমাকে লিখিত বয়ান দিতে হয়েছিল যে আমি হিন্দি জানি। আমার ভিজিটিং কার্ড থেকে স্ট্যাম্প— সবকিছু দ্বিভাষিক, শুধু হিন্দি আর ইংরিজিতে। মহারাষ্ট্রেও মারাঠি ভাষায় নেই। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে বারংবার হিন্দি 'রাজভাষা' রাষ্ট্রভাষা— এটা কি প্রচার করা হয় না? আপনি কি জানেন যে আমি বাঙালি বলে যদি হিন্দি-র 'প্রাজ্ঞ' ইত্যাদি কোর্স করি, তাহলে ষোলো হাজার টাকা পুরস্কার পাব? বিশ্বাস না হলে এই সাইটটি দেখতে পারেন: http://rajbhasha.nic.in/ (ডিপার্টমেন্ট অব অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ওয়েবসাইট যেখানে লেখা রয়েছে— 'আমি হিন্দির মাধ্যমে প্রান্তিক ভাষাগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না বরং হিন্দিকেও ওগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাই')।

চন্দ্রাণী, ভাষা নিয়ে আপনার এই কথাটা খুব সত্যি। ভারি চমৎকার লিখেছেন। কোমল লাগল। কিন্তু ভাষার তো একটা রাজনীতিও আছে। আমি গুজরাতে অনেক বন্ধু পেয়েছি যারা তাদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আজও ফোন করেন। দীপাবলির দিন মিষ্টি পাঠাতেন বাড়িতে।

এরা আমার সহকর্মী নন। পথেঘাটে, অফিসের সূত্রে চেনা। আবার গুজরাতে আমি বাঙালি বলে যে পরিমাণ হেনস্থা হয়েছি, সেটাও ভুলতে পারি না। তফাৎ হল, আমি বলি আর কেউ কেউ প্রবাসী হওয়ার পর এই চাপটা না নিতে পেরে নিজেরাই বাঙালিদের গাল দেয়।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

শমীক, আমরা মূল বিন্দু থেকে সরে আসছি। আমার মনে হয়েছে যে আমরা 'আঞ্চলিক', এটা বোঝাতে চেয়েই আপনি কবির সুমনের কথা তুলেছিলেন। এটা ঠিক নয়। বাংলাকে 'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' অর্থাৎ 'প্রাদেশিক ভাষা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বহু আগে থেকেই হিন্দি ভারতবর্ষের মূল ভাষা। কয়েক বছর আগে দমদমে যে ষষ্ঠ শতকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাতে দেবনাগরী ভাষার লিপি পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে, বাঙালিরা বাংলাকে তাদের রাজ্যের মুখ্য ভাষা করেনি। এর জন্য কে দায়ী? পশ্চিমবঙ্গে আবশ্যিকভাবে বাংলা শিখতে বাধ্য করা কীভাবে সম্ভব? আমার কাছে এর কোনও উত্তর নেই। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)।

▶ শমীক ঘোষ

স্যার, আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। বাংলা ভাষা 'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' হতে পারে না। শুধু এই কারণে নয় যে এটি অন্য একটি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা, বরং এজন্যেও যে ভারতের সংবিধান কখনও এরকম কোনও কিছু মেনে নেয়নি। আমি যতদূর জানি, হিন্দুস্থানি ও উর্দু নামে দুটি ভাষা ছিল। হিন্দি ভাষাটি অনেক পরে আসে। প্রেমচাঁদ, কিষেণচাঁদ-এর মতো বড় মাপের লেখকরাও উর্দুতেই লিখেছেন। হঠাৎই তারা হিন্দিভাষী লেখক হিসেবে পরিচিত হতে লাগলেন। দেবভাষা সংস্কৃতের লিপি ছিল দেবনাগরী। কিন্তু হিন্দি কীভাবে দেবনাগরীর সমমানের হয়? 'প্রাদেশিক' শব্দটা 'রিজিওনাল' শব্দটার মতোই নেতিবাচক একটা শব্দ। আমি আসলে আলোকপাত করতে চেয়েছি যেভাবে 'ভারতবর্ষ' নামের এই অনবদ্য ধারণাটির বহুমাত্রিকতা (হেটেরোজেনিটি অব দিস ওয়ান্ডারফুল কনসেপ্ট কলড ইন্ডিয়া) 'এক ভাষা এক রাষ্ট্র' নীতির দ্বারা বারংবার বিধ্বস্ত হচ্ছে, সেই বিষয়টিতে। এটা খুবই ভীতিপ্রদ কারণ এই নীতির চর্চা থেকেই 'এক ভাষা এক ধর্ম' নীতির প্রবর্তনের পথ পরিষ্কার হবে। এটুকুই আমার বক্তব্য। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ অরুণ চক্রবর্তী

স্যার, আপনার বক্তব্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। হিন্দির অনুপস্থিতির কারণে প্রেমচাঁদ এবং অন্যান্যরা উর্দুতে লিখেছিলেন। না না, লোকের মুখে শোনা কথা বিচার করলে আমাদের চলবে না।

(মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ শমীক ঘোষ

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলুন, আর আমাকে স্যার বলবেন না। শব্দটায় ঔপনিবেশিকতার গন্ধ লেগে রয়েছে। আপনাকে বা এই গ্রুপের অন্য কয়েকজনকে স্যার বলা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই যেহেতু আপনারা আমার থেকে অনেকটাই বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি এও বুঝলাম না যে ষষ্ঠ শতকে দেবনাগরী লিপির ব্যবহার কীভাবে সেই সময় থেকে হিন্দির উপস্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করল। বাংলা মাগধী প্রাকৃত থেকে তৈরি হয়েছিল। আমি যদিও ভাষাবিদ নই। আরেকটা কথা, কতজন জানেন যে প্রেমচাঁদ এবং কিষেণচাঁদ উর্দুতে লিখতেন? এখন তাঁদের হিন্দি লেখক হিসেবে প্রচার করা হয় কেন?

দেখুন, আপনার মনে হতে পারে যে আমি হিন্দি-বিরোধী কিন্তু আমি আসলে তা নই। নির্মল ভার্মা আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম। আমার পক্ষে হিন্দি-বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। আরেকবার সুমনকে কোট করছি, "আমি চাই সাঁওতাল তাঁর ভাষায় বলবে রাষ্ট্রপুঞ্জে"। আমি ভারতবর্ষের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দিকে তুলে ধরার বিরুদ্ধে কারণ তা ভারতবর্ষ নামের বহুমাত্রিক ধারণাটিকে সমূলে গুঁড়িয়ে দেয়। আমার কিছু বই প্রয়োজন। আপনাকে অবজ্ঞা করা সম্ভব নয় আপনি এতটাই বিশিষ্ট মানুষ। উত্তর দেওয়ার আগে আমার আরও একটু সময় দরকার। কাজের চাপে মাথা খারাপ এখন।

(মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ সুরজিৎ ঘোষ

এটা একটা অসাধারণ তরজা। দুজনই বাঙালি। বাংলা ভাষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, অথচ পুরোটাই ইংরিজিতে।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

আমার কলোনিয়াল আতঙ্ক নেই। ইংরিজি ভারতের মুখ্য ভাষাগুলির অন্যতম। মৌলবাদী ভাবধারাকে আমি ঘৃণা করি। আমাদের ভেতর থেকে উন্নত হতে হবে। যেভাবেই হোক বাংলাকে কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে, এটা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় সেটা বোঝা যাবে যদি আমরা জানি যে কেন ইংরিজি এখনও ভারতীয় ভাষাগুলির একটা আর কেন ফারসি কেবল স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েই থেকে গিয়েছিল, আর কেন বাংলা রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি ভাষা। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ অমর মিত্র (গল্পকার-ঔপন্যাসিক। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে বঙ্কিম পুরস্কার ও 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের জন্য ২০০৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত)

চমৎকার আলোচনা হচ্ছে, আরও হোক।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় (কবি, 'বৈখরী ভাষ্য' পত্রিকার একজন সম্পাদক)

হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত।

বই-টই

অমর মিত্র

▶ **কালো রুটি** এক অখ্যাত লেখক সমীর রায়চৌধুরির লেখা উপন্যাস। এক তেরো বছরের কিশোর খাওয়ার জন্য কলকাতার উত্তরভাগে ছুটে বেড়ায়। ক্ষুধা আর ক্ষুধার্তের এমন ভয়ানক কাহিনী আমাকে স্তম্ভিত করেছিল অনেকদিন আগে। দারিদ্র্য কত নিদারুণ হতে পারে তা শহরতলির পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে যের পাওয়া যায়। আবার পড়তে গিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কির **মাই চাইল্ডহুড**-এর কথা মনে পড়ে যায়। সমীর রায়চৌধুরি অকালপ্রয়াত।

▶ **ভয় ভয়** তরুণ লেখক জয়ন্ত দে'র উপন্যাস। এক নিতান্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তার বাড়িটি প্রোমোটারকে দিয়ে ফ্ল্যাটের অপেক্ষায়। বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়, লোকটি অপেক্ষা করে, তার জমিতে ঘাসের জঙ্গল, বাড়ি ওঠে না। সে প্রত্যহ খোঁজ করতে যায় অসামাজিক প্রোমোটারের ঘাঁটি এক নির্মীয়মাণ বহুতলে। ওখানে একদিন জ্ঞানহারা হয়ে কোমায় চলে যায়। উপন্যাস হয়ত এখানেই শুরু। অজ্ঞান সেই মানুষ, লোভী জমি-হাঙর, এই সমাজ, দেশ— এ যেন এই ভারতবর্ষের আর এক চেহারা। অজ্ঞান দৃষ্টির রূপ।

উদয়ন ঘোষচৌধুরি

▶ অরুণেশ ঘোষের **গল্পসমগ্র ১** আঙুল ঠুসে দেয় আমাদের ঠুলি পড়া ন্যুজতার চোখে। পরতে পরতে চিরে দেওয়া গদ্য, জ্যান্ত চরিত্র, প্রান্তিক স্বরক্ষেপণ— যা মূল বাজারে না-জানা। বাড়তি পাওনা গল্পগুলির ওপর লেখকের ডায়েরি-নিংড়ানো নোট। স্বাভাবিক দুঃখ— কলেজ স্ট্রিটের ধাঁধায় এ বইয়ের অনুপস্থিতি।

▶ **বাংলা স্ল্যাং-সমুচয় ঠিকুজীকুষ্ঠী:** অজিত রায়ের এই বই অশালীন? অনাচারিক? ভালগার? ইতরসুলভ? যৌনতাবাচক? প্রান্তিক? কী এবং কী নয়? সংজ্ঞার্থ, ভাষাতত্ত্ব, গড়ন, মেয়েলি চোরাগোপ্তা, ছলছুতো, সাহিত্যানুষঙ্গ— সবশেষে একটি অভিধান। কিছুটা অসম্পূর্ণ— লেখক বলেছেন, অর্থাভাবে। কেউ ভেবে দেখতে পারেন— একটি পূর্ণাঙ্গ রিসার্চের জন্য।

▶ **প্রিয় সুব্রত:** বইটির লেখক ভাস্কর চক্রবর্তী। প্রকৃত এক কবির কলমে সাবলীল গদ্য। একটু ব্যক্তিগত, তবু বোধ ও চেতনে সার্বিক। স্মার্ট ইস্ত্রির নীচে প্রিয় ফুসকুড়ির মতো। কমলকুমার মজুমদারের অসম্ভব লাগসই প্রচ্ছদ— ক্যালিগ্রাফি-কেরামতির জ্বলজ্বলে এক উদাহরণ।

স্বাধীনতার এত বছর পরে ওটাকে পাল্টানোর কোনও প্রয়োজন দেখি না। হিন্দি ভারতবর্ষেরই একটি ভাষা, এটা মনে রাখা দরকার। বাংলা ভাষা নিজেদের রাজ্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি যদি গুজরাতে গিয়ে দেখি সব গাড়ির নম্বর গুজরাতিতে লেখা, সেটা আমার একদমই ভালো লাগবে না, কারণ আমার অসুবিধা হবে খুব। রাজ্যের ভাষা ছাড়াও অন্তত হিন্দিতে সেটা লেখা থাকা উচিত। মহারাষ্ট্র কিছু জিনিস ভুল করছে বলে আমাদেরও বদলা নিতে সেটাই করতে হবে, এটা ঠিক নয়। আজকের বিশ্বে তো নয়ই।
নিজেদের ভাষা শেখ, প্রচার করো, কিন্তু গোঁড়াবাদী হতে চাই না। গুজরাতিদের মধ্যে কতজন সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায় আর কতজন ব্যবসা নিয়ে। তা বলে কি আমরাও তাই অনুসরণ করব? কেন করব? তবে হ্যাঁ, আমাদের ভাষাশিক্ষা যেহেতু রুজির সঙ্গে যুক্ত, সেইজন্যই হয়তো বাংলা অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুদ্ধ চর্চার মধ্যে রাখি না। বাংলা যদি কর্মক্ষেত্রেও কাজে লাগত তাহলে সত্যিই ভালো হত। গুঁতো থাকলে আমরা শিখি তাড়াতাড়ি। কিন্তু একটা জিনিস ভাবি, এত এত বাংলায় এম এ করা ছাত্রছাত্রী দেখি— এত "ভোঁতা" যে মনে হয় ভাগ্যিস ওটা করিনি।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

সব আলোচনা সদর্থক হবে তখনই, যখন বাংলাকে আমরা অফিশিয়ালি পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারব। সেটার জন্য বাংলা ভাষাপ্রেমীরা চুপ করে আছেন কেন? অনেক লড়াই, অনেক কষ্ট করতে হবে, সেই ভয়ে? এইজন্যেই বাংলা-বাংলা বলে কাউকে চিৎকার করতে দেখলে হাসি পায়।

▶ শমীক ঘোষ

অনির্বাণ বলেছেন, 'হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত। স্বাধীনতার এত বছর পরে ওটাকে পাল্টানোর কোনও প্রয়োজন দেখি না'। কী মুশকিল! হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হল কবে থেকে? অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টটা ভালো করে দেখতে বলছি। ভারতবর্ষের কোনও রাষ্ট্রভাষা বা রাজভাষা নেই। যা আছে তা হল খান কুড়ি অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। অরুণ চক্রবর্তী, ভালো লিখেছেন। কিন্তু বেশ কয়েকজন গলা তুলে বাংলা বাংলা বলে না চেঁচালে সেটা কোনওদিনও হবে না।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

শমীক, হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা নয় বলেই তো বললাম যে হওয়া উচিত।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী

অনির্বাণ, শমীক... "ওরা কেবল, কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে"!

▶ অমর মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে যারা থাকেন, তাদের বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। হয়নি, এখানে অবাঙালির শক্তি বেশি, তারা সরকারকে করতে দেয়নি। শুনেছি এতে একজন মন্ত্রী অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন— এটা কয়েক বছর আগেকার কথা। স্কুলশিক্ষায় এটি করতে প্রস্তাব এসেছিল। এখানে সবটাই ভোটের রাজনীতি।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী

সব জায়গাতেই ভোটের রাজনীতি অমরদা। কিন্তু এমন নিশিতে পাওয়া জাত আর একটাও দেখি না!

অনির্বাণ, তুমি বলছিলে, গুজরাতে গিয়ে সব গাড়ির নাম্বার প্লেট গুজরাতিতে দেখলে তোমার অসুবিধা হবে। নিশ্চয়ই হবে, বিরক্ত লাগবে। কিন্তু কী জানো, এভাবেই আমরা ওই ভাষাটা খুব তাড়াতাড়ি শিখেও যাব।

নিজের প্রতিবেশী ক'টা রাজ্যের ভাষা আমরা জানি? হিন্দি বলয়েই হিন্দি ব্যতীত আরও অনেক ডায়ালেক্ট চলে, যা হিন্দির চেয়ে অনেক শ্রুতিমধুর, বলাও সহজ। কিন্তু হিন্দি জানা-বোঝার কারণে আমরা সেগুলো শিখতেও চেষ্টা করি না, কাজ তো চলে যায়— তাহলে আর কী দরকার! অথচ সত্যিই দরকার আছে।

মৈথিলী বলতে পারলে একজন মৈথিলীভাষী মানুষের যত কাছে যাওয়া যায়, হিন্দির মাধ্যমে তা কখনওই সম্ভব নয়। আর, দক্ষিণীরা তো হিন্দি বলেই না— বরং ইংরিজি প্রেফার করে, কিন্তু হিন্দি নয়। আমাদের ভাবা উচিত, এই বিতৃষ্ণার কারণ কী।

হিন্দির জন্যই বরং আমরা আরও বেশি রিজিড হয়ে পড়ছি অন্য ভাষাভাষীদের সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে, ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ নষ্ট হচ্ছে। হিন্দি, ইংলিশ শিখলেই কাজ চলে যায় সর্বভারতীয় স্তরে— কে আর বাংলা পড়ে সময় নষ্ট করে। বাংলায় এম এ করা শিক্ষার্থীরা dull হলে সেটা তাদের দোষ, আমার ভাষার দোষ নয়।

▶ অমর মিত্র

দোলনচাঁপা, কে বোঝাবে এই জাতিকে, বাংলা ভাষার প্রতি এদের কী তুচ্ছতা! অন্য প্রদেশ পারলে আমরা পারব না কেন? আমাদের সব তো ভিন প্রদেশী বেনিয়াদের কাছে বাঁধা দিয়ে রেখেছি, ভাষাও। আসলে রাজনৈতিক দলগুলি সরব না হলে কিছুই করা যাবে না। লোক দেখানো পয়লা বৈশাখ আর পঁচিশে বৈশাখ পালন হবে। সাইন বোর্ডে কালি লেপা হবে।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী

একদম তাই অমরদা। মজার ব্যাপার হল, বড়বাজারের মারোয়াড়ীরাও তাদের গদিতে যাওয়া বাঙালিদের সঙ্গে যেটুকু বাংলা বলে, আমাদের পরের প্রজন্ম রিয়েলিটি শো-এর দৌলতে সেটুকুও শিখছে না। রাজনৈতিক নেতাদের দায় পুরোটা নয়। মায়েদের চটজলদি যশের আকাঙ্ক্ষাও বাঙালি শিশুদের বাংলার শিকড় থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

দোলনচাঁপা, আমরা যারা বহির্বঙ্গে থাকি তাদের কাছে কিন্তু অন্য ভাষা জানাটা নিজের বাংলা ভাষাকে আরও ভালোবাসার পরিচয়। হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল 'নিরালা' বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলেন। এমনকি, তাঁর অনুজ কবি (জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত) সুমিত্রানন্দন পন্থের প্রশ্নের উত্তর দিতেন বাংলায়, কবিতা লিখে। এ তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি বশ্যতা ছিল না, ছিল আপন ভাষার প্রতি আনুগত্য। গতবছর দিল্লিতে বহির্বঙ্গ উৎসবে আয়োজন করেছিলাম সর্বভারতীয় ভাষার কবি সভা। বাংলার বড় মাঝারি ছোট অনেক কবিই (নবনীতা দেবসেন, সব্যসাচী দেব প্রমুখ) ছিলেন সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে। সেখানে ভিন ভাষার অধিকাংশ কবিই বাংলায় নিজেদের কবিতার পরিচয় দিয়ে তারপর নিজ ভাষায় কবিতা পাঠ করেন। মৈথিলী কবি গঙ্গেশ গুঞ্জন তো মৈথিলী ও বাংলা, দুটি ভাষায় দুটি কবিতা পাঠ করলেন। অন্যদিকে বাংলার একজন কবিও একটি বাক্যও হিন্দি বা ইংরিজিতে বলার প্রয়াস করেননি। 'আমরা জানি আমরা জানি' বলে ভিন ভাষী কবিরা আমাদের কবিদের অস্বস্তি নিবারণ করছিলেন। আমি যদিও অনুষ্ঠানের শুরুতে মধ্যে এবং শেষে বাংলা-ইংরিজির মিশেলে সঞ্চালন করছিলাম, তবু কেউ কোনও ইঙ্গিত গ্রহণ করেননি। ভাষা নিয়ে একি আমাদের উন্নাসিকতা? জানি না। অথচ, এই থ্রেডে দু-দুবার উল্লেখ করার পরেও একজনও খেয়াল করলেন না যে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সরকারিভাবে রাজ্যের স্বীকৃত ভাষা নয়। তবু কথা কথা কথা...

▶ শমীক ঘোষ

স্যার, আমার মনে হচ্ছে হয় আমি সংশয়ে রয়েছি অথবা অন্যদের সংশয়ান্বিত করে ফেলছি। মন্তব্য করার জন্য বিষয়টা সামান্য হলেও বোঝা দরকার এবং অন্যদের মন্তব্যগুলো পড়া দরকার। আমি,

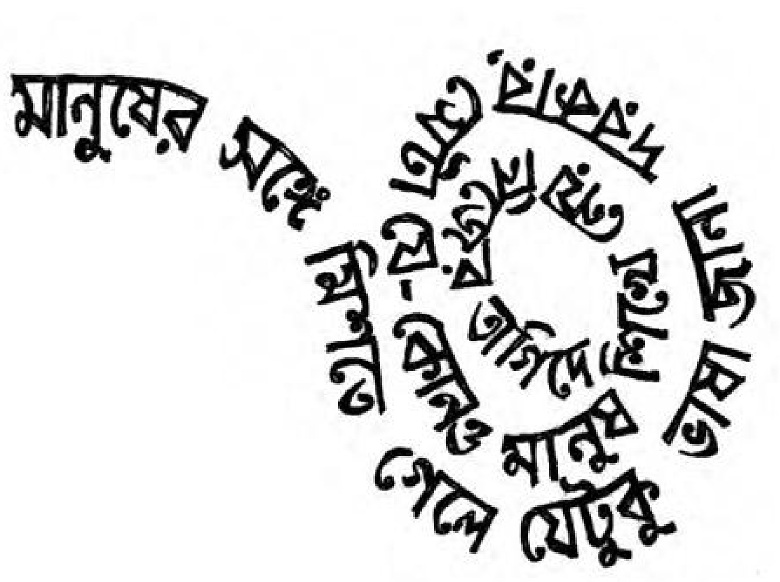

ব্যক্তিগতভাবে আমেদাবাদে থাকাকালীন প্রথম মাসেই গুজরাতি ভাষা পড়তে শিখে নিয়েছিলাম। তবে গুজরাতি ভাষায় কথা বলতে আমার আরও তিন-চার মাস লেগেছিল। মারাঠি এমন একটা ভাষা যা আমি সব সময়ই শিখতে চেয়েছি যাতে আমি মারাঠি নাটক দেখতে পারি যা, সারা ভারতবর্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আমি নেপালি ভাষা বুঝতে পারি, কষ্ট করে হলেও বোধহয় পড়তেও পারব এখনও। এতদসত্ত্বেও আমার হিন্দির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, যেহেতু আমি কোনওদিন হিন্দি শিখতে চেষ্টাই করিনি।

আপনি বারবার বলছেন যে বাংলা পশ্চিমবঙ্গের সরকারিভাবে স্বীকৃত ভাষা নয়। হিন্দি এবং ইংরিজি বাদেও, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কাজ বাংলা, নেপালি এবং উর্দুতে (সম্ভবত অলচিকি-তেও) করা সম্ভব। মূল কথাটা হল পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারি কাজ বাংলায় করা হয় না, তার জন্য একটি ধারণা দায়ী যে আইনি জটিলতা এড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাটা নিখুঁত নয়।

যদি এখানে কিছু ব্যতিক্রমও থাকত, অন্য সব বিষয়ের মধ্যে, সেটা আমার একেবারে গোড়ায় যা বলেছি তা থেকেই বেরিয়ে আসে। আপনার আগের মন্তব্যগুলোর মধ্যে পরিস্ফুট কয়েকটি খাপছাড়া ধারণা নিয়েও আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

আপনি লিখেছেন, 'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' মানে 'আঞ্চলিক' তো নয়! রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কেবলমাত্র একটি চলতি ধারণা। অফিশিয়ালি বলা হয় অহমীয়া, বাংলা ও হিন্দি— মেজর ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারেই হিন্দি ব্যবহৃত হয়।' জানতে চাইব যে, কোন বর্ণানুক্রম অনুসারে হিন্দি অহমীয়া'র আগে আসতে পারে। অথবা সম্ভবত, আপনি অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছেন, বোঝার সুবিধার জন্য দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন?

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত ষষ্ঠ শতকের মুদ্রায় দেবনাগরী লিপি থাকার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আপনি 'দেবনাগরী' শব্দটি ব্র্যাকেটের ভেতরে রেখে 'হিন্দি' কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই হিন্দি ও দেবনাগরীর মধ্যে কী পার্থক্য, তা জানেন। তাই আপনার এই কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমি একবার 'হিন্দুস্থানি' শব্দটা আমার কথায় উল্লেখ করেছি। হিন্দি, হিন্দুস্থানি এবং উর্দুর মধ্যে পার্থক্যগুলো জানতে চাইব আপনার কাছে।

ভারতীয় সংবিধান এবং সরকারি ভাষা কমিশনের আটটি এজেন্ডা সম্পর্কে কি আপনার ধারণা আছে? এই বিষয়ে আপনার ধারণা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানতে পারলে আমাদের কথোপকথনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সুবিধা হবে। (আমার মন্তব্যটি আমি বেশ কয়েকবার মুছে লিখেছি। এর ফলে আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছে এবং তার জন্য আমি দুঃখিত)। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ অমর মিত্র

ভূপালে ভারত ভবনে ১৯৮৮ সাল নাগাদ গিয়েছিলাম 'অন্তর্বর্তী' নামের একটি তিন-চার দিনের অনুষ্ঠানে। যে হিন্দিভাষী লেখক-কবিরা এসেছিলেন, তারা হিন্দি ব্যতীত এক বর্ণ ইংলিশও ব্যবহার করেননি। সকলে গল্প বা কবিতা ইংলিশে অনুবাদ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দি কবি বা গল্পকাররা ব্যতিক্রম। এই অভিজ্ঞতা আরও হয়েছে। বহির্বঙ্গ উৎসবে বাংলা জানা হিন্দি লেখক-কবিরা এসেছিলেন। যেহেতু এটি বাঙালিদের

বই-টই

উদয়ন ঘোষচৌধুরি

▶ **আহা ভাত প্রিয় ভাত**: মাত্র দেড় ফর্মায় কুড়িটি ছটফটে কবিতা লিখেছেন প্রবীর মণ্ডল। 'খিদে' বিষয়টা যারা বোঝেন, কেঁদে ফেলবেন কিছু পঙক্তিতে। দেখতে পাই এক মাথা-উঁচু মানুষ— অভাবেও যিনি কবিতার স্পর্ধা রাখেন— উৎসর্গে তিনিই লিখতে পারেন: 'যারা খিদে পেলেও/আপনার দোরে যায় না'। শঙ্কর হালদারের একটি সুন্দর অলঙ্করণ, যা বোধহয় প্রচ্ছদে থাকলেই মানাত বেশি।

▶ **খালাসিটোলা**: সম্পাদনা: বারীন ঘোষাল দেশি মদের ঠেক— ধর্ম-বর্ণ-পেশা— সব সততার গেলাস উল্টে প্রকৃত সাম্যবাদ (একসেপ্ট জেন্ডার)। না-গেলে পাওয়া যেত না'আঁতেল' মেডেল। প্রিয় তালেবর লিস্টি: ঋত্বিক ঘটক, কমলকুমার মজুমদার, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শামসের আনোয়ার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, অমিতাভ দাশগুপ্ত... সেইসব সোনালি প্রায়-ইতিহাস ধরা এই সংকলনে। নানা কথা শেয়ার করেছেন; শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, উদয়ন ঘোষ, বারীন ঘোষাল, কমল চক্রবর্তী প্রমুখ।

▶ **নিরাকৃত ভ্রাম্যমাণ তুমি**: লিখেছেন অতনু ভট্টাচার্য। 'ঠাকুমার আমলের শিলনোড়া/ঘষতে ঘষতে এতটুকু স্মৃতিচিহ্ন/আজ তাকে ধুয়ে মুছে/ঠাকুরের সিংহাসনে তুলে রাখো, মা/আমাদের পারিবারিক চিহ্ন' — খোলসের থেকেও তস্যখোলসে যখন ঢুকে যাচ্ছে প্রাত্যহিক লড়াই— এ'বই ফিরিয়ে ডাকে ফিকে হতে-থাকা প্রিয়শৈশব। প্রচ্ছদ ও নামলিপি দূর থেকে টানে না। আরেকটু ভাবলে হত।

▶ **সোনালি ডানার চিল**: নামকরণেই ধরতাই, জীবনানন্দের জীবনাশ্রয়ী এই উপন্যাস। তথ্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, ইতিহাসনিষ্ঠ। সুরঞ্জন প্রামাণিকের এই বইটি পড়ার পরে মনে হয়, তিমিরবিলাসী নন— প্রকৃত তিমিরবিনাশী। চমৎকার গদ্যভাষা। বারবার পড়বার মতো। বিশুদ্ধ নির্দেশের মতো। নিঃসঙ্গ চেতনার মতো।

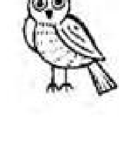

পশ্চিমবাংলায় বাংলা কাজের ভাষা হয়নি

উৎসব, সেখানে ব্যতিক্রম হয়েছে, আর ব্যতিক্রম হতেই পারে। ট্রেন্ড হল, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করে তোলা। বহু মা-বাবা এই ভয়ে প্রথম ভাষা ইংরিজি ও দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি পড়াতে শুরু করেছেন। পশ্চিমবাংলায় বাংলা কাজের ভাষা হয়নি, এটা সত্যি। আর, কাজের ভাষা না হলে নিম্নবর্গের ভাষা হয়ে যাবে ধীরে ধীরে, তাঁরাই বাঁচিয়ে রাখবেন আমাদের মায়ের ভাষাকে।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

দোলন, ভাষাশিক্ষাটা একটা স্তরের পর পছন্দের ব্যাপার। নিজ উদ্যম বা প্রয়োজনে মানুষ নতুন ভাষা শিখে নেয়। আমি ওড়িয়া ভাষায় শুধু কথা বলা শিখে গিয়েছিলাম কারণ, ভাষাটা সহজ, বাংলার বেশ কাছাকাছি এবং সেটা জানলে আমার কাজের সুবিধা হত। কিন্তু লিখতে বা পড়তে শিখিনি এবং তা নিয়ে আমার বিশেষ কোনও দুঃখ নেই। সার্ত পড়তে হলে আমাকে ফরাসি ভাষা জানতে হবে না— ইংরিজি জানলেই তো হল; আর, মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে যেটুকু ভাষা জানা দরকার, সেটা যে-কোনও মানুষ শিখে নেয় নিজের তাগিদে। আর অন্য প্রদেশে আমি যদি তিনদিনের জন্য যাই, তাহলে কি সেই তিনদিনের জন্য সেই প্রদেশের ভাষা শিখে নেব? আর, কোন ভাষা মিষ্টি বা মধুর, সেটা আপেক্ষিক ব্যাপার।

শমীক, লোকজনকে খুব প্রয়োজন না হলে 'স্যার' বলো না। দাদা না বললেও 'বাবু' বলে সম্বোধন করো না। অবশ্য তুমি আগে তার কারণ দিয়েছ, কিন্তু সেটা খুব একটা সুবিধার নয়। এটা গান নয়, কিন্তু পড়তে গিয়ে বড় চোখে লাগছে, আর কিছু নয়।

▶ শমীক ঘোষ

দুমদাম বাবার বয়সি লোককে 'দাদা' বলতে আমার আটকায়। আর 'বাবু' শব্দটা আমার একটুও ভালো লাগে না। কেমন টাক মাথা, খ্যাঁৎটা পাঞ্জাবি পরে বাজার করতে যাচ্ছে মনে হয়। আমি 'মশাই' বলি। তবে স্যার মানেও মহাশয়।

কিন্তু আমাদের দেশে তার একটা অন্য মানে হয়ে যায় যেটা আমার পছন্দ নয়। আমাকে আমার অফিসেও কেউ স্যার বললে আমি আপত্তি করি। তবে দ্যাখো, তিনদিনের জন্য কেউ আমেরিকা থেকে এলে, সেও মুম্বই, দিল্লিতে দেবনাগরী সংখ্যায় হিন্দি দেখে বাসে উঠতে পারবে না। আমি নিজেই পারি না!

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকা থেকে এসে কেউ বাসে ওঠে না সাধারণত। তবে হ্যাঁ, আইডিয়ালি, এয়ারপোর্ট বা ইন্টারস্টেট বাসস্ট্যান্ডে ইংরিজিতে অন্তত নির্দেশনাটুকু লেখা থাকা উচিত। আর বাইরের দেশ থেকে যে সব পর্যটক আসেন কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, তিনি একটি অভিধান নিয়ে আসেন। যেহেতু আমাদের কোনও একক ভাষা নেই, তাই তাকে মুম্বই যেতে হলে জার্মান বা ফ্রেঞ্চ থেকে মারাঠি ইত্যাদি অভিধান কিনতে হবে যা কিনা বেশ দুষ্প্রাপ্য। সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়তো করা যায় না, কিন্তু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরির কথা বলছিলাম। আর হিন্দি পড়ে আমরা যদি বাসে উঠতে না পারি, সেটা বেশ লজ্জার। সে আমরা বাঙালি হলেও লজ্জার, দক্ষিণ ভারতীয় হলেও লজ্জার... কাশ্মীরি হলে লজ্জার নয় অবশ্যই।

▶ শমীক ঘোষ

হিন্দি না জানা লজ্জার কেন হবে? কলকাতায় থেকে বড় হওয়া, ব্যবসা করা ক'জন মারোয়াড়ি বাংলা পড়তে পারে?

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

এখানে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে যারা মন্তব্য করছে তারা এই বিষয় নিয়ে ভাবে বা ভাবতে ইচ্ছুক। যে-কোনও 'নেশন স্টেট'-এর নাগরিকের একটি কমন ভাষা জানা দরকার বলে আমি মনে করি। এটা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তাই হিন্দি না পড়তে পারা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে একটু লজ্জাজনক।

▶ শমীক ঘোষ

তুমি ব্যক্তিগতভাবে কী মনে করো, তা নিয়ে বোধহয় কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান কী বলে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যখন রাজি হওয়া হয়েছিল, তখন কী বলতো। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোও যে চিরায়ত, এমন নয়। বিশেষ করে ভাষা-রাজনীতির কারণেও তাতে চিড় ধরতে পারে। বাঙালি এক কালে ব্যবসা করত। পরে ব্যবসা ব্যাপারটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। মারোয়াড়িরা কলকাতায় যখন ব্যবসা শুরু করে তখন এমন সব ব্যবসা করত যেটা বাঙালিরা নাক উঁচু করে করত না। সমস্যা হল, অর্থনীতিটাই পুঁজিবাদী, তাই পুঁজি আছে যাদের তারাই শাসক। আর আমরা বাঙালিরা বেওসা-বেওসা করে এখন তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী, নয়তো তোমার আমার মতো অতিদূরে পর্যবসিত। প্রবাসী বাঙালিদের বিশেষত হিন্দির আধিপত্য মেনে নেওয়ার কারণ আছে, খুব অর্থনৈতিক একটা কারণ।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

গোটা আলোচনাটাই তো শুরু হয়েছিল কবির সুমনের লেখা দিয়ে। সেটা তো ওনার মন্তব্য বা এক্সপ্রেশন। সেখানে এই দেশের সংবিধান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আসলে তো সবাই নিজের মতামতটাই প্রকাশ করছিল। বাঙালির হীনম্মন্যতার কথা কি সংবিধানে লেখা ছিল নাকি?

দোলনচাঁপা চক্রবর্তী সংকলিত

কাজের বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

হাতে একটা কোদাল ধরিয়ে দিয়ে এডিটর হাওয়া।

এদিকে পায়ের নীচে জমি খুঁজে পাচ্ছি না যে চাষ করব।

মেঘে মেঘে স্বাধীনতার বেলা কম হল না। অথচ মুখের কথা আজও মুখেই থেকে গেল। দু-দশ বছর বাদে বাদে টনক নড়ে। ফতোয়া জারি হয়। তারপর আবার যে কে সেই। নতুন নতুন ফাইলের তলায় সব চাপা পড়ে যায়।

কেন আমরা কথা রাখতে পারছি না? নিজেদের বুকে হাত রাখলেই আমরা তা টের পাব।

যারা ইংরিজিনবিশ, কাজের ভাষা বাংলা না হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। ইংরিজি-না-জানা লোকদের পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এরাই হল রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এদেরই ভোটে একদল লোক ক্ষমতা হাতে পায়। আজও মধ্যস্বত্বভোগীদেরই পোয়াবারো।

শাসকদের মনের কোঠায় এই ইংরিজি না-জানা মানুষেরা ঠাঁই পায় না। ফলে, পরভাষাকে আপন করে বহালতবিয়তে দিন চলে যায়। আর এই ভাষার জন্যই ঘরের মানুষকে হতে হয় পরের দোর-ধরা। এমনকি সাক্ষরতার হার বাড়লেও অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় না।

কথা দিয়েও কথা না রাখার জন্য দেখা যায় না ওপরওয়ালাদের মধ্যে কোনও অপরাধবোধ।

ওপরকার নিভে-যাওয়া এই আঁচটাকে নীচে থেকে খুঁচিয়ে গনগনে করার কাজটাকেই বোধহয় হাতে নিয়েছে 'কর্মক্ষেত্র'।

এদিকে ডাঙায় দাঁড়ানো আমাকে আচমকা ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছেন সম্পাদক। হয়তো এই ভেবে যে, সাঁতার শেখার এটাই একমাত্র উপায়।

জলে ভেসে থাকার দায়ে পরিত্রাহি হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বলা কথাগুলো আমি যতদূর পারি মনে রাখার চেষ্টা করব:

'... আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব। পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।...'

অনেক মাথা যাতে এক করা যায়, তার জন্য পাতায় এটা হবে বটতলার একটা খোলা আসর। যে কারও মুখ খুলতে এখানে বাধা নেই। সরকারি কাজে বাংলা ভাষার সহজ আর স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ— এটাই হবে এই দপ্তরের উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞ পাঠকেরা সাগ্রহে এতে যোগ দিলে তবেই আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

এ কাজে কিছু কিছু পরিভাষারও দরকার হবে।

দেশি আর বিদেশি তৎসম আর তদ্ভব শব্দের ভাঁড়ার থেকে অনেক কিছুই আমরা পেয়ে যাব। দেখতে হবে যেন তা আমাদের মুখে মানিয়ে যায়।

পরাধীন আমলের যে আত্মবিস্মৃতিতে আজও আমরা ভুগছি, তা না কাটালেই নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য বিপুল। সেই বনেদি সিন্দুক থেকে বার করে এনে অনেক শব্দই আমরা নতুন করে ঝালিয়ে নিতে পারি। কখনও তৎসম, কখনও তদ্ভব রূপে। বিদেশি শব্দের আত্মীকরণও হবে এই একই প্রক্রিয়ায়।

কেতাবি শব্দের বাইরেও হাটে-বাজারে কারিগর আর ব্যাপারীদের অজস্র আটপৌরে শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে— এ কাজে যা আমাদের সম্পদ হতে পারে।

পাঠকদের কাছে করজোড়ে আবেদন, যেন তাঁরা পারলে এইসব শব্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের এই আসরে পেশ করেন।

অলমতিবিস্তরেণ।

'কাজের বাংলা'র এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য হবে কাজের কথা বলতে শেখা। দ্ব্যর্থকতা এড়িয়ে সরল ভাষায় মনের ভাব সরাসরি পৌঁছে দেওয়া। প্রশাসন আর প্রজার মধ্যে সেতু বাঁধতে পারে কেবল মাতৃভাষা। নইলে মোরা রাজার সনে মিলব কী শর্তে।

বহু ভাষাভাষীর দেশ আমাদের এই ভারত। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পার হয়েও জাতীয়স্তরে আজও কোনও সুস্পষ্ট ভাষানীতি তৈরি হয়নি।

এর ফলে, শুধু গণতন্ত্র নয়, মানবাধিকারও যে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও মহলে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় বা অন্য রাজ্যের সরকারের কাছে কেন আমি মাতৃভাষায় আমার কোনও বক্তব্য জানাতে পারব না?

কেন্দ্রে কেন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের একটি আলাদা দপ্তর থাকবে না? রাজ্যস্তরেই বা থাকবে না কেন?

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের এবং সেইসঙ্গে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগসূত্রকে জোরালো করে তুলতে অবিলম্বে অনুবাদকদের নিয়ে আলাদা একটি সার্ভিস গড়ে তোলা হোক।

মাছিমারা কেরানি কমিয়ে নতুন সহস্রাব্দে মস্তিষ্কবান অনুবাদক বাহিনী দলে ভারী হোক।

ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। আমার অবস্থা হয়েছে এখন তাই।

কাঁহাতক আর একা একা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলা যায়?

আন্দাজে ঢিল মেরে চলেছি। কারও গায়ে লাগলে নিঃসন্দেহে টের পেতাম। ভয় পাচ্ছি, আসর ফাঁকা নয় তো?

সম্পাদক অবশ্য হাল ছাড়তে নারাজ। বলছেন, সবুরে মেওয়া ফলে। নিজে কর্মবীর, তাই যার ঢাল-নেই তরোয়াল-নেই, তাকে এ কথা বলার তাঁর হক আছে।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন প্রথম কায়রোয় যাই, মিশরের প্রেসিডেন্ট তখন নাসের। ফরাসিদের সরিয়ে দিয়ে মিশরীরা সে সময়ে স্বহস্তে সুয়েজ খালের ভার নিয়েছে। পশ্চিমের সাহেবরা শোরগোল তুলল— দেশোয়ালিদের হাতে পড়ে এবার সুয়েজের দফা রফা হবে। সাহেবদের টেক্কা দিয়ে মিশর সেদিন মুখের মতো জবাব দিয়েছিল। সেইসঙ্গে খুলে ফেলেছিল বিদেশি ভাষার শেকল।

নাসেরের মন্ত্রিসভায় যাঁর ওপর দেশিভাষা প্রবর্তনের ভার পড়েছিল, তিনি ছিলেন আরবি ভাষার একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক। ওঁর স্ত্রী ছিলেন সেবারের আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে আমাদের ভারতীয় দলের দোভাষী। সেই সূত্রে ওঁদের বাড়িতে খেতে গিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে শিক্ষা আর কাজের ক্ষেত্রে ভাষান্তর প্রসঙ্গে কিছু সমস্যার কথা জেনেছিলাম।

উনি বলেছিলেন: ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের হতে হবে স্বনির্ভর। দরকার মতো বিদেশি শব্দ নেব। কিন্তু আরবি ভাষার স্বভাবের সঙ্গে যাতে তা খাপ খায় এমনভাবে। অনুবাদের ভাষা হলে চলবে না। ওপরতলার কিছু লোকের মধ্যে আছে ফরাসি ভাষাকে বড় বেশি মাথায় তোলার ভাব। এই হীনম্মন্যতা দূর করতে হবে।

স্বাধীন হওয়ার পর ভিয়েতনামেরও ছিল এই একই সমস্যা। ফরাসি ভাষার বন্ধনদশা থেকে নিজেদের মাতৃভাষাকে মুক্ত করা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মাথায় রাখা ভালো। লিপি আর ভাষার মধ্যে সম্পর্কটা হল পাতানো। লিপি হল ধ্বনির রেখাচিত্র।

ইংরিজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, রোমানি, স্প্যানিশ— ভাষা আলাদা হলেও এদের লিপি এক। আবার আলাদা জাতের ভাষা হয়েও এই রোমান লিপিকেই নিজের করে নিয়েছে তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম।

অক্ষর এক হলেও, একেক ভাষায় তার উচ্চারণের ধরণ আলাদা। সেসব ভাষা পড়তে গেলে কেবল অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হয় না। ভাষাজ্ঞানের দরকার হয়। অসমিয়া, বাংলা, মৈথিলি, মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়ার লিপি এক হলেও উচ্চারণগত পার্থক্য আছে।

লিপির সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটা পাতানো হলেও এক সময়ে দুটো প্রায় একাত্ম হয়ে ওঠে।

দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানিরা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দুকে রাজভাষা করতে। না পেরে শেষ পর্যন্ত উর্দু হরফে বাংলা লেখার বায়না ধরে। তাদের সে সাধে বাধ সেধেছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদ। ভাষার হাত ধরে জান কবুল করে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ।

অন্যদিকে, বাংলা ভাষাকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদল বাঙালি মনীষী রোমান হরফে বাংলা লেখার রব তুলেছিলেন। লিপির প্রতি মমত্ববোধের দরুন বাঙালি সে ডাকে সাড়া দেয়নি। আবেগের কাছে যুক্তি টেকেনি।

'ফর অবভিয়াস রিজনস', 'ফ্রেট ইকোয়ালাইজেশন', 'পারটিকুলারলি আফটার নাইনটি ফোর', 'আফটার অ্যানাউন্সমেন্ট অব আওয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি', 'আইটিতে হিউম্যান রিসোর্স', 'ব্রেক থ্রু', 'এগ্রিকালচার প্রোডাকশনে গ্রোথ রেট', 'প্রোডাক্টিভিটি হাইয়েস্ট', 'অ্যাগ্রো-বেস্‌ড ইন্ডাস্ট্রিতে', 'ডাউন স্ট্রিমে', 'ইস্টার্ন জোনে', 'বিগেস্ট', 'বেনিফিট', 'লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট', 'নলেজ ইন্ডাস্ট্রি', 'রিয়েল চ্যালেঞ্জ', 'টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির ইন্ডাস্ট্রি', 'পশ্চিমবঙ্গের ইমেজটাকে', 'বাট উই আর অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি গভর্নমেন্ট', 'নট ওনলি ইন আওয়ার স্পিচেস, বাট অন প্র্যাক্টিস', 'প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার', 'অ্যাকচুয়ালি', 'নরম্যাল', 'সেকেন্ড পয়েন্ট', 'পারটিকুলার প্রবলেম', 'টোটাল আনসারটেইনিটি', 'নাউ উই এনকারেজ', 'সেভেন্টি পারসেন্ট অব দি পিপলস', 'অ্যাসিওর', 'ইনোসেন্ট পিপলের ওপর অ্যান্ড দেওয়ার প্রপার্টি', 'তখন ইট মাস্ট অ্যাক্ট', 'উই মাস্ট স্টপ অল দিজ', 'পলিটিক্যাল ডায়ালগ ওপ্‌ন করার'...।

বাংলা বলতে গিয়ে যাঁর মুখ ফসকে এই ইংরিজি কথাগুলো বেরিয়েছে, তিনি হেঁজিপেঁজি লোক নন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)। বাংলা ভাষায় তাঁর দখল অবিসংবাদিত।

'প্রতিদিন'-সম্পাদক অঞ্জন বসুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলো এসেছে। দুজন বাঙালি এক হলে এইভাবেই আমরা ইংরিজি মিশিয়ে ঘরোয়া বাংলা বলে থাকি। কিন্তু নিজের খাসকামরায় বসে বললেও কাগজে তা যে হাটখোলা হয়ে বেরবে, মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় বলবার সময় তা মনে রাখেননি। নইলে তিনি কখনই 'বিগেস্ট' 'বেনিফিট' 'অ্যাকচুয়ালি' 'নরম্যাল' শব্দগুলো অনর্থক ব্যবহার করতেন না।

চালুনি আবার ছুঁচের বিচার করে! এই বলে কেউ যদি এক্ষেত্রে আমাকে কড়কায়, আমার ঘাট না মেনে উপায় নেই। কেননা ওপরে উদ্ধৃত অনেক ইংরিজি কথার যুতসই বাংলা আমার জানা নেই।

যেমন, 'চ্যালেঞ্জ'। এর মধ্যে আছে নিজেকে প্রমাণ করার ব্যাপার। পাঞ্জা কষা। টক্কর দেওয়া। অগ্নি পরীক্ষা। কিংবা শব্দটাকে দত্তক নিতেই বা দোষ কী? ' ব্রেক-থ্রু'। কেটে বেরতে পারা। মুক্তির উপায়। গতি। হিল্লে।

'হিউম্যান রিসোর্স'। মানব সম্পদ। লোকবল বা কাজের লোক বলা যায় না? 'ডাউন-স্ট্রিম'। 'ধারাবাহিক' হতে পারে কি? 'নলেজ ইন্ডাস্ট্রি'। মাথা খাটানো শিল্প হয় কি? নিশ্চয় 'জ্ঞান-কাণ্ড কারখানা' নয়?

ছেলেবেলার কানামাছি খেলায় কাউকে ছুঁতে না পারলে যে অবস্থা হত, বুড়ো বয়সে চণ্ডীমণ্ডপের আসরে বসে আমার এখন সেই দশা।

আবার, নাচতে নেমে উঠোনের দোষ দিয়ে যাতে আমি সরে পড়তে না পারি, সেদিকে 'কর্মক্ষেত্র'র কড়া নজর।

আমাকে বলভরসা দেওয়ার জন্য সম্পাদক মশাই একটি বই আর একটি পত্রিকা পাঠিয়েছেন। বই বলতে ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত 'প্রশাসনিক পরিভাষা'। সেইসঙ্গে দেবাশিস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রতর্ক'— প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা।

সুপরিকল্পিত বিষয় আর যোগ্য লেখক নির্বাচনে সম্পাদক যে শ্রম আর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা এ যুগে বিরল।

পঞ্চাশ বছরের ওপর কেবলই একটা না একটা ওজর দেখিয়ে এ রাজ্যের কর্মক্ষেত্রে বাংলাকে বড় একটা কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

পরিভাষার অভাব নাকি এর কারণ। 'প্রতর্কে' এর মুখের মতো জবাব দিয়ে সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: '...'৬৪ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত আমি বাংলায় কাজ করেছি। আমার কিন্তু কখনও পরিভাষার বই লাগেনি। আমি যখন বাংলায় চিঠি লিখেছি, ফাইলে মন্তব্য লিখেছি, আমার ওপরের কোনও আধিকারিকের নির্দেশ চেয়েছি, পুরোটাই আমি করেছি আমার নিজস্ব বাংলায়। ইংরিজি লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি কখনও বাংলা লিখিনি।...'

সনৎকুমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কোথায় রয়েছে আসল নষ্টের গোড়া।

ইংরিজিকে সামনে রেখে তার পায়ে পায়ে চলতে চাওয়াই হয়েছে আমাদের কাল। ফলে, পায়ে পা বেঁধে ক্রমাগত হোঁচট খেয়ে ছেড়ে দে-মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়েছে।

কেন ইংরিজির ভূত আজও আমাদের ঘাড়ে ভর করে থাকবে? আর অনর্থক গুচ্ছের পরিভাষার ভূতের বেগার খাটার কোনও মানে হয়?

এরপর বেশকিছু পরিভাষা ঝেড়ে বেছে দেখব, সোজাসুজি তা সরল বাংলায় বলা যায় কিনা।

সেইসঙ্গে মাঝেমধ্যে কথায় কথায় এসে যাবে বাংলা ভাষার নিজস্ব কিছু ধরণধারণ আর বোলচালের প্রসঙ্গ।

এরপর আগামী সংখ্যায়

'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

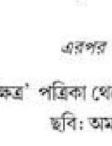

বই পড়া

নরওয়েজিয়ান উড
হারুকি মুরাকামি

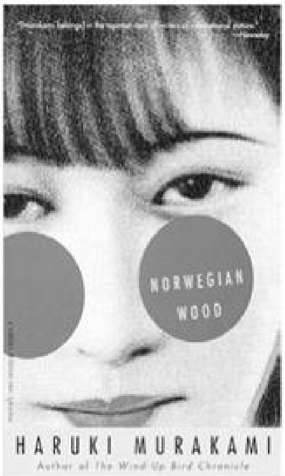

'নরওয়েজিয়ান উড' প্রকাশ পাওয়ামাত্রই মুরাকামি জাপানে প্রভূত জনপ্রিয় এবং একই সঙ্গে বিতর্কিত লেখক হিসাবে পরিচিতি পেয়ে যান।

জাপানের তরুণ প্রজন্মের যে লেখকেরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হারুকি মুরাকামি। ১৯৮৭তে বেরয় তাঁর উপন্যাস 'নোরুউই নো মোরি', ইংরিজি তর্জমায় 'নরওয়েজিয়ান উড'। প্রসঙ্গত, একসময় দুনিয়া কাঁপানো মার্কিন গায়নদল বিটলস-এর খুব জনপ্রিয় একটি গান নরওয়েজিয়ান উড (দিস বার্ড হ্যাজ ফ্লোন)। গানটির কথা লিখেছিলেন জন লেনন এবং পল ম্যাকার্টনি। উপন্যাসের মেজাজের সঙ্গে শিরোনামে গানটির সরাসরি উল্লেখ মানিয়ে যায় এই কারণেই যে, এই উপন্যাসের কথক তথা মূল চরিত্র ৩৭ বছরের টোরু ওয়াটানাবি জার্মানির হামবুর্গে বিটলস-এর এই গানটি শুনে মনে মনে ফিরে যাচ্ছে ষাটের দশকে জাপানে তাঁর ছাত্রজীবনের দিনগুলিতে। যে সময়টা গোটা বিশ্বজুড়েই একধরনের বন্ধনমুক্তির ভাবনায় জারিত। নারীমুক্তি, ছাত্রআন্দোলন, যৌনচেতনা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম—এই সব কিছু মিলিয়ে তপ্ত। 'নরওয়েজিয়ান উড' প্রকাশ পাওয়ামাত্রই মুরাকামি জাপানে প্রভূত জনপ্রিয় এবং একই সঙ্গে বিতর্কিত লেখক হিসাবে পরিচিতি পেয়ে যান। অথচ, এই উপন্যাসের প্রথম অংশের অনেকটাই মুরাকামির নিজেরই লেখা ছোটগল্প 'ফায়ারফ্লাই' থেকে নেওয়া। বিতর্কিত এই কারণে যে, এই উপন্যাসে মুরাকামি অবাধ যৌনাচার এবং সমকামিতার বর্ণনা দিয়েছেন।

হামবুর্গে বিটলস-এর গান শুনে টোরুর স্মৃতির ওপর থেকে পর্দা সরার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। টোকিওর আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমেটরিতে নানা ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে টোরু এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতে থাকে। কিন্তু আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম হয়, এখানেও সেভাবেই ধীরে ধীরে টোরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জগৎ সীমিত হয়ে আসে। টোরু, তার সহপাঠী কিজুকি এবং কিজুকির বান্ধবী নাওকোকে নিয়ে একটা ছোট অথচ ঘনিষ্ঠ বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কিজুকি এবং নাওকোর মধ্যে গভীর প্রেম। তাদের প্রেমে টোরুর ভূমিকা অনুঘটকের। এবং আপাতভাবে তার সেই আদর্শায়িত অবস্থানেই সে তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট।

কিন্তু এই সুখী সময়টা হঠাৎই থমকে যায় কিজুকি আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ায়। যেদিন সে সতেরো বছরে পা দিল সেদিনই, 'মরিবার হল তার সাধ'।

একটা গভীর শূন্যতা যেন ভারী কালো মেঘের মতো চেপে বসল অবশিষ্ট দুই বন্ধুর মনের ওপর। টোরু সর্বত্র মৃত্যুর ছায়া দেখতে পায়। নাওকো মনে করে, কিজুকি ছিল তার একটা অঙ্গের মতোই, ফলে তার অঙ্গহানি ঘটেছে। এদিকে কলেজে একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে পরিবেশ অশান্ত। হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিপ্লব ত্বরান্বিত করার অদ্ভুত আবেগে ছাত্রসমাজ যেন ফুটছে। অন্যদিকে কিজুকির মৃত্যুর পর অশান্ত মন আর কৃষ্ণপক্ষের আকাশের মতো গভীর শূন্যতাবোধ টোরু এবং নাওকোকে যেন একে অপরের দিকে টানছে। একসময় তারা বুঝতে পারে তারা পরস্পরের প্রেমে পড়েছে। নাওকোর কুড়িতম জন্মদিনের রাতে তারা শারীরিকভাবে মিলিত হয়। যদিও এরপরই একদিন নাওকো ডরমেটরি ছেড়ে চলে যায়। টোরুর জন্য রেখে যায় একটি চিঠি, যার মূল বক্তব্য, টোরুর থেকে আলাদা হয়ে জীবন সম্পর্কে আরও গভীরে গিয়ে ভাবার জন্য কিছুটা সময় তার প্রয়োজন। তাই সে কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে স্যানাটোরিয়ামের নিভৃতিতে।

ছাত্র আন্দোলনের যে ঢেউটা কদিন সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তাও স্তিমিত হয়ে আসে। একটা সময়

ট্রান আন হুং পরিচালিত 'নরওয়েজিয়ান উড' ছবির একটি দৃশ্য। ছবিটি জাপানে মুক্তি পায় ২০১০-এর ডিসেম্বরে।

নাওকোকে আঘাত দিতে চায় না টোরু, আবার হারাতে চায় না মিডোরিকেও। কিন্তু কোনও বিন্দুতে সে স্থিত হতে পারছে না, এই যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

অবস্থা এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গেল, যে মনে হয় কোনওদিন কোনও তরঙ্গই ওঠেনি। এইসময়ই মিডোরি কোবায়াসি নামে এক সহপাঠিনীর সঙ্গে আলাপ হয় তার। নাওকোর দমিত চরিত্রের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। সে সদা উন্মুখ, বহির্মুখী, আদ্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। নাওকোর প্রতি ভালোবাসায় কোনও খাদ না থাকলেও মিডোরি যেন তার উচ্ছলতার জালে জড়িয়ে ফেলতে থাকে টোরুকে।

তার মধ্যেই অবশ্য কিওটো শহরসংলগ্ন জনমানবহীন এলাকার স্যানাটোরিয়ামে দিন কাটানো নাওকোর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করে এসেছে টোরু। সেখানে নাওকোর রুমমেট রেইকো ইশিদা নামের এক তরুণী। তার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে।
এই রেইকোই পরে অন্য ভূমিকায় ফিরে আসে টোরুর জীবনে। স্যানাটোরিয়াম থেকে টোকিওয় ফিরে টোরুর মন জুড়ে থাকে শুধু নাওকো। মিডোরিকে ক্রমে তার অসহ্য মনে হতে থাকে। রেইকোকে চিঠি লেখে টোরু। নাওকো এবং মিডোরির প্রতি তার দ্বিধাবিভক্ত প্রেমের চঞ্চলতা থেকে পরিত্রাণের জন্য রেইকোর পরামর্শ চায় সে। নাওকোকে আঘাত দিতে চায় না টোরু, আবার হারাতে চায় না মিডোরিকেও। কিন্তু কোনও বিন্দুতে সে স্থিত হতে পারছে না, এই যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। পাল্টা চিঠিতে রেইকো লেখে, যে সুখের সন্ধান টোরু করে বেড়াচ্ছে তাকে নিজের করে পাওয়ার কোনও সুযোগই ছাড়া উচিত নয়। মিডোরির সঙ্গে তার সম্পর্ককে পূর্ণতা দেওয়ার কথাই সর্বাগ্রে ভাবা উচিত।

কয়েকদিন পরে একটি চিঠিতে টোরু জানতে পারে, নাওকোও আত্মহত্যা করেছে। ভাঙা মন নিয়ে জাপানের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়ায় টোরু। বহুকাল সে মিডোরির সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ করেনি। তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আজ সেই মিডোরিও তার খোঁজ পেতে মরিয়া, আকুল। প্রায় একমাস কেটে যায়। টোরু টোকিওয় ফিরে আসে।

স্যানাটোরিয়ামে নাওকোর রুমমেট রেইকোর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। টোরুর কথায় স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে টোকিওয় চলে আসে মধ্যবয়সিনী রেইকো। টোরুর সঙ্গে থাকতে শুরু করে। কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে তারা পরস্পরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কেও লিপ্ত হয়। কিন্তু সেই রাতে মিলনের অভিজ্ঞতা আর পারস্পরিক অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে টোরুর ভাবজগতে রূপান্তর ঘটে যায় যেন। টোরু উপলব্ধি করে, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির নাম মিডোরি।

অনেকদিন পর টেলিফোনে টোরুর গলা শুনে একই সঙ্গে বিহ্বল আর খুশি হয়ে ওঠে মিডোরি। তাকে অবাক করে সদ্য প্রেমে পড়া কিশোরের মতো টোরুর উদ্বেল প্রেম নিবেদন। উপন্যাসটি এখানেই শেষ। অর্থাৎ উপসংহারে যেমন জানা যায় না টোরুর প্রেম নিবেদনে শেষপর্যন্ত সাড়া দিল কিনা মিডোরি, তেমনই মুরাকামি একটা আশাকেও প্রজ্জ্বলিত রেখে দেন।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

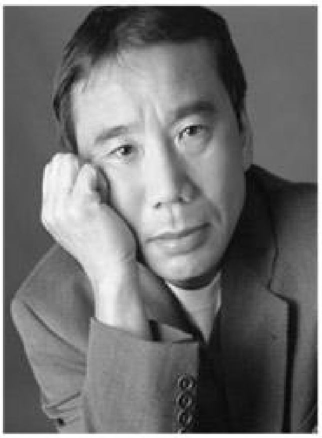

হারুকি মুরাকামি

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা। ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য। ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ। ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ**
দাম ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই
কাজের বাংলা
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
যাঁরা সরকারি চাকরি করছেন বা সরকারি চাকরির জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁদের সকলের জন্যই কিংবদন্তি কবির লেখা এই বই। ₹৩০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই
তুতুল ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি। ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই। ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই। ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন। ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

প্রাপ্তিস্থান: দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

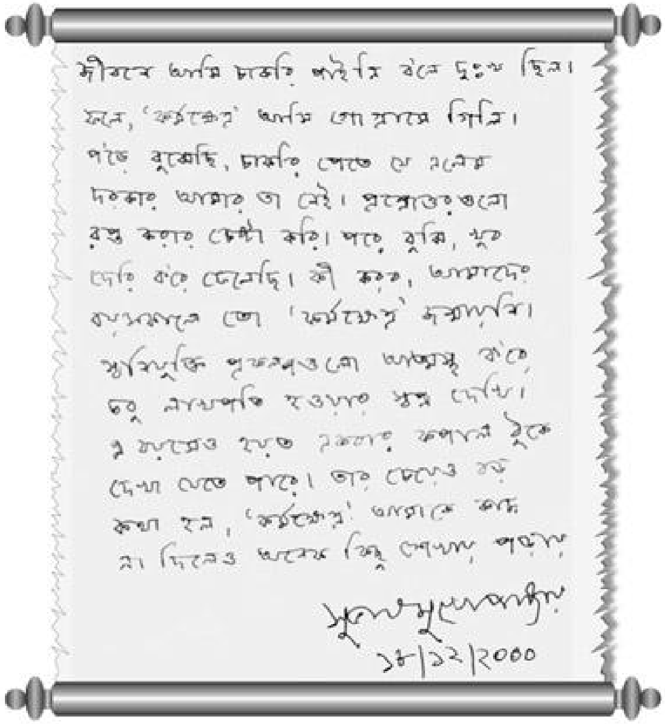

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়ত একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১৮/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র : www.ekarmakshetra.com

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে উপেক্ষিত। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে সগৌরবে যাচাই হওয়া এই চিরস্মরণীয় সাহিত্যিকের সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য— **সম্পাদক**

উপেন্দ্রকিশোর

প্রসাদরঞ্জন রায়

মানুষটি আমার নিকট আত্মীয়, আমার বাবার জ্যাঠামশাই। ছোটবেলা থেকে তাঁর লেখা 'টুনটুনির বই' ও 'ছোট্ট রামায়ণ' পড়ে বড় হয়েছি, তাঁর সম্বন্ধে অজস্র গল্প শুনেছি বাবা ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছে। কিন্তু তিনি মারা যান ১৯১৫ সালে, আমার বাবাও তখন বালকমাত্র। সুতরাং অপরিচয়ের একটা বাধা ছিলই। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন আমার মেজপিসি লীলা মজুমদার, যা তাঁর জন্মশতবর্ষে ১৯৬৩ সালে প্রকাশ পায়। তারপর আরও দুটি জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইয়ে এবং হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প' বইতে। তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন আমার প্রয়াত বন্ধু সিদ্ধার্থ (অমিতাভ ঘোষ)। এগুলিকে ভিত্তি করেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য এখানে পরিবেশনের চেষ্টা করেছি।

জন্মসূত্রে তাঁর নাম উপেন্দ্রকিশোর নয়, পদবিও রায়চৌধুরী নয়— জন্মদাতা পিতা তাঁর নাম দেন কামদারঞ্জন রায়। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ মে বলা হয়, কিন্তু তাও সঠিক বলে মনে হয় না—তিনি জন্মেছিলেন ১২৭০ সনের ২৮ বৈশাখ। তারিখটি ১০ মে বলেই মনে হয়, যদিও তাঁর জন্মদিন ১২ মে পালন করা হয় আজকাল। তাঁদের পরিবারের আদি কৌলিক পদবিও রায় নয়, দেব। ৪০০ বছরেরও বেশি আগে এই পরিবার চাকদা অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে ময়মনসিংহে পাড়ি দেন— শেরপুর, এগারোসিন্দুর ঘুরে তাঁরা ব্রহ্মপুত্র নদের আদি খাতের ধারে মসুয়া গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। গ্রামটির আদি নাম ছিল খুচুরপাড়া, এই পরিবারের রামনারায়ণের সম্মানার্থে 'মউস্যা' (মেসোমশাই) কথার থেকেই এই নামের সৃষ্টি। কালক্রমে এই দেব পরিবারের অনেকে মজুমদার, খাসনবিশ, রায় ও রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। উপেন্দ্রকিশোরের পিতা কালীনাথ রায় ছিলেন সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁকে 'শ্যামসুন্দর মুন্সী' নামে ডাকা হত। তাঁর ছিল পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। অন্যদিকে, তাঁর প্রতিবেশী ও জাতিভাই হরিকিশোর রায়চৌধুরী বিশাল ধনসম্পত্তির মালিক হলেও অপুত্রক ছিলেন। তিনি কালীনাথের দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জনকে দত্তক নিয়ে তাঁর নামকরণ করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সম্ভবত এ ১৮৬৮ সালের কথা। অবশ্য পরবর্তীকালে উপেন্দ্রকিশোর 'চৌধুরী' খেতাবটি আর ব্যবহার করেননি। তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন ইউ রায় নামে। অবশ্য তাঁর বিখ্যাত শিশুসাহিত্য গ্রন্থগুলিতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নামই ব্যবহৃত হয়।

তাঁকে দত্তক নেওয়ার দু'বছর বাদে কিন্তু তাঁর পালক-পিতা হরিকিশোরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর একটি ছেলে হয়, নাম নরেন্দ্রকিশোর। এতে অবশ্য উপেন্দ্রকিশোরের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। নরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁর পরম সৌহার্দ্য ছিল। আবার পাশেই কালীনাথ বাস করতেন ও দুই পরিবারে খুবই হৃদ্যতা ছিল। ফলে তাঁর সহোদর ভাই-বোনেদের সঙ্গও তিনি উপভোগ করতেন। তাঁর সহোদর ভাইরাও— সারদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। দুই পরিবারের যত্নে ও ভালোবাসায় উপেন্দ্রকিশোর বড় হয়ে ওঠেন।

গ্রামের পাঠশালা ও মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ করে উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়তে আসেন। ভালো ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ততোধিক দক্ষ ছিলেন ছবি আঁকা, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগে। একবার স্কুলে বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন পরিদর্শনে আসেন। উপেন্দ্রকিশোর চটপট তাঁর একটি পেনসিল স্কেচ আঁকার সময় তাঁর নজরে পড়ে যান। মাস্টারমশাইরা ভয়ে তটস্থ, কিন্তু ইডেন তাঁর পিঠ

ছোটবেলা থেকে তাঁর লেখা 'টুনটুনির বই' ও 'ছোট্ট রামায়ণ' পড়ে বড় হয়েছি, তাঁর সম্বন্ধে অজস্র গল্প শুনেছি বাবা ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছে।

চাপড়িয়ে বলেন, ছবি আঁকা না ছাড়তে। বন্ধু গগনচন্দ্র হোমের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্ত হন, শিক্ষকরাও কেউ কেউ ব্রাহ্ম ছিলেন। হরিকিশোর গোঁড়া হিন্দু, এসব পছন্দ করতেন না, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্ম বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করেননি। এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগে বাঁশি বাজিয়ে উপেন্দ্রকিশোর অনেক সময় কাটাচ্ছেন, ফল ভালো হবে না ভেবে হেডমাস্টারমশাই তাঁকে তিরস্কার করেন। অনুতপ্ত উপেন্দ্রকিশোর বাঁশি ভেঙে ফেলে পড়াশুনোয় মন দেন এবং বৃত্তি সহ ভালোভাবে প্রথম শ্রেণীতে এন্ট্রান্স পাশ করেন।

স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতায় পড়তে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ এ পড়তে ভর্তি হন। তারপরে মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে ১৮৮৪ সালে বি এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল গাঢ়। কলকাতায় তিনি প্রথম বাস করতেন ৮নং রত্ন সরকার লেনে ময়মনসিংহের মেস বাড়িতে। পরে উঠে আসেন ৫০নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। ইতিমধ্যে তাঁর ওপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আরও প্রগাঢ় হয়ে দাঁড়ায়। এই ৫০নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িকে বলা হত 'ব্রাহ্মকেল্লা'। গগনচন্দ্র হোম তাঁর জীবনস্মৃতি বইতে লিখেছেন, ''৫০নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলে একত্রিত হইলাম। উপেন্দ্রকিশোর, হেমেন্দ্রমোহন বসু, মথুরানাথ নন্দী, কালীপ্রসন্ন দাস এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী যুবক সেখানে জুটিলেন। স্বর্গীয় মধুসূদন সেন মহাশয়ও কিছুকাল এখানে আমাদের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন; ৫০নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট শীঘ্রই এক ব্রাহ্মকেল্লা হইয়া উঠিল: এখানে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় আমাদের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।''

প্রথম যৌবনের এই 'ব্রাহ্মকেল্লা' উপেন্দ্রকিশোরের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রমদাচরণ সেনের প্রভাবে তিনি প্রথম শিশুসাহিত্যে আকৃষ্ট হন। গগনচন্দ্র হোমের বন্ধুত্ব ও প্রভাব তো কার্যকর ছিলই। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তখনকার দিনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। মহিলাদের উন্নতির জন্য তিনি 'অবলাবান্ধব' নামে একটি পত্রিকা চালাতেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মূলত তাঁর প্রভাবেই উপেন্দ্রকিশোর ১৮৮৪ সালে বি এ পাশ করেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথের কন্যা বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে তাঁর ছোট বোনের বিবাহ হয়। এদিকে হরিকিশোর ছিলেন ময়মনসিংহের হিন্দুসমাজের নেতা। উপেন্দ্রকিশোরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার খবর তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পালক পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিছুটা শিথিল হয়ে আসে। কালীনাথের মৃত্যুর পর প্রথাগত হিন্দুমতে শ্রাদ্ধশান্তির কাজও তিনি করেননি, ব্রাহ্মমতেই তাঁর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। শোনা যায়, এজন্য হরিকিশোরের উইলে তিনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন, যদিও পরবর্তীকালে রাজলক্ষ্মী দেবীর ইচ্ছা অনুযায়ী উপেন্দ্রকিশোর ও নরেন্দ্রকিশোরের মধ্যে সম্পত্তি বন্টিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর মসুয়া ও ময়মনসিংহের বাড়ি ও মসুয়ার নিকটবর্তী সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নরেন্দ্রকিশোরকে রাখতে বলেন এবং নিজে শুধু দূরের কিছু সম্পত্তি গ্রহণ করেন। সম্পত্তি নিয়ে এইসব তিক্ততার সঙ্গে পরবর্তীকালে 'চৌধুরী উপাধি' ত্যাগের কিছু সম্পর্ক থাকতেও পারে। পরে উপেন্দ্রকিশোরের প্রভাবে তাঁর দুই ভাই কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জনও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। অন্যদিকে, সারদারঞ্জন ও তাঁদের তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জন ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। এ সত্ত্বেও কিন্তু তাঁদের ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্প্রীতি ছিল গভীর। এসব থেকে বোঝা যায় শান্ত প্রকৃতির মানুষ হলেও তিনি ছিলেন ভগবৎ-বিশ্বাসে অচঞ্চল। বিবাহের পর তাঁরা বাস আরম্ভ করেন ১৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে 'লাহা বাড়ি' নামে পরিচিত বাড়িটিতে। এবাড়িতেই বাস করতেন দ্বারকানাথ ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও ব্রাহ্ম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ও আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্ম বাস করতেন। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল ও তার বোর্ডিং-ও ছিল এ বাড়ির একাংশে। এখানেই উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম পাঁচ সন্তান—সুখলতা (হাসি), সুকুমার (তাতা), পুণ্যলতা (খুশি), সুবিনয় (মণি) আর শান্তিলতার (টুনি) জন্ম হয়। তাঁরা কাদম্বিনীকে ডাকতেন 'নতুন দিদিমা' আর তাঁর সন্তানদের জংলুমামা, মংলুমামা, চামিমাসি ইত্যাদি, যদিও অনেকেই বয়সে ছোট ছিলেন। এ বাড়ি প্রসঙ্গে পুণ্যলতা লিখেছেন: ''যে বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল আর শিশুকাল কেটেছিল, সেটা ছিল বিরাট একটা সেকেলে ধরণের বাড়ি। তার বাইরের অংশে আমাদের স্কুল হত, ভেতরের অংশে দোতলায় আমরা থাকতাম আর তিনতলায় আমাদের দাদামশাইরা থাকতেন। একতলায় বাইরের ঘর, বারান্দা আর ওপরে ওঠবার চওড়া কাঠের সিঁড়ি ছিল— পিছনে আরও কত ঘর ছিল, সেখানে কারা থাকত, সেসব ভালো করে মনে নেই''।

এরপরে ১৮৯৫ সাল নাগাদ তাঁরা উঠে যান ৩৮/১, শিবনারায়ণ দাস লেনে ভাড়াবাড়িতে। এখানেই তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান সুবিমলের জন্ম হয়। উপেন্দ্রকিশোর আর তাঁর স্ত্রী বিধুমুখী শুধু ছয় সন্তানকেই ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করেননি, ১৮৮৮ সালে স্ত্রী-বিয়োগের পর রামকুমার বিদ্যারত্ন সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সুরমাকেও কন্যাস্নেহে মানুষ করেছিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে নিজের কনিষ্ঠ ভাই প্রমদারঞ্জনের বিবাহ দেন। এই সুরমাই বর্তমান লেখকের ঠাকুমা। পরে কুলদারঞ্জনের স্ত্রী স্বর্ণলতা অল্প বয়সে মারা গেলে তাঁদের তিন সন্তান মাধুরীলতা, ইলা ও করুণারঞ্জনকেও নিজের সন্তানের মতন প্রতিপালন করেন। এইভাবে তাঁরা দশটি ছেলে-মেয়ের বাবা-মা'র দায়িত্ব পালন করেন। পুণ্যলতা লিখেছেন, ''এতদিন আমরা বাড়িতে সাতজন ছেলে-মেয়ে ছিলাম, এবার দশজন হলাম।''

এরপরে ১৯০০ সালে তাঁরা উঠে যান ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটে আর একটি ভাড়াবাড়িতে। পুণ্যলতার বর্ণনায় ''এবার আমরা উঠে এলাম আরও বড় একটা বাড়িতে। এখানে তিনতলার ওপরে কাচের ছাদওয়ালা সুন্দর স্টুডিও তৈরি হল। মেঘলা দিনে বা রাতে কাজ চালানোর জন্য প্রকাণ্ড আর্ক ল্যাম্প এল, নতুন ক্যামেরা, প্রেস ও আরও অনেক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এল। বিস্তর টাকা খরচ করে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ হল।'' এ বাড়িতে পূর্ব অংশের নীচে ছিল 'কান্তিক প্রেস'। দোতলায় ছিল 'ভারতী' পত্রিকার অফিস। এ বাড়ি থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র-কন্যা সুখলতা, পুণ্যলতা, সুকুমার ও শান্তিলতার বিবাহ হয়। বিবাহ হয় সুরমারও।

সবশেষে ১৯১৪ সালে নিজের পছন্দমতো বাড়ি তৈরি করে তাঁরা উঠে যান ১০০নং গড়পার রোডে। এ বাড়িটি ছিল বিরাট, বাইশটি ঘর ছিল। বর্তমানে সেখানে 'এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন' অবস্থিত। কিন্তু এ বাড়ি বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি উপেন্দ্রকিশোর। পরের বছরই দুরারোগ্য ডায়াবিটিস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাদের ছেলেবেলার কথা চমৎকার ভাষায় লিখে গেছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী। বাড়ির প্রকাণ্ড ছাদে একসঙ্গে সকলে মিলে খেলা করতেন। খেলার পাশাপাশি পড়াশুনাও চলত, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর পড়াশুনার জন্য কোনও চাপ দিতেন না ছেলে-মেয়েদের। নিজের সংগ্রহের বই থেকে নানা রকম ছবি দেখিয়ে গল্পের ছলে তাঁদের পড়িয়ে দিতেন। বেড়াতে নিয়ে যেতেন নানান জায়গায়, কখনও ঘোড়ার গাড়িতে, কখনও বা পাল্কিতে। সার্কাস বা পুতুলনাচ দেখার আনন্দের অভিজ্ঞতা তো ছিলই। পরে বায়োস্কোপ চালু হওয়ার পর সিনেমা দেখাও আরম্ভ হল। ছোটদের পত্রিকা 'সখা ও সাথী' আর 'মুকুল' পড়তেন সকলে মিলে আনন্দ করে। সেইসঙ্গে ছিল উপেন্দ্রকিশোরের নিজের লেখা বই আর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নানান গল্প ও ছড়ার বই।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রত্যেক বছর ছুটির সময় মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা ছিল তাঁদের নৈমিত্তিক। কখনও বা পূর্ববাংলায় দেশে যাওয়া হত ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকোয় এবং শেষে হাতি বা পাল্কিতে চড়ে। সেই যাওয়াটা ছিল ছোটদের কাছে একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। আবার কখনও পশ্চিমে বা পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া হত। এইভাবে তাঁরা বেড়াতে গেছেন পচম্বা, চুনার, পুরী, দার্জিলিং, মধুপুর বা গিরিডি। তার অনেক চমৎকার বর্ণনাও দিয়ে গেছেন পুণ্যলতা।

উপেন্দ্রকিশোর কত স্নেহপ্রবণ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে একটি ছোট্ট গল্প থেকে। তাঁরা যখন মধুপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন, কোনও কাজে উপেন্দ্রকিশোর কয়েকদিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন। কলকাতায় যাওয়ার ট্রেন বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেও এবং দাদা-দিদিরা বাবাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেও পুণ্যলতা তাঁকে দেখতে পাননি। দুঃখে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। আসলে মধুপুর যাওয়ার সময় তাঁরা সবুজরঙের কামরায় গিয়েছিলেন, তাই পুণ্যলতা সবুজ গাড়ি খুঁজছিলেন কিন্তু এবারের গাড়িটা ছিল সাদা। একথা শুনেই মেয়েকে বাবা চিঠিতে লিখছেন—

"রেলের যে সবুজ গাড়ি,
তাতে ছিল একটি বুড়ি-
জালার মতো মোটা আর কয়লার মতো কালো,
বসেছিল সব ঢেকে,
তাই তার ভিতর থেকে
বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ভালো।

নেমে এলাম তাড়াতাড়ি
চড়লাম গিয়ে সাদা গাড়ি
তারপর জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম গলা
যেই বাড়ির সামনে এলাম
তোমাদের দেখতে পেলাম,
কিন্তু আমি ভুলে গেলাম গুড মর্নিং বলা!"

সবসময় উপেন্দ্রকিশোর ছেলে-মেয়েদের যত্ন করে সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন আর সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কখনও বিরক্ত হতেন না। ছেলে-মেয়েদের লেখা বা ছবি আঁকাতেও তিনি সবসময় উৎসাহ দিতেন। পুণ্যলতা লিখেছিলেন, "আমাদের বাড়িটা ছিল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অতিথি, অভ্যাগত সকলেরই সুখের মিলনের জায়গা— বারোমাসে তেরো পার্বণের মতো ছোটখাটো কত আনন্দের উৎসব নিত্য লেগে থাকত।" এক পারিবারিক বন্ধু বলতেন, "এ বাড়ির মানুষগুলি সব সময়েই হাসছে— বাড়িটাও যেন হাসছে।" তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতেন উপেন্দ্রকিশোরের ভাইরা এবং দ্বারকানাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও প্রথম মহিলা ডাক্তার) ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতন লোকজন। সুতরাং তাঁদের দেখে যে ছোটরা অনুপ্রাণিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

এবার তাঁর কর্মজীবনের কথা। শিশু-সাহিত্যিক ও সম্পাদক হিসেবে উপেন্দ্রকিশোর সুপরিচিত। আবির্ভাব 'সখা' পত্রিকায়, পরে নিয়মিত লিখেছেন 'সাথী', 'সখা ও সাথী' এবং 'মুকুল' পত্রিকায়— সবশেষে তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপূরণ হয় 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশে (১৯১৩)। এর ঢের আগেই তিনি ইউ রায় নামে ফোটোগ্রাফি, ব্লক তৈরি ও ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট-এর কাজ শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে 'ইউ রায়, আর্টিস্ট' নামে তাঁর বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন প্রকাশনা সংস্থা 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'—'সন্দেশ' পত্রিকাও সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৫) ও 'ছেলেদের মহাভারত' (১৮৯৭) প্রকাশিত হয়েছিল অন্য প্রকাশনা সংস্থা থেকে। তাঁর আঁকা সুন্দর ছবিগুলি অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি ব্লক তৈরি ও ছবি ছাপায় মন দেন। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বই ছাপা হয় তাঁর বন্ধু যোগীন সরকারের সিটি বুক সোসাইটিতে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর লেখা পড়ে কিছুটা সংশোধন করে দেন। বিলেত থেকে বইপত্র ও প্রোসেস ক্যামেরা আনিয়ে হাতেকলমে পরীক্ষা করে তিনি হাফটোন ছবি ছাপাকে যে পর্যায়ে নিয়ে যান, তা বিস্ময়কর। সেযুগে মুদ্রণের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'Penrose Annual'-এ তাঁর নয়টি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাঁর কাজ সম্পর্কে বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, "far ahead of European and American workers in originality, which is all the more surprising when we consider how far he is from the hubcentres of process work" তাঁর 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১০) ও 'টুনটুনির বই' (১৯৩) সরাসরি তাঁর নিজের সংস্থা থেকেই ছেপে বেরোয়, পরে তাঁর অন্যান্য বইগুলিও প্রকাশিত হয় এখান থেকে, সুখলতা, সুকুমার ও কুলদারঞ্জনের বেশ কিছু বইও তাই। হাফটোন মুদ্রণে তাঁর সাফল্য প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন।

অনেক জায়গাতেই লেখা দেখেছি যে, উপেন্দ্রকিশোরের ভাইরা ব্যাটবল হাতে ক্রিকেট মাঠে খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর হাতে তুলে নিয়েছিলেন বাঁশি আর রংতুলি। একথা ঠিক যে, উপেন্দ্রকিশোরের চার ভাই-ই ক্রিকেট খেলে নাম করেছিলেন, বিশেষত সারদারঞ্জন (যিনি 'বাংলার ক্রিকেটের জনক' হিসেবে খ্যাত) আর কুলদারঞ্জন। উপেন্দ্রকিশোরও যে ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী ছিলেন, তা জানতে পারা যায় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে: "উপেন্দ্রকিশোরও ক্রিকেট খেলার ভক্ত ও দক্ষ ছিলেন। আমরা বাল্যে তাঁহার ক্রিকেট (ব্যাটম-বল) খেলার বিবরণ ও প্রশংসা শুনিয়াছি।" রনজির কলকাতায় ক্রিকেট খেলা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

একইরকম ভাবে প্রায় অজানা উপেন্দ্রকিশোরের স্বদেশিয়ানা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে অনেকের মতো ভেসে গিয়েছিলেন তিনিও। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাইতে গাইতে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখন উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতে বাজাতে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। সঙ্গে খোল বাজাচ্ছিলেন দীনু ঠাকুর। টাউন হলে একটি

বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভাতেও রবীন্দ্রনাথের গানের পরে বেহালা বাজিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। এছাড়া 'প্রবাসী'-তে তাঁর রেখায়-লেখায় একটি 'পলিটিক্যাল স্যাটায়ার' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল বিদেশি দ্রব্য বর্জন আর স্বদেশি দ্রব্য মাথায় তুলে নেওয়া। ১৯০৬-০৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে Indian Industrial and Agricultural Exhibition অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবি, ছাপা হাফটোন ছবি আর ছাপার যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর উড এনগ্রেভিং, সেরা কমার্শিয়াল ডিজাইন ও Screen Indicator যন্ত্রের জন্য স্বর্ণপদক ও তাঁর আঁকা তৈলচিত্রে নিসর্গ দৃশ্যের জন্য বিশেষ রৌপ্যপদক পান। উপেন্দ্রকিশোর ছাড়াও ওই প্রদর্শনীতে রায় পরিবারের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরপরেও বিশেষত তাঁর মেজছেলে সুবিনয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল স্বদেশি জিনিসপত্রের প্রতি এবং তা নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাশা হলেও গোটা পরিবারের সমর্থন ছিল সুবিনয়ের পিছনে।

চিত্রাঙ্কনে তাঁর সহজাত প্রতিভার কথা বলা হয়েছে। ছোটলাট স্যার অ্যাপলি ইডেনের উপদেশে ছবি আঁকা উপেন্দ্রকিশোর ছাড়েননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন বইয়ে ছাপা ছবিগুলি যদিও বা আমাদের নজরে আছে, তেলরঙে বা জলরঙে আঁকা তাঁর অনেক ছবিরই কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। তাঁর আঁকা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটি বিশপ লেফ্রয় রোডে সত্যজিতের সংগ্রহে ছিল। হিমালয়ের আরও একটি ছবি তাঁর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কাছে দেখেছি বলে মনে পড়ে। একটি প্রবন্ধে পড়েছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির জন্য উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা 'চুনার দুর্গ' ছবিটি সংগ্রহ করেছিলেন। গিরিডিতে উশ্রী নদীর একটি ছবি তিনি উপহার দিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা সুরমাকে। তার হদিশ জানিনা। পুরীর সমুদ্র নিয়ে আঁকা তাঁর একটি ছবির সম্বন্ধেও পড়েছি কোথাও। কিন্তু এইসব ছবি ছড়িয়েছিটিয়ে কোথায় গেছে তার কোনও খবর পাইনি। চিত্রকর হিসেবে তিনি কিন্তু সে সময়ে খুব একটা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি, বরং সমালোচকরা তাঁর ছবিকে 'আড়ষ্ঠ ছবি' বা 'বিদেশির অনুকরণে অঙ্কিত 'মেকি' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। সত্যজিত অবশ্য লিখে গেছেন তিনি ছিলেন স্বাভাবিক চিত্রশিল্পী, তালিম ছাড়াই তিনি ছবি এঁকে গেছেন। সত্যজিতের মতে, এই ব্যাপারে পুত্র সুকুমারের থেকেও কিছুটা এগিয়ে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর।

চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতচর্চা দুইয়ের প্রতি-ই উপেন্দ্রকিশোরের আগ্রহ ছিল গভীর। এই দুই বিদ্যার সম্পর্ক সম্বন্ধে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা নিবন্ধে লিখে গেছেন, ''ভাবিয়া দেখিলে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।... দুই বিষয়ের দুইটি মূল-শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গ-মূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। ...সাত সুর; সাত রং। লোহিতাদি সাতটি রং, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার 'সা রে গা মা'-র স্থানীয়। ... ছবি আঁকিবার সময় যে ভিন্ন ভিন্ন রং মিশ্রিত করিয়া স্বাভাবিক বর্ণের অনুকরণ করা হয়, তাহার অনুরূপ সঙ্গীতে কী আছে? হারমনি তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশীয় সঙ্গীতে যেমন হারমনি নাই, আমাদের 'পটো'-দিগের চিত্রেও তেমনই রং স্বাভাবিক হয় না। হলদে মানুষটি লাল কাপড় পরিয়া কালো রঙের গদা দিয়া সবুজ মানুষটিকে ঠেঙায়।

চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনি সময়। চিত্রেতে ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন সুর ভিন্ন ভিন্ন সময় অধিকার করিয়া থাকে। সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে''।

সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। বেহালা বাজানোর সখের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু বেহালা নয় সেতার, পাখোয়াজ ও বাঁশি তাঁর খুব প্রিয় বাজনা ছিল। পরে হারমোনিয়াম ও অরগ্যান বাজানোও শিখেছিলেন। কিন্তু বেহালা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং বেহালার হাতও ছিল অসাধারণ। চিরজীবন এই বেহালা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। শেষজীবনে গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও প্রতিদিন উঠে বসে বেহালা বাজাতেন। কেবল বাজানোই নয়, বাংলা ভাষায় বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ওপর বই লেখার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ১৮৮৮ সালে তাঁর বই 'শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়াম শিক্ষা' প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুর, মাত্রা, মাত্রামান ও স্বরলিপি পাঠের কথা বলেছেন এবং পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন ধরণের হারমোনিয়াম যন্ত্রের। ১৮৯৭ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সর্বশেষ ১৯০৪ সালে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে বেশ কয়েকটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি। এই বইতে তিনি ১৯ শতকে প্রচলিত দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি চালু হয়নি। বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও তৃতীয় সংস্করণের পর এটি আর ছাপা হয়নি। সম্ভবত তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, হারমোনিয়াম ব্যবহার থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষতি হচ্ছে এবং এই জন্য তিনি প্রকাশক অনুরোধ করা সত্ত্বেও বইটির নতুন সংস্করণ ছাপতে দেননি। লক্ষণীয় যে তাঁর প্রিয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথও ১৯৩০-এর দশকে 'হারমোনিয়ামের দৌরাত্ম্য' থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মুক্ত করার উপদেশ দেন কলকাতা বেতারকে।

উপেন্দ্রকিশোরের গভীর সখ্য ছিল কলকাতায় হারমোনিয়ামের উদ্ভাবক দ্বারকানাথ ঘোষের সঙ্গে। এই দ্বারকানাথই 'ডোয়ার্কিন ফ্লুট' নামে হারমোনিয়ামের স্রষ্টা, যা তখনকার সঙ্গীত-বোদ্ধারা সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, দ্বারকানাথের নাম থেকে 'ডোয়ার্কিন' নাম দেওয়া উপেন্দ্রকিশোরের পরামর্শে। উপেন্দ্রকিশোরই দ্বারকানাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের পরামর্শে দ্বারকানাথ 'Musical Advertiser Press' স্থাপনা করেন। এই প্রেসে স্বরলিপি ছাপা হত। এই সংস্থা থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এখান থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বীণাবাদিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হত, যার মলাট এঁকেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর।

এছাড়া তাঁর 'বেহালা শিক্ষা' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। বেহালা তাঁর কত প্রিয় ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বেহালা বাদনরত উপেন্দ্রকিশোরের ছবিও আমরা দেখেছি। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''তিনি বিদেশি প্রথায়, কাঁধে রাখিয়া ও চিবুক দিয়া চাপিয়া বেহালা বাজাইতেন এবং ছড় ধরিবার ও চালাইবার বিদেশি রীতিই তিনি ব্যবহার করিতেন। ফলে তাঁহার বেহালায় যে দীর্ঘ তান ও সুরের সূক্ষ্ম ধ্বনিভেদ হইত তাহা দেশি প্রথায় বেহালাকে বাহুলগ্ন করিয়া দ্রুত চালনার উপযোগী করিয়া ছড় ধরিলে সম্ভব হইত না। গানের সহিত তাঁহার বেহালার সংগত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের এগারোই মাঘের গীত-উৎসব সঙ্গীতের সহিত তাঁহার বেহালার সংগত একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।'' 'বেহালা-শিক্ষা' বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে, বেহালা শিক্ষার্থীর পক্ষে এটি প্রথম পাঠ এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পাঠে প্রচলিত তাল ও রাগের বিবরণ সহ অনেক গানের স্বরলিপি দেওয়া হবে। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ বই 'AH Fox strangways-এর 'Music of Hindustan' বইতে উপেন্দ্রকিশোর তিনটি রবীন্দ্রগীতির ইংরেজি অনুবাদ করেন। 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ প্রবীর গুহঠাকুর, লিখেছেন উপরোক্ত দুটি বইতে এবং 'ভারতমহিলা' পত্রিকায় তিনি ১২টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি দিয়েছেন এবং তিনটি

ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম স্বরলিপিকার, যদিও 'গীতবিতান'-এ তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

এছাড়া উপেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করেছিলেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। সেই তালিকায় আছে 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বরলিপি ও এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ভারতীয় সঙ্গীত' (১৮৯৫), 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বেহালা' (জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন, ১৩০৭) এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতীয় সঙ্গীত' (মাঘ ১৩১৯, ভাদ্র ১৩২০ ও বৈশাখ ১৩২৩)। সর্বশেষ প্রবন্ধটিতে তিনি সুর ও কথার সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখেছেন, ''কথা সংসারের ফেরিওয়ালা। সে প্রাণের দ্বারে আসিয়া 'চাই গো! চাই গো?' বলিয়া চিৎকার করে, কিন্তু তাহার ভেতরে প্রবেশ করিবার আজ্ঞা নাই। সঙ্গীত যদি আসিয়া তাহাকে ভেতরে লইয়া যায়, তবেই সে প্রাণের দেখা পায়।''

এই সঙ্গীতপ্রীতি উপেন্দ্রকিশোরকে ব্রাহ্মসমাজের আরও কাছে নিয়ে আসে। বিলেতের 'সানডে স্কুল' দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দায়িত্বে ছিলেন গুরুচরণ মহলানবীশের কন্যা সরলা, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী ও জগদীশচন্দ্রের ভগ্নি লাবণ্যপ্রভা। ১৮৯৮ সালের 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় দেখা যায় যে, উপেন্দ্রকিশোর, হেমেন্দ্রমোহন বসু ও কুমারী সরলা গাঙ্গুলি নীতি বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন। ১৯১১ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার পিছনে উপেন্দ্রকিশোরের যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন উপেন্দ্রকিশোর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও হরিমোহন ঘোষাল। এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপেন্দ্রকিশোর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে অথবা 'ছাত্রসমাজ'-এ সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন।

তাঁর লেখা কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বইটি থেকে আমি ছ'টি গানের সন্ধান পেয়েছি। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত 'জাগো পুরবাসী, ভগবতপ্রেমপিয়াসী'। আজও ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব এই গানটি দিয়ে শুরু হয়। আর একটি গান 'জয় দীন দয়াময়, নিখিল ভুবনপতি'। গানটি নিয়মিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গীত হয়। অন্য দুটি গান 'বল দেখি ভাই এমন করে ভুবন কে বা গড়িল রে' আর 'বরষ পরে পিতার ঘরে মিলিল' গাওয়া হয় বালক-বালিকা উৎসবে। সম্ভবত এ-দুটি গান তিনি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখেছিলেন। আরও দুটি গান 'কে ঘুচাবে হায় রে প্রাণের কালিমা' আর 'চরণতলে পড়ে রহিব, প্রভু হে' প্রায় সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। তাঁর অনেক হারিয়ে যাওয়া ছবির মতনই এ গান দুটিও হয়তো হারিয়ে যাবে। এছাড়া পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর দুটি অপ্রকাশিত গানের হদিশ দিয়েছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। অনেকে পড়ে আশ্চর্য হবেন যে, তাঁর পুত্র সুকুমার রায়ের লেখাও দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে— তাও আজ স্বল্প-ব্যবহৃত ও স্বল্প-পরিচিত।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তিনি নিজেও অনেক গান রচনা ও গানে সুর যোজনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত 'জাগো পুরবাসী' এখনও মাঘোৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। অন্য আর একটি গান 'জয় দীন দয়াময়'। এগুলি সুর-তাল-লয়ের সহিত কথার সুন্দর যোগে অনুপম। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত এই দুই শাখাতেই তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার ছিল। উপরন্তু তিনি দীর্ঘদিনের শাস্ত্রসম্মত শিক্ষা-দীক্ষার ফলে উহা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন। তাঁহার স্বভাবগত গুণ ছিল যে-কোনও বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা বা কৌতূহল জাগ্রত হইলে তিনি তাহাতে গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন।

তাঁহার সঙ্গীতচর্চার আর একটি দিক আমার বাল্যস্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। শিশু ও কিশোর বালক-বালিকারা ছিল তাঁহার স্নেহ-ভালোবাসার পাত্র। সেইজন্য তাহাদের গান শিক্ষাদানের জন্য সেই সময়ের 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়'-এর সহিত তিনি গানের ক্লাস খুলিয়াছিলেন এবং পরম ধৈর্য ও যত্নের সহিত ছোটদের সঙ্গীতশিক্ষার কাজ প্রায় একাকী চালাইতেন। ইহাতে তাঁহার সময় ও পরিশ্রমই শুধু ব্যয় হইত না, আর্থিক ব্যয়ও ছিল যন্ত্রপাতির মেরামতে যাতায়াতে। তিনি ছোটদের আনন্দে এতদূর সন্তুষ্ট হইতেন যে অন্য কিছু লাভের কথা তাঁহার মনে স্থানও পাইত না।...বাল্যজীবনে সঙ্গীতের কী প্রভাব, কীভাবে উহা শিশু ও কিশোরের মন-প্রাণ স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন করে, উপেন্দ্রকিশোর তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার শত কাজের মধ্যেও এই গানের ক্লাস চালনার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের রচিত গানে নিজেই সুর যোজনা করিয়া ও নিজে গাইয়া তিনি বহু বালক-বালিকাকে শিখাইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার বেহালা ও কণ্ঠের সহিত তাহাদের কণ্ঠ মিলাইয়া গান গাহিত।''

১৯১৫ সালের ২০ ডিসেম্বর দুরারোগ্য ডায়াবিটিস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়, কারণ সে সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ইউরোপ থেকে ইনসুলিন আমদানি বন্ধ ছিল। মৃত্যুর আগে রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অবস্থাতে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কী আরাম, কী শান্তি তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না— আমি আনন্দেই আছি, আনন্দেই থাকিব। মৃত্যুর সময়ে ক্রন্দন করিয়া আমাকে অস্থির করিও না। আমার কাছে বসিয়া সকলে ভগবানের নামগান করিও।'' পরের দিন সকালে যখন উষাকালীন প্রার্থনা 'জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপাতরণী, লইবে মোরে ভবসাগর কিনারে' গাওয়া হচ্ছিল, তখন শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে লেখা হয়েছে: 'ব্রাহ্মসমাজের আকাশ হইতে আর একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল; ব্রাহ্মসমাজের আর একজন নীরব সাধক ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন...তাঁহার সদাপ্রসন্ন চিত্ত, অকৃত্রিম প্রাণের প্রসারতা, সর্বজনে প্রেম ইহা কখনও ভুলিব না; দুই ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে বাস করো, তুমি তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িবে। এই প্রেম, এই বিনয়, এই সরস ভাব, ইহার উৎস কোথায়? ভগবদ্ভক্তিতে তিনি নীরব সাধক ছিলেন। তিনি সমাজের আচার্যের পদ গ্রহণ করিতেন না, শেষকালে কোনও কমিটির সভ্যও হইতেন না, অথচ নীরবে সাধনা করিয়াছেন, সমাজের সেবা করিয়াছেন। ...আজ তিনি নাই, মাঘোৎসবের দিন প্রাতকালে জাগো পুরবাসী এই সঙ্গীত গীত হইবে কিন্তু এই গানের রচয়িতাকে দেখিতে পাইব না; আর বালক-বালিকা সম্মিলনে শিশুদিগকে উপদেশ দিবেন না; আর তিনি সমাজ-গায়কগায়িকাগণের পশ্চাতে আসিয়া বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবেন না; আজ তাঁহার স্থান কে পূর্ণ করিবে? তিনি যে অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যে অনেক হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন।''

ওপরে উদ্ধৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও সঙ্গীত-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে। শিশুসাহিত্যিক, সম্পাদক, কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, সুরকার, বাদ্যযন্ত্রী, চিত্রকর, মুদ্রণে নতুন পথের যাত্রী, কারিগরিবিদ, হরফ সংস্কারের পথিকৃৎ, স্বাদেশিক ও ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ এই বহুমাত্রিক মানুষটিকে সহজে সকলের সামনে প্রকাশ করব সে সাধ্য আমার নেই। তবে তাঁর সার্ধশতবর্ষের প্রাক্কালে বিস্ময়কর জীবনকথা বর্ণনার ছলে তাঁর প্রতি এই বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন।

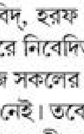

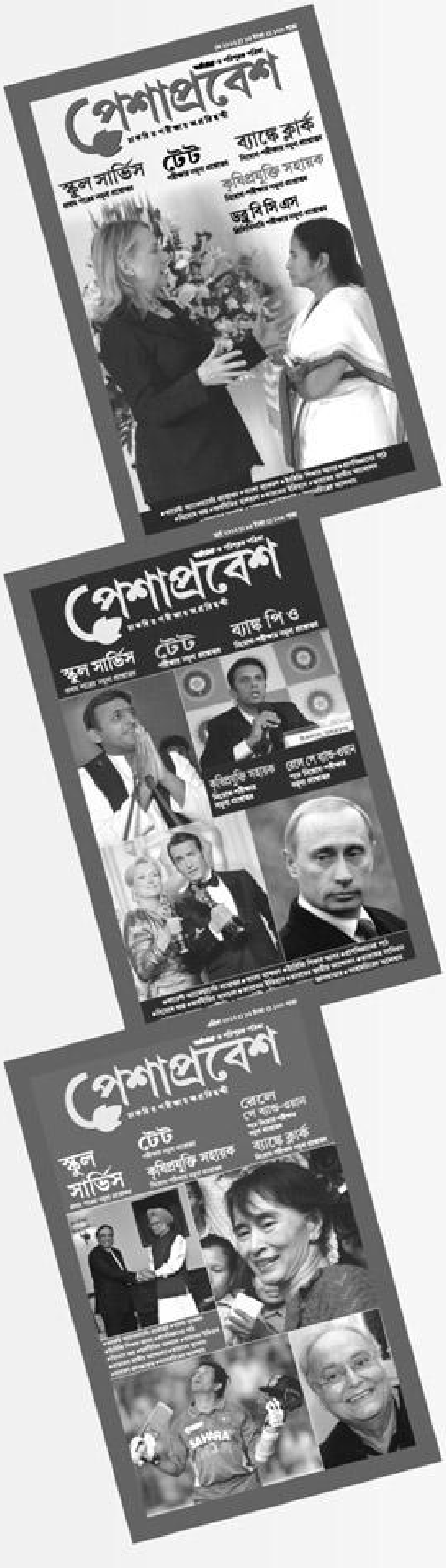

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।

  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

সংস্কৃতিমঞ্চ

সাপ ও পদ্মের নিঃসঙ্গ কারুকাজ

বিচিত্র এই শহর কলকাতা। এখানে রোজদিনই ঘটে চলেছে নানা ধরণের অনুষ্ঠান। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি— সব নিয়েই যেন তুমুল কলরোল। সত্তর দশকে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে যখন বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ বেজে উঠছে বারুদের অঙ্গীকার নিয়ে, তারই পাশাপাশি কলকাতার যাবতীয় দেওয়াল সাপ আর পদ্মফুলের ছবিতে ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তরুণ শিল্পী অসিত পাল। রঙিন সেইসব ছবির সঙ্গে সঙ্গে থাকত আশ্চর্য সব কবিতার পংক্তি। অসিত পালমশাই চাকরি করতেন একটি বড় পত্রিকা হাউসে, শিল্পী হিসেবেই। সময়টা সত্তরের একেবারে শুরু অথবা ষাটের সংক্রান্তি। তখনই, কি তার একটু আগে আগে 'মুক্তমেলা' বসেছে মনোহর দাস তড়াগের আশপাশে। জ্যোতির্ময় দত্তের মাথা থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্তমেলা যখন ময়দানে পেখম মেলছে তখন কলকাতার কোনও কোনও শিল্পী, কবি, গদ্যকাররা প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। তাঁরা শামিল হলেন সেই 'মুক্তমেলা'য়। এখানেই তুষার রায় দাপটে হাজির তাঁর কবিতা নিয়ে। তাঁর একটি সেই বিখ্যাত 'পুলিশ, ওরে পুলিশ/কবিকে দেখলে টুপিটা তোর খুলিস।' 'মুক্তমেলা'-য় বসল ছবি আঁকার আসর, সেইসঙ্গে নাচ-গান।

এই মেলা নিয়েও 'বিতর্ক' বড় কম হয়নি। কেউ বললেন, এটা সি আই এ-এর মদতপুষ্ট। কেউ বা বললেন, এটা অর্গলবিহীন মুক্তচিন্তার মেলা, সৃষ্টিসুখের উল্লাস। সৃষ্টির আনন্দে প্রত্যেকেই বাঁধনহারা, পাগলপারা প্রায়। এই অবস্থায় 'মুক্তমেলা'-য় 'বাঙালির বোমা' পড়ল। বারুদের দমচাপা গন্ধে কেঁপে উঠল মনোহর দাস তড়াগের জল। তখনও এ-অঞ্চলে 'টাটা সেন্টার' সম্ভবত মাথা তোলেনি। নাকি তুলেছে? 'বৃহৎ পত্রিকা' গোষ্ঠী মেলার পক্ষে দাঁড়াল। বিরোধিতা করল বামেরা, বিশেষত আল্ট্রালেফটগণ, যারা 'নকশালপন্থী' বলে পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সম্প্রচারিত হয়েছে। কেউ কেউ 'মুক্তমেলা'-কে নবচিন্তন, নবজাগরণের প্রতীক বললেন। নকশালবাদীরা বলল, এর পশ্চাতে রয়েছে আমেরিকা। সি আই এ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'মুক্তমেলা' বন্ধই হয়ে গেল।

সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে বসত 'মুক্তমেলা', কলকাতা ময়দানের প্রাচীন সবুজ ঘাসেরা হয়তো তার সাক্ষী হয়ে আছে এখনও। 'মুক্তমেলা' বন্ধ হওয়ার পরও অসিত পালের বড় বড় সাপ আর পদ্ম আঁকা বন্ধ হয়নি। হাজরা মোড়ের কাছাকাছি চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের দেওয়াল, মনোহর দাস তড়াগের পাশের ছোট ছোট গম্বুজ— সবই এই সরোজ ও সর্পের আওতায় এসেছিল। 'সমকালীন কলকাতা' নামে একটি পত্রিকা দীর্ঘদিন বার করতেন অসিত পাল। এরই পাশাপাশি সময়ে 'এপিক থিয়েটার' নামে একটি পত্রিকা বেরত। সম্পাদনা করতেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আর পবিত্র সরকার। দুটি পত্রিকার সাইজই একরকম। তাই দুটি কাগজের কথাই একসঙ্গে মনে এল।

এবছর ৯ মার্চ ছিল শুক্রবার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীভবনের বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগৃহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগ আর 'পুনশ্চ বাংলা'— যাঁরা হলেন গিয়ে যাদবপুরের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী, তাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, জ্যোতির্ময় ঘোষ, অচিন্ত্য বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়া ছিলেন বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র। অনুষ্ঠানে গান গাইলেন পবিত্র সরকার। রবীন্দ্রনাথের গান। শঙ্খ ঘোষ তখনও তাঁর শারীরিক অবসন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে, তাঁকে কোনওভাবেই মঞ্চে পাওয়া গেল না। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের পক্ষ থেকে।

১৫ মার্চ সন্ধে সাড়ে ছটায় বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে অন্নদাশঙ্কর রায় স্মারক বক্তৃতা ('বাংলা রেনেসাঁসের পরিপ্রেক্ষিতে অন্নদাশঙ্কর') দিলেন প্রবীণ গান্ধিবাদী সমাজকর্মী ও গ্রন্থকার, চিন্তক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আশি পেরিয়ে আসা শৈলেশকুমার রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায় দিয়ে শুরু করে অন্নদাশঙ্করের জীবনচর্চা, লেখালেখি ও তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার চিন্তায় পৌঁছতে চাইলেন। বক্তৃতা খুব দীর্ঘ হয়নি। তবু তারই মধ্যে তিনি অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছড়া— সব বিষয়েই কিছু বলার চেষ্টা করলেন। সভাপতির আসনে থাকা মহাশ্বেতা দেবী, যিনি আবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিরও সভাপতি, অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস, অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক— এসব নিয়েও কয়েকটি মূল্যবান কথা বললেন। শৈলেশকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য', 'ক্রান্তদর্শী', নিয়ে আলাদা করে কিছু মূল্যবান উচ্চারণ পেশ করলেন তাঁর লিখিত বক্তব্যে।

'বাওইআটি কৃষ্টি সংসদ' তেরো বছর পেরিয়ে পা রাখল চোদ্দোয়। সংসদের ঠিকানা— সি সি ৭৩, পূর্ব নারায়ণতলা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯। সংস্থার ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

'... কৃষ্টি সংসদের বিশেষত্ব হল কৃষ্টির বিভিন্ন শাখা— যেমন সাহিত্য, চিত্রশিল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে বিনোদন ছাড়াও তার গভীর স্তরের শিল্পরস গ্রহণের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা। আমরা জানি সভায় বহু মানুষ আসতে পারেন বিনোদনের আকর্ষণে, কিন্তু গভীরতর সুধার জন্য মানুষের নিজস্ব বোধ ও হৃদয়কে জাগিয়ে তোলার সাধনা করতে হয়, তার যোগ্য হয়ে উঠতে হয়— স্বাভাবিকভাবেই এই সাধনার ক্ষেত্রে ভিড় কম। তবু সভায় বহু বিদগ্ধজন আসেন, মতামত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠি।'

কৃষ্টি সংসদ-এর এই সম্পাদকীয় বুলেটিনে আরও লেখা হয়েছে—

'বাংলা ভাষা আজ বিপন্ন। ভাষার মাধ্যমে যে কৃষ্টির বহুবিধ সৃজন-নৈবেদ্য, তাকে উপেক্ষা করলে ভাষা বিপন্ন হয়— এই বোধ থেকে আমরা বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্পদের দিকে ও তার চর্চায় মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির কাজ করে চলেছি সংগঠনের জন্মকাল থেকেই। ভাষা রক্ষার কাজে এর বিকল্প বা অধিকতর ফলদায়ক অন্য কোনও পদ্ধতি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

'নানাক্ষেত্রের গুণীজনের সমর্থন ও শুভেচ্ছা নিয়ে আজ যে সংগঠন চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করল, তার গৌরব আপনাদের। এই অঢেল বিনোদনের যুগে আপনারা ও অঞ্চলের শ্রোতারা শিল্পের গভীরস্তরের সম্পদের খোঁজে প্রতিমাসের শেষ রবিবার অভিযাত্রিক সভাঘরে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের জন্যই এই কঠিন ব্রতে সাফল্য অর্জন করেছে বাওইআটি কৃষ্টি সংসদ।'

সতীনাথ ভাদুড়ির জীবন ও সাহিত্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘমল্লার' ও 'কিন্নরদল' গল্পদুটি, অক্ষয় মালবেরি খ্যাত মণীন্দ্র গুপ্ত, কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কবি অরুণ মিত্র, 'ব্লাইন্ড অপেরা'র নাটক, স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্রকলা, বিষ্ণু দে— সবই উঠে আসে বিভিন্ন বছরের অলোচনার নানা পর্বে।

বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ৭৯তম জন্মদিনটি প্রায় নিঃশব্দে চলে গেল। ২০১২-র ২৫ মার্চ কি কেউ স্মরণ করলেন শ্যামলকে? ওই তারিখেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকীতে আজ ক'জনই বা তাঁকে মনে রাখে?

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন কবি ও গদ্যকার মণীন্দ্র গুপ্ত। দীর্ঘদিন লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত এই কাব্যকারকে নিয়ে তেমন কোনও বাঙালি আতিশয্য দেখতে পেলাম না, আকাদেমি পাওয়ার পরও। কেউ বড় কোনও সম্মান পেলে তাঁকে নিয়ে সহৃদয়, সমবেত আনন্দোচ্ছ্বাসের চিরাচরিত বাঙালি রোগ কি বঙ্গজীবন থেকে হারিয়ে গেল! নাকি মণীন্দ্র গুপ্ত তেমন বহুল আলোচিত জনসম্মোহনী নন বলেই এই হেলাফেলা?

কিন্নর রায়

স্বর্ণাক্ষরে কাজের বই

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
শিশিরকুমার আচার্য

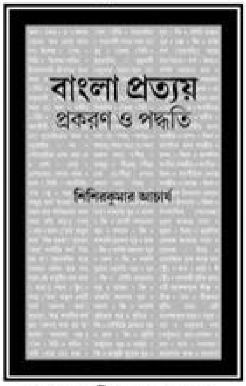

সদ্য বেরিয়েছে। ₹৯০

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 Fax: 2287-6448
E-Mail: books@swarnakshar.in

পুরনো অ্যালবাম

'নাচের কতোটুকুই বা ছুঁতে পেরেছি!'

অসুস্থ। শুয়েছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন। তাঁর নমস্কারও নৃত্যেরই মুদ্রার মতন। প্রতি-নমস্কার জানাব কী, আমি ভুবনভোলানো ওই ছন্দোমূর্তি দেখতে থাকি। উদয়শঙ্কর মানেই তো ভারতীয় নৃত্যপ্রতিমা। রোগ-জরা এই একটি শিল্পমূর্তিকেও ক্ষমা করতে শেখেনি?

এক সময় কথা শুরু হয়। শুরু হয় তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার। হাসপাতালে শেষ যাত্রার অল্প কয়েকদিন আগে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। আমি প্রশ্ন করি, উদয়শঙ্কর উত্তর দিয়ে যান।

বললাম, শিল্পমাধ্যম হিসেবে নৃত্য তো শিল্পীর আয়ুর গণ্ডিতে বড় বেশি বাঁধা। ভেবে আপনার দুঃখ হয় না?'

—তাতে কী। নৃত্যের কোনও সীমাপরিসীমা নেই। আমি কতটুকুই-বা ছুঁতে পেরেছি?

আমার মনে একটা দুঃখ ছিল, সেইখানে ফিরে গিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, আপনার প্রধান-প্রধান নৃত্য-রচনাগুলো কি ফিল্মে ধরা আছে?

একটু বিষণ্ণ শোনাল উদয়শঙ্করের গলার স্বর। বললেন, না। আমি কী করতে পারি। অল্প যা-কিছু আছে, ওই ''কল্পনা''র মধ্যে।

অনেক দিনের অনেক চিন্তা, কল্পনা, পরিশ্রম, চিত্র ও সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা, আর—যা তাঁর একেবারে নিজস্ব— তাঁর ঐতিহাসিক নৃত্য-প্রতিভা, এই সব-কিছুর সহযোগে উদয়শঙ্কর তাঁর জীবনের একমাত্র চলচ্চিত্র 'কল্পনা' শেষ করেছিলেন ১৯৪৭-এ।

জিজ্ঞেস করলাম—'কল্পনা' আপনি কোন বছর শুরু করেছিলেন?

—১৯৪৫-এ, শেষ হতে বছর তিনেক লেগেছিল।

—কীরকম সাড়া পেয়েছিলেন?

—আপনাকে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। ছবিটা শেষ করে আমি জওহরলাল নেহরুকে টেলিগ্রাম পাঠালাম, আমি আপনাকে আমার নতুন ফিল্ম 'কল্পনা' দেখাতে চাই। আপনি কি একটু সময় করতে পারবেন? জবাব এল, চলে এসো। পরদিন নেহরুর সঙ্গে দেখা করলাম, দিনটা ভারত স্বাধীন হওয়ার দিন পনেরো-কুড়ি আগে। গিয়ে দেখি, ওঁর চোখ তখন হাতে-ধরা দীর্ঘ একটা টেলিগ্রামের পাতায় পাতায় দৌড়োচ্ছে, প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ পাতার টেলিগ্রাম। দ্রুত পড়ছেন, একে-ওকে অর্ডার দিচ্ছেন, আমাকে দেখে বলে উঠলেন অসম্ভব। তারপরই বললেন, দাঁড়াও তো, এসো আমার সঙ্গে। ফোন করলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে— উদয় বলে একটা ছেলে ওর ফিল্ম দেখাতে চায়, হলটা পাওয়া যাবে কি-না। ওই যেটা এখন রাষ্ট্রপতি নিবাস, ওরই ভেতরে। মাউন্টব্যাটেন জানালেন— ঠিক আছে, কালই ছবি দেখানো যেতে পারে।

আমি শুনতে-শুনতে লিখছি, লিখতে লিখতে শুনছি, উদয়শঙ্কর বললেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, দেখুন তো খাওয়া যায় কি না।

আমি বললাম— নেহরু কি 'কল্পনা' দেখলেন?

সেদিন নেহরু, মাউন্টব্যাটেন ও আরও সব বিশিষ্ট বিদেশি অতিথি এসেছিলেন। ছবি দেখে নেহরু আমাকে বললেন, নানা উপলক্ষে এখানে দেখতে এসে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তোমার ছবি আমাকে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখল। তারপর স্বাধীনতার দিন, আমি তখন মাদ্রাজের বাড়িতে, মোটর সাইকেলে করে এক বিশেষ দূত একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এলেন। ঠিকানা: উদয়শঙ্কর, কেয়ার অফ গভর্নর মাদ্রাজ। খুলে দেখি লেখা আছে— গুড লাক টু ইওর **কল্পনা**! গ্রীটিংস। লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভেবে দেখুন, ভারতে ওঁদের এতদিনের রাজত্ব যেদিন শেষ হচ্ছে সেইদিন এক ভারতীয় শিল্পীকে ওরকম অভিনন্দন জানাচ্ছেন স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন।

—এখনকার ভারতীয় চলচ্চিত্রে নৃত্যের ব্যবহার দেখে আপনার রাগ হয় না?

কল্পনা ছবির একটি দৃশ্য

—ও বলে আর দরকার নেই। লাভ নেই কিছু।

—আপনার মেয়ে মমতার চলচ্চিত্রে অভিনয় করা সম্পর্কে আপনার কী মত?

আমি শুনেছি। আমার তো কিছু করার নেই।

—মমতার নাচ আপনার কেমন লাগে?

—খুব ভালো। মম-র প্রতিভা আছে। কিন্তু কত সুন্দর হত যদি আমি য়ুরোপ-আমেরিকায়, যেখানে আমার নাম লিজেন্ড হয়ে গিয়েছে সেখানে নিজের হাতে ওকে প্রেজেন্ট করতে পারতাম। সে সুযোগ আর হল না। —জীবনের আর নৃত্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে, চিত্রশিল্প ছেড়ে নৃত্যে এসেছিলেন ভেবে কখন ক্ষোভ জাগে না?

—আমার ছবি আঁকা আমার নৃত্যচর্চায় সাহায্য করেছে। নাচের ব্যাপারে চিত্রশিল্পের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জরুরি। রাশিয়ায় নৃত্যশিক্ষার্থীকে জ্যামিতি ও ড্রইং শিখতেই হয়।

—আপনার সারা জীবন নৃত্যে বিলিয়ে দেশের লোকের কাছে যোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?

—কী পাইনি বলুন? দেশে-বিদেশে অনেক সম্মান-সুখ্যাতি, আদর-ভালোবাসা পেয়েছি। ভারত সরকার পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ দিয়েছেন। এই তো সেদিন বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম উপাধি দিলেন। আমার খিদের অন্ন, মাথা গোঁজার ঠাঁই এসব থেকেই আমাকে খুঁজে নিতে হবে। বৃদ্ধের এইসব প্রয়োজন মেটাতে একদিন হয়তো সবই হবে, শুধু আমি আর তখন এই পৃথিবীতে থাকব না।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

যুগান্তরের সৌজন্যে

ছবি কালের কষ্টিপাথরে পুনর্মুদ্রণের সময় সংযোজিত

পরলোকে কমল মজুমদার

শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ শিল্পী ও সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার প্রায় ৬৫ বছরের কাছাকাছি এসে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন। দীর্ঘকাল ধরেই হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন, হঠাৎ কার্ডিয়াক আক্রমণে শয্যা নেওয়ার পর আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি।

নিঃসন্তান কমলকুমার তাঁর স্ত্রীকে রেখে গিয়েছেন। কমলকুমারের ভগ্নী শিল্পী শানু লাহিড়ী এবং ভাই নীরদ মজুমদার।

তাঁর চমকপ্রদ বিখ্যাত গল্পগুলি কৃত্তিবাস, এক্ষণ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে 'নিম অন্নপূর্ণা', 'শ্যাম নৌকা', 'গোলাপসুন্দরী', 'সুহাসিনীর পমেটম'। আর উপন্যাসের মধ্যে 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ', 'খেলার প্রতিভা' বিশেষভাবেই স্মরণে রাখার মতো।

কমলকুমার দীর্ঘকাল সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষকতা কার্য করে এসেছেন। নিজেও ছিলেন একজন প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী। 'আইকম-বাইকম' নামে একটি প্রাচীন প্রচলিত ছড়ার সংকলনে তিনি নিজেই চিত্র এঁকে অলঙ্করণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নাটকের দিকেও আগ্রহ ছিল প্রচুর। 'দানসা ফকির' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। অভিনীতও হয়েছিল।

কমলকুমারের আগ্রহ ছিল বিবিধ বিষয়ে। পাণ্ডিত্যও। 'অঙ্ক ভাবনা' নামে একটি গণিতের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থ চিত্রণ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন এক্ষণ পত্রিকায়। ১৯৫১ এবং ১৯৬১-র সেন্সাসের কাজে তাঁর দানের কথাও ভুলবার নয়।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সংযোজন: কমলকুমার মজুমদার এত বেশি অভিনব এক গদ্যকার যাঁকে নিয়ে, বলতে গেলে, গতকালও আমরা প্রচণ্ড তর্ক করেছি। দু-তিন যুগ ধরেই তর্ক করে চলেছি। এত তর্ক, এত উত্তেজনা তাঁর লেখার বিষয় বা কাহিনীটাহিনী নিয়ে নয়, তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিশিষ্ট ভাষা নিয়ে। কমলকুমারের কোনও একটা লেখাও যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই লেখকের অদ্ভুত বাক্যবিন্যাস দেখে মুগ্ধ বা বিরক্ত বা কৌতূহলী হয়েছেন। বইয়ের উৎসর্গপত্রে বাবু অমুকচন্দ্র অমুককে বা প্রবন্ধ কী উপন্যাসের শুরুতে ঠাকুরস্মরণ— এই রকম নানা ব্যক্তিগত রীতিনীতির জটিলতায় কমলকুমার সাধারণ পাঠকের কাছে এক দুর্বোধ্য কুহেলিকা। বাক্যের গঠন এতই জটিলতাময়, এতই প্রাচীনতাময়, পাঠক পদেপদে হোঁচট খেতেখেতে শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নেন। তা সত্ত্বেও অনেক তরুণ লেখকেরই তিনি প্রিয় লেখক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা' সিরিয়াস পাঠকমাত্রই কিন্তু একবার পড়ে ফেলেছেন। 'সুহাসিনী পমেটম' নিয়ে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তখনকার তরুণ লেখকরা কমলকুমারের পক্ষে-বিপক্ষে রীতিমতো কলম ধরেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গল্পের বই 'নিম অন্নপূর্ণা'। সম্ভবত তাঁর প্রথম বই, তাঁর গদ্যও তখন কম জটিল, ও-বইটি বোধহয় সাহিত্যের মোটামুটি কোনও পাঠকও চট করে সরিয়ে রাখতে পারেনি। একটা কথা আমাদের মানতেই হবে, খাঁটি বাঙালিয়ানা বলতে সত্যিই যা বোঝায়, কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যে তা ভীষণভাবে জড়ানো। প্রাচীন ঘাটের শ্যাওলার মতন। পোড়ো মন্দিরের চটা-ওঠা কাজের মতন। বছরদশেক তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। দারুণ বিদগ্ধ, দারুণ রসিক, ফরাসিটরাসি খুব পড়া ছিল, বাঙালি জাতের সব কথাই জানতেন, সব প্রবাদ, সব প্রথা পুরো সাংস্কৃতিক গড়ন। ছবি, গান, নাট্যবোধ, তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে উলটে দেওয়ার দুঃসাহস— এত ক্ষমতা নিয়ে তিনি আমাদের খুব কাছাকাছি এতদিন বেঁচে ছিলেন সেটাই এখন অবিশ্বাস্য। অথচ সত্যিই তিনি বেঁচে ছিলেন। দারুণভাবে। শিল্পীর মতন। খালাসিটোলায় কমলকুমারের নিয়মিত সেই ঝলমল করে ওঠার সাক্ষী অনেক। তখনকার শাণিত, উন্মুক্ত কমলকুমারের মুখ থেকে অনেক সাহিত্যপ্রাণ তরুণই অনেক মণিমুক্তো কুড়িয়েছেন। তাঁর মৃত্যু— শোনা মাত্র— আমি বিশ্বাস করেছি। শান্তভাবে। এবারের জীবনে এই নিত্য অসুখী শিল্পী,আমাদের কমলদা অনেক রকম ব্যথা পেয়েছেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

যুগান্তরের সৌজন্যে

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারতকার তাঁর আঠারো-পর্ব কাব্য বলবেন মুখে মুখে, গণেশ ঠাকুর লিখে তুলবেন পুঁথি করে— এই ছিল কথা। কিন্তু যদি বলায় ছেদ পড়ে একবারও? গণেশ বললেন, তখুনি ইতি বলে উঠে পড়বেন তিনি পুঁথিপাটা ছেড়ে। তাই সই। তবে ঠাকুর, একটা ধারা জোড়া হোক— মাছিমারা নকল চলবে না, প্রত্যেকটি কথা বুঝে-পড়ে তবে লিখতে হবে। কিংবদন্তিতে পাই, তাইতেই মহাভারতের দশ পা না চলতে এত কূট আর হেঁয়ালি শ্লোকের ছড়াছড়ি। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কবি-পণ্ডিত হলেন ব্যাসদেব, তাঁর কথার জট ছাড়িয়ে গণেশঠাকুরকেও রয়ে বসে এগোতে হয়, আর সেই ফাঁকে এগিয়ে চলে লেখা।

মহাভারতের সমস্যা হল সামাজিক মানুষের ভালোমন্দের সব সমস্যা। সে হল জ্ঞানের পরীক্ষা আর জানার তত্ত্ব। কত মতো সে তত্ত্ব। ঢেকে ছেপে হেঁয়ালি করে এমনি জানার কথা বলার প্রথা ঘরে ঘরে, সর্ব দেশে। লোকের মুখে, লেখার ছত্রে তার নমুনাও জমে আছে অনেক। বৌদ্ধদের এক গল্পে পাই, মেয়ে শ্বশুরঘর করতে যাবার কালে বাবা উপদেশ দিচ্ছেন: ঘরের আগুন বাইরে নিয়ো না, বাইরের আগুন ঘরে নিয়ো না; যে দেয় তাকে দিয়ো, যে না দেয় তাকেও দিয়ো, ইত্যাদি। কী অর্থ তার? মেয়ে বুঝলে নিশ্চয়। উপনিষদের লেখাতে আছে, দেব অসুর নর ও প্রজাপতির তিন ছেলে বাবার কাছে উপদেশ চাইলে তিনজনকেই বাবা বললেন, দ দ দ— যে যার নিজের মতো অর্থ বুঝে নিলে। মহাজনের মহাজ্ঞানের কথার অর্থ তো এমনিই লোকে বুঝে পায়। আমাদের খনার বচনে নিছকই গেরস্থালির সব জ্ঞান, তার একটিতে পাচ্ছি: আঘনে পৌটি, পৌষে ছেউটি, মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া। কেমন হল? নাও, যে বোঝ সে বোঝ। পুরনো গানের পদ মনে পড়ছে: কোনখানে রয়েছে আমার বিনি ধানের খই রে, বিনি ধানের খই...।' কী সে? বাইশ বাজারে সাজা পেতে গেল নিন্দুষি লোকে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির খোঁজে বোনা পড়ছে রূপকথার গল্প— উত্তর জানার আগে গায়ে কাঁটা লাগে। আবার পুরনো বিলিতি রহস্যের বইতে পাচ্ছি: ছাগল আর ভেড়ার তফাত বুঝব কীসে? হাক ফিনের গল্পে প্রশ্ন দেখছি, মোম নিভে গেলে পরে কোথায় রইলেন তখন হজরত মুসা? কিছুতে কোন জল জমবে না? এ হল ঠাট্টার রহস্য। হেসে বলতে হয়, কেন, দেখে! গরম জল, আবার কী! কেন মোম নিভলে পর মুসা রইলেন অন্ধকারে!

গা-ছমছম আর হাসাহাসি এই দু-দিকেও হেঁয়ালির চলা। হয়তো আরও ঘন চলাচল কেননা নানা দেশে সে প্রশ্নোত্তরের একটা খেলাও বটে। কিন্তু হেঁয়ালি ইতিহাসের আর একটা ভাগ আছে তাতে বাধ্যতা, বা নির্বন্ধ—মুখোমুখি না হয়ে নিস্তার নেই। এমনি একটু নমুনাও সরাসরি আছে মহাভারতেই, যক্ষপ্রশ্ন অধ্যায়ে। দ্বৈত বনে থাকার কালে পিপাসায় অস্থির হয়ে বনবাসী পাণ্ডবেরা গেছেন জলের খোঁজে। পথে পড়ল বিমল সরোবর, কিন্তু তার পাড়ে বসে এক বক পাখি, বলছে, আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তবে যাও জল স্পর্শ করো। পাখির কথা কে শোনে। হেঁয়ালিতে কান না করে জল খেতে গিয়ে মরে পড়লেন একে একে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম, চার মহারথী। তখন এলেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। এ তো পাখি পাখি নয় তবে। সত্য তুমি কে? বলতে বলতে পাখি হয়ে দাঁড়াল পাহাড়-পর্বতের মতো বিপুলকায়, সূর্যাগ্নির মতো তীব্র রূপ এক যক্ষ। তার প্রশ্ন, যুধিষ্ঠিরের উত্তর হেঁয়ালির ছন্দে লিখে দিয়েছে।

পুরনো লেখাতে এই রকমের নির্বন্ধকারী যক্ষের লেখা আছে অনেক জায়গাতে। জাতকের গল্পে আছে নরমাংসাশী এক যক্ষের পরাজয় করেছিলেন বোধিসত্ত্ব। কালিদাসের গল্পে ভোজরাজা তাঁর নতুন পুরীতে ঢুকতে পেলেন দখলদার ভয়ানক এক যক্ষের সমুচিত উত্তর দিয়ে কালিদাস তাকে বিতাড়ন করলে পরে। নির্নিমেষ রক্তাক্ষি যক্ষীদের কথাও আছে জাতকে। বোধ করি এমনই এক যক্ষী গ্রিক পুরাণের মানুষাশী স্ফিংকস, গ্রীকদের আগের থাকতেই সিরিয়ান, ফিনিশিয়ান এবং পুরনো মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে বহু হত্যা করেছে ব্যর্থ সমাধানহীনদের; কিংবদন্তি, মহাকবি হোমারেরও মৃত্যু জবাব দিতে না পারার লজ্জায়। রাজপুত্র অয়দিপসের হাতে তার হার হল, মৃত্যুও হল। পরের দিনে গ্রিক কবিরা তাকে উল্লেখ করেছেন প্রজ্ঞাকুমারী বলে— গান গেয়ে বেড়ায় দৈব বিধানের আর হেঁয়ালির গান। অয়দিপসকে সে যা প্রশ্ন করেছিল তাতে বিশিষ্ট উদ্ভাবনা নেই, সে হল সাধারণ জ্ঞানের, বা সর্বজনীন লোকস্মৃতির কথা— মানুষের তিন কাল নিয়ে এই হেঁয়ালি পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই অনুরূপ ভাবে-বিন্যাসে মিলেছে। কিন্তু তার প্রশ্নের ধারাতে যা লক্ষ হয় তা হল, এই সব সামান্য জ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষাতে পাশ না হলে মানুষের ঢোকার অধিকার নেই তার আপন বাড়ি, বা তার উদ্দিষ্ট পুরীনিকেতনে।

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ- হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য। তাইতে বড় কবিও নানা দেশে নানা কালে ঝুঁকেছেন হেঁয়ালির পদ্য যত্ন করে লিখে তুলতে। কিন্তু সে সযত্ন রচনা কয়টি বাদ দিয়েও হেঁয়ালিতে বলার বিষয় আছে ভাষার প্যাঁচে জড়িয়ে— ধাঁধা ভাঙাও তো, পারো ভাঙাও তো— পারলে তবে মান্য বলে তোমার প্রতিষ্ঠা। মান্য লেখা আর লোকমুখের সমস্যাও অনেক ক্ষেত্রে এক ধারা। প্রসঙ্গত, 'আসব গো, যদি না আসে হঠাৎ চলে। যদি এসে পড়ে, আসব না— তাও আগেভাগে যাই বলে।'— এই ধাঁধাটির মতো জাতককাহিনীর অমরাও বলেছিল, 'যদি আসে তো আসব না, যদি না আসে তবে আসব।' তার বলবার অবশ্য বৃষ্টি নয়, বান। কিন্তু হেঁয়ালি করে বলা যেন একটা আলাদা কুশলতা— লোকের, বৃহতেরও সম্ভ্রম হয় তাতে। এককালে মানুষের পরম উপায় ছিল তার ভাষা, তার বুদ্ধির বিবেচনার কল্পনার পরীক্ষা যেন আগে সেই ভাষার কাছে। তখনও বিজ্ঞানের মনুষ্যআবেগরিক্ত গাণিতিক ভাষা ঠিকমতো তৈরি হয়ে ওঠেনি।

হেঁয়ালি একটা ছোট বিবরণ, কিন্তু নিঃসম্পর্ক, এমনকি বিপরীত তুলনা লিখে বাঁধা বলে তার গড়া-ভাঙা দু-তরফেই কবিকল্পনা রয়েছে মুখ্য স্থানে। একটা কথার চলতির ওপরে তির্যক তার ব্যবহার, তাই তার মানে ব্যুৎপত্তির চাইতে ব্যঞ্জনা-গত— তার অর্থবোধ সমস্যাভেদও কল্পনারই কৌশলে। বিশ্বচরাচরের বিস্ময়, আর সুসমাজের সদাচার নিয়ে তার প্রথম লেখা ছড়িয়ে আছে আবিশ্ব—ধ্রুপদী শাস্ত্র কাব্যের পাশাপাশি বিস্তারবিমুখ আদিমানুষের মণ্ডলীতেও একইভাবে আকাশের সূর্য-তারা-গ্রহাণুগ্রহ, চারিপাশের পশু-প্রাণী-প্রকৃতি বন্ধন, ঘরের ফল-ফসল-গৃহস্থালি, আর নিজের জীবন ও ধর্মবোধ নিয়ে অবধান সে জড়িয়ে দিয়েছে হেঁয়ালিতে। জ্ঞানী ঋষি দেখছেন প্রতিদিন শূন্যপথে দুনিয়া ঘুরে আসা এক রাখালকে, কে সে রাখাল যার আগুন জ্বলছে পরনের কাপড়ে, আগুন খসে খসে যাচ্ছে সারা পথ? বলছেন, বলো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কী চাষির? না, যে চষে বর্ষণ চায়, যে রোয় সে চায় ভালো বীজ। ধর্ম লাভ করতে হলে ছাড়তে হয় চারটি বস্তু, কী? অজ্ঞান গর্ব আলস্য দুঃখ। এ প্রশ্নোত্তর আজকে ক্যুইজের মতো যেন, যদিও তথ্যজ্ঞানের চেয়ে গভীরতর

নীতিজ্ঞান এর বিষয়। পুরনো যজ্ঞস্থলীতে দুই ঋষি বসতেন এইসব সত্যের জিজ্ঞাসা আর সমাধানে। এই মন্ত্রোপম হেঁয়ালিই আবার তুক, বশ, বধ করার, আরোগ্য করার জাদু বলে লাগত ডাকিনীতন্ত্রে— ভারতীয় যক্ষ আর যবনী যক্ষীর এমন দুটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের কথা আগেই বলেছি। আ ব রা কা ডা ব রা-র তাবিজ আরোগ্যের মধ্যযুগীয় আরেকটা জানিত সূত্র। সুজন সমাবেশেও এমন প্রশ্নোত্তরের সভা ছিল একধারে, নীতি ধর্মের স্থানে বিষয় সেখানে আমোদ, বিদ্যাবান লোকের হাতে হেঁয়ালি সেখানে হয়ে উঠত আরও কূট, আরও গূঢ়, আরও দুষ্ট প্রহেলিকা, হয়ে উঠত কারু শব্দের খেলা, তা নিয়ে তাঁরা লিখে তুলতেন কণিকার মতো উদ্ভট পদ, হেঁয়ালির ছন্দ। বিশিষ্টজনের শিক্ষণীয় চৌষট্টি কলাবিদ্যার এক কলা বলে গণ্য হয়েছিল একদা এই হেঁয়ালি-প্রহেলিকার প্রশ্ন আর পূরণ।

হালের কথা

বিদেশেও হেঁয়ালির খেলা দেখতে পাই পার্লার গেমের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিদেশের ধাঁধা-হেঁয়ালির যত সঞ্চয় আজ স্তূপিত হয়ে উঠেছে তার প্রায়টাই পুরনো লোকস্মৃতি। লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায় নি। 'ঢ্যাঙা পায়ে ছুটে আসছে গো ধাওয়া ক'রে/তাড়াতাড়ি চল, ঘরে উঠি যাই, চল', কিংবা 'মুখে আগুন হনুমান/লেজ দিয়ে জল পান'—এর ভেতর সাদাগুধো একটা লোকের দেখা বা অনুভব হয়তো হারায়নি। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে হেঁয়ালির জায়গাই, বোধ হয় হারিয়েই গেছে এতদিনে। অনেকদিন টিকেছিল ছেলেদের কাগজের শেষ পৃষ্ঠায়। কিন্তু পুরনো হেঁয়ালি ভাণ্ডারে নতুন সাজ চড়ে গেল রাতারাতি, নাম বদলে জমকালো সাইনবোর্ড পড়েছে; দি নিউ পাজল স্টোর। সে আঁটকাট বেশ পরে বেরিয়ে বলে, আর বলো কেন! আগে ছিল হেঁলি ধাঁধা সমিস্যে সতর-পঞ্চাশ, আর সে চলছে না রে ভাই! এখন চাই কে কী কীসে কেন কবে কোথায়, অর্থাৎ কিনা ক্যুইস ক্যুইদ ক্যুইদ ইতা— মানে হল গে সেই ক্যুইজ— নতুন পড়াশুনো জ্ঞানবিজ্ঞানের হরেকরকমবা...

ও সব পদ্য-মদ্য, ভাষা-বেভাষার কারচুপি, হরফ বিনুনি করে গড়া ছবিতা, কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দ— সে দিন নেই রে ভাই...

দিন বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে মানুষের চিত্ত, লক্ষ্য— সব তার বদলে গেছে, বিশ্বচরাচরের অন্ধিসন্ধি মাপ হয়ে গেছে অঙ্কে, যুক্তিতে; জীবনে বিস্ময়ই বা কোথায়? হেঁয়ালি শোনার, হেঁয়ালি খেলার সময়ই বা কই?

আর আমার কথা

পণ্ডিতে বলেন, যন্ত্র আর অর্থনীতির চাপে পিষ্ট হয়ে মরেছে সে উন্নত দুনিয়াতে, তৃতীয় বিশ্বের টিকে থাকা গাঁ-দেহাতে আজও আছে তার স্ফূর্তি। হয়তো অবলেশ আছে ঈষৎ কোথাও আত্মরক্ষা করে। কিন্তু মনে পড়ে, লোকস্মৃতির বিশ্রুত সংগ্রাহক জেমস ফ্রেজার বিলীয়মান এইসব কণিকা চূর্ণিকা নিয়ে বেদনা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন, সে আজ শতবর্ষ পার হয়ে গেল।

তা হলে চলবে— খানিকটা লোকস্মৃতি আর একটুখানি কবির লেখাতে জোড়া দেওয়া এই পদ্য-ধাঁধার সংকলন? একটা কথা তাও বলে রাখি। হেঁয়ালির পদ্যের দিকে রূপক-ছবিতে জড়াজড়ি যে বলবার কথা, সেই রূপকটুকু ফের করে লিখতে বসে তাতে একটু একটু পদ্যকারের বাহুল্য মিশে পড়েছে কোথাও কোথাও— সেই রূপকছবিরই টানে টানে। কিন্তু এসব তো বিশেষজ্ঞের সংগ্রহের জন্য নয়, হারিয়ে যেতে বসা এতটুকু প্রিয় স্মৃতি ফের ফিরে দেখার চেষ্টা, এইমাত্র। হয়তো আশা আছে এমন আরও কারও আগ্রহ রয়ে গেছে আজও কোনওখানে।

ও

॥ ১ ॥

কোন্ ক-য় বাদ্যি বাজে
          ঘরের কাছে পুজোর কাজে?
কোন্ খ তুলছে সাড়া
          সাড়া যায় বামুনপাড়া!
কোন্ গ-য় মন-মন জ্বলি,
          খেদায় তাকে অধিক-বলী।
আরো বলো কোন্ চ ঢুকে
          কাটল পা-টা চলার মুখে?
কোন্ ছ-য়ে বন ছেয়ে যায়,
          কোন্ ঝ-য়ে দিন ফুরালো?
কোন্ ট-য়ে শয্যে পেতে
          দেখি দ-য় আকাশ আলো।
মন চেপে রাখনু কী ধ।
          কোন্ ফ-তে দম যাচ্ছে ছুটে—
কোন্ ল-র বাস আমার এই
          জানলায় আসছে উঠে।
কোন্ হারে পেটটা ভরে?
          জাঁক দেখাতে চাই ক আনা?
খবরে বিমানহানা রোজ তো পড়ো,
          জানো কোন্ ফুলের হানা?

॥ ২ ॥

ক চ ট ত প
ক চ ট ত প পাঁচ বর্গ।
ক-য়ে কর্জ, খ-য়ে খড়্গ।
কর্জও ধার, খড়্গও ধার,
কার বেশি ধার? দেহ নেই কার?
খড়্গধারী কে? খড়্গধারিণী—
আপনার মাথা কাটলেন যিনি?
কোন্ বড়োলাট কর্জয় শুরু
করলেন? সেন্ট্ মাখেন কে গুরু?
ক চ ট— এ তিনে দু-দু অক্ষরে
কটা কথা পারো, লেখ তো ধাঁ ক'রে?
ক চ ট কুচুটে— দুয়ে কী মিল হে?
কিসে বা তফাত? স্বর জুড়ে নিলে
কটা কথা হবে— বলো ধ'রে ধ'রে
দু অক্ষরে, কি তিন অক্ষরে?
এবারে ট ত প— কটা কথা পাও
নানা স্বর জুড়ে, না জুড়ে— যা চাও?
স্বর জুড়ে ফেলে ক চ ট ত প-য়
মিলিয়ে-জুলিয়ে কটা কথা হয়?

॥ ৩ ॥

চার দোকান

থাকো কোন্খানে?
৮ার দোকানে।
কী কাজ করো?
৭ ১ ৩।
সঙ্গী কে আর?
৩নু দে, তার
আরো কটা ছেলে।
আর তুমি বুঝি
   সবে কাজ পেলে?
না, আরো আ৪ পা৪কারীকে
বমাল পাকড়েছিল যে ছোকরা।
তোমাকেও কিছু
   দেয় তো বখরা?
ছার-কাজ কত করে দি ওদের,
১টু-২টু পাই, সেও ঢের।
দূরে যেতে হয়?
১ ১২ ৯।
ফিরে যাবে ঘর?
নয় ৭০।
দোকানে কী খাও?
হালোয়া পোলাও।
কী খেতে আশটা?
মিষ্টি মাষ্টা।
ভাল্লাগে কী কী?
শ্লেট দাও, লিখি:
পর পর তিন আকার ইকার,
(া া া, ি ি ি)
দুটো করে আ ই, দুটো ক'রে ই আ
(া া ি ি, ি ি া া)
ব্যঞ্জন কটা পুরিয়ে নাও তো
হাতে হাতে পাবে ক পদ মিষ্টি।
ভরো তো লিষ্টি।

কাসছ বা কেন, খুক্‌খুক্ ক'রে
কেন বা হাসি!
[১]০০০ সাজায় চুলকুনি পায়
আর ৮কো না,
এবারে ৮০।

॥ ৪ ॥

ভার নেই, গায়ে জোর নেই, জোর ক'রে
কেউ তাকে তবু রাখতে পারো না ধ'রে।

॥ ৫ ॥

যত বেলা তুমি জানো না, আমি কে,
আছি, দেখ, থেকে যাবও জমিয়ে।
পরিচয়টুকু জেনে যাবে যেই—
আমি আর নেই, আর আমি তো নেই।

॥ ৬ ॥

ছোটো ছেলেটার খবরদারি
এ বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি,
এ মুড়ো থেকে ওই ও পাড়ায়
সময় নেই সে একটু দাঁড়ায়,
দোকান-হাটে নদীর ঘাটে
ভোর কাটে তার দুপুরও কাটে,
যাচ্ছে শহর যাচ্ছে গ্রাম—
এক ফোঁটা নেই বিশ্রাম,
শঙ্কা নেই চম্‌কা নেই,
রাত্রে ঘুমোয় বাইরেতেই।

॥ ৭ ॥

নীল-টলোমল ঢেউহারা জল
মস্ত সরোবর,
মাঝ দিয়ে তার যায় ভেসে এক
লাল-রঙা পাথর।
যায় ভেসে তার লালের রেশে
আগুন ফোটে জলে,
জল-টলোমল মাঝ দিয়ে লাল
পাথর ভেসে চলে।

॥ ৮ ॥

থ্যাবড়া-থ্যাবড়া গোলগাল মুখ।
গাল গেল কই? কই গো চিবুক?
কান দুটো কই? ঘাড়টা কোথায়?
নাক ঘুরিয়ে সে চার ধারে চায়।

॥ ৯ ॥

গহন বন-প্রান্তরে
হাজার হাতির পাল চরে।

॥ ১০ ॥

রাজার মোহর ছড়ানো— গোনা না যায়!
রানীর মাদুর পাতা, সে গোটানো দায়!

॥ ১১ ॥

সাত সাগরের আর পারেতে রামচন্দ্র নিজের হাতে
পুঁতেছিলেন গাছ, নিমিষে ছাইল সে গাছ ডালপালাতে।
তরতরিয়ে বাড়ল সে গাছ— ধরল গিয়ে মেঘের ঝুঁটি,
আকাশ ছুঁয়ে সোনা-রুপো ফল হল তার কেবল দুটি।

॥ ১২ ॥

মাঝ-সমুদ্রে জন্ম নিয়েছে
পক্ষীরাজ।
আকাশে আকাশে মেলেছে পাখা সে
এখুনি আজ।
ওড়ার সময় পরে নিয়েছে সে
জরীর সাজ।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘাম ঝরে গায়
দর্‌দর্!
নীচে নেবে যায়, চারি ধারে ওঠে
ধর্! ধর্!
ঝাঁপ দেয়— হাওয়া-লুটোপুটি গাছ-
পত্তর!

॥ ১৩ ॥

দেখে সে দূর— দেখে সে কাছ—
দেখে আলোয় হাওয়ার নাচ—
দেখে দু-পাশ— উপরে-নীচে—
দেখে না খালি নিজেকে নিজে!

॥ ১৪ ॥

গোটা গাঁ-খানার মাথায় টাঙানো
পেল্লায় এক চাঁদোয়া—
কেউ সে তোলে না, গুটোয় না কেউ—
না ঝাড়, না পোঁছ, না ধোয়া!
পোড়া ধোঁয়া সয়ে, বাতি পোড়া লেগে
কভু হাসে, কভু কাঁদোয়া—
তেল-সিঁদুরের রঙ লেগে তবু
চিক্‌চিক্ করে চাঁদোয়া!

॥ ১৫ ॥

কলাবতী গাছ, পাঁচ ফুল ছোটো-বড়ো,
অমর্ত ফুল— এক জোটে আছে জড়ো।
পাঁচ-নামা ফুল একই গাছে আলো করা,
ঝরে না সে ফুল— ঝড় দিক, হোক খরা!
কেউ বাদ নয়, সবারই আপনা গাছে
ফুটে আছে ফুল; দেবরাজা, তাঁরও আছে।

॥ ১৬ ॥

এইটুকু ছেলে— বড়ো বড়ো গাছ বেয়ে যায়;
চিনিটা-মিনিটা যাই রাখো ঘরে, খেয়ে যায়।

॥ ১৭ ॥

ঝাড়ছে কুলো, উড়ছে কুঁড়ো,
মাঝখানে এক রুপোর চুড়ো।

॥ ১৮ ॥

ওপরে কাঠ তার নীচেও কাঠ,
ভেতরে ঠাকুরের আসনপাট।

॥ ১৯ ॥

রেতের বেলায় ফুটে ওঠে ফুল, কী সুখ, সুখ!
দিনমানে ফুলে মধু ভিজে ওঠে, আহা ভিজুক!
জুড়িয়ে দিল রে গা-গতর— আহা জুড়িয়ে যায়!
কোথায় সে ফুল? কোথায় সে? সব হেদিয়ে চায়—

॥ ২০ ॥

এই আছে, এই নেই, জুঁইবাজির ঝাড়।
রাজাকে যে বলে এলুম, কী দেখাব তার!

॥ ২১ ॥

জল-টলটল জল-টলটল কালো দিঘির জল—
মাঝখানে এক রানী হাঁসের সাঁতার কাটার ছল!
ডাকলেও না তাকায় সে হাঁস, ডাকলেও না থামে,
একবারে সে উঠবে গিয়ে বৃন্দাবনধামে।

॥ ২২ ॥

গন্ধে ম-ম করছে ঘর,
দেখি ও কী ফুল— একটু সর্!
ও মা এ যে দেখি সোনার ঘণ্টা!
আলো করে আছে ঘরের কোণটা।
শরীরটি তো কাঁটায় মোড়া,
ভেতরটিতে মধু পোরা।

উত্তর

(১) ঢাক শাঁখ রাগ ভাগ্ কাঁচ ইত্যাদি। (২) গণ্ডার ছিন্নমস্তা কর্জন অগুরু ইত্যাদি। (৩) আটার দোকান ইত্যাদি। (৪) দম। (৫) ধাঁধা। (৬) পথ। *আইরিশ।* (৭) সূর্য। *বিহারি।* (৮) ঘড়ি। *আইরিশ।* (৯) উকুন। *মারাঠি।* (১০) তারা, আকাশ। *কন্নড়।* (১১) সূর্য আর চাঁদ। *মারাঠি।* (১২) মেঘ। *কন্নড়।* (১৩) চোখ। *মারাঠি।* (১৪) আকাশ। *তেলেগু।* (১৫) হাত, পাঁচ আঙুল। *কন্নড়।* (১৬) পিঁপড়ে। *মারাঠি।* (১৭) তারা, আর চাঁদ। *মারাঠি।* (১৮) কাঠবাদাম। *হিন্দি।* (১৯) শয্যা। *কন্নড়।* (২০) বিদ্যুৎচমক। *অসমিয়া।* (২১) চাঁদ। *আইরিশ।* (২২) কাঁঠাল। *মারাঠি।*

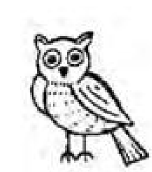

চেঙ্গিস খানের দেশে

প্রতাপকুমার রায়

সুখবাটার স্কোয়্যারে সুখবাটারের মূর্তি

সাতানব্বইয়ের অক্টোবরে আমরা মোঙ্গোলিয়ার উলানবাটোর গিয়েছিলাম। আমাদের টিকিট হয়েছিল থাই এয়ারওয়েজে ব্যাংকক, সেখান থেকে কোরিয়ান এয়ারে সোল (Seoul)। সোল থেকে কোরিয়ান এয়ারওয়েজের অন্য ছোট প্লেনে উলানবাটোর।

ব্যাংককে, সোলে মালপত্র ডেলিভারি নিয়ে আবার অন্য প্লেনে ওঠা বড় হয়রানির কাজ। তাছাড়া সোলে আমাদের প্লেন বদলাবার সময় ছিল খুব কম।

কলকাতা এয়ারপোর্টে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের মোটঘাট কি সোজা বুক করা যাবে উলানবাটোর পর্যন্ত?

যিনি আমাদের চেক-ইন করছিলেন, এয়ারলাইন্সের কর্মী, চমকে উঠেছিলেন। বললেন, উলানবাটোর? সে কোথায়?

পরে বলেছিলেন, চোদ্দ বছর এই কাজ করছি মশাই, কেউ উলানবাটোর যাচ্ছে বলে কখনও শুনিনি।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমরা এই না-জানা শহরে যাচ্ছি কেন? অনেক শহর তাদের নামেই আমাকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণে যাবার ইচ্ছা ছিল ইরকুটস্ক, আলমাআটা, উরুমচি। দিল্লি থেকে কাজাখস্তানের আলমাআটার বিমান যেত একসময়। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম কাজাখস্তানে যাবার ভিসা পাওয়া যায় না। ওখান থেকে কেউ আপনাকে নিমন্ত্রণ না পাঠালে ভিসার দরখাস্ত নেওয়াই হবে না।

অতএব স্থির হল উলানবাটোর। 'ভ্রমণ' সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে ইউরোপে এক সংবাদপত্র-সম্মেলনে উলানবাটোরের এক মহিলার পরিচয় হয়েছিল। অমরেন্দ্রর অনুরোধে তিনি একটা নিমন্ত্রণবার্তা পাঠিয়েছিলেন। শহরে হোটেলও ঠিক করে দিয়েছিলেন।

যাতায়াত কোন পথে সুবিধা হয়, এখান থেকে সব খবর পাওয়া যায় না। কলকাতা-ব্যাংকক-সোল-উলানবাটোর ছাড়াও অন্য পথে, কলকাতা-ব্যাংকক-বেজিং-উলানবাটোর, যাওয়াও সম্ভব ছিল। এখবরটা আমরা যাত্রার পূর্বে জানতাম না।

মোঙ্গোলিয়া যাবার অন্য কারণও আছে। নৃতত্ত্ববিদেরা সারা পৃথিবীর মনুষ্যকুলকে কয়েক গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের অধিবাসী মোঙ্গোলয়েড। এমনকী আমাদের পার্বত্য ভারতীয়দের মধ্যেও মোঙ্গোলয়েড ছাপ পাওয়া যায়।

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম, মোঙ্গোলীয়রা যাযাবর প্রকৃতির। কোথাও স্থায়ী আস্তানা করে না। তাঁবুতে বাস করে। পশুপালন তাদের প্রধান কাজ। ইচ্ছেমতো তাঁবু ও তাদের ঘোড়া-ভেড়া-ছাগল নিয়ে অন্য চারণক্ষেত্রে চলে যায়। ঘোড়াই তাদের একমাত্র বাহন। মোঙ্গোলীয়রা অত্যন্ত দক্ষ অশ্বারোহী।

মোঙ্গোলিয়া ছোট দেশ নয়। আয়তনে ভারতবর্ষের অর্ধেক। অথচ জনসংখ্যা ছাব্বিশ

লক্ষ মাত্র। তারমধ্যে ছ-লক্ষের বাস উলানবাটোর শহরে।

এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী থেকে দুই 'খান' একদা অর্ধেক পৃথিবী জয়ের পথে এগিয়েছিলেন। চেঙ্গিস খান ও তাঁর নাতি কুবলাই খান। খান মানে শাহানশাহ বা সম্রাট। পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এত বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে সাম্রাজ্যের আর কোনও উদাহরণ নেই।

আমরা উলানবাটোরে নামলাম, তখন ভরা দুপুর। আমাদের যাত্রার সময়টা যে ভুল ছিল সেকথা প্লেন থেকে নেমেই হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছিলাম। এতটা ঠান্ডা হবে অনুমান করিনি। তাপাঙ্ক চার বা পাঁচ ডিগ্রি। ওভারকোট চড়াবার সিকি মিনিট সময়েই জমে গিয়েছিলাম। উলানবাটোরেও এয়ারপোর্ট ও প্লেনের সংযোগের চলমান বাহু আছে। সম্ভবত নামার সময় ব্যবহার হয় না। আমাদের প্লেন থেকে হেঁটে এয়ারপোর্টে ঢুকতে হল।

কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনে সময় লাগল না। বাইরে বেরিয়ে আশা করে তাকিয়ে ছিলাম। হয়তো কেউ আসবে। আসবার কথা নয়। শ্রীমতী নারানজারগাল, অমরেন্দ্রর বন্ধু, আমাদের হোটেল ঠিক করে দিয়েছেন। তারপরই তিনি ইউরোপে চলে গিয়েছেন। হোটেলের নাম জানি। একটা ট্যাক্সি যোগাড় করতে পারলে হোটেলের পথে রওনা হতে পারি।

এক তরুণী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ছোটখাটো মানুষটি, সঙ্গে সুদেহী, দীর্ঘ এক পুরুষ। মহিলা ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন আমি মিঃ রায়, কিনা। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না। ছোট প্লেনে এসেছি সোল থেকে। বেশি যাত্রী ছিল না প্লেনে। সবই মোঙ্গোলীয় চেহারা। আমাদের মতো কৃষ্ণকায় আর্য কোথাও নেই।

তরুণী আমাদের ইন্টারপ্রেটর, দোভাষী। তাকে পেয়ে খুব আশ্বস্ত হলাম। সঙ্গের পুরুষটি গাড়ির চালক। অবলীলায় আমাদের সুটকেস দুটি তুলে নিয়ে গাড়িতে পৌঁছে দিল। তরুণীর নাম ইয়াডমটসু। অমরেন্দ্রর বন্ধু শ্রীমতী নারানজারগাল লিখেছিলেন মোঙ্গোলিয়াতে আমাদের ইন্টারপ্রেটর লাগবে। তিনিই মেয়েটিকে নিযুক্ত করেছিলেন। পারিশ্রমিক দৈনিক ত্রিশ ডলার। তিনি চালক সহ নিজের গাড়িটিও আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। আমরা যে কদিন থাকব, ব্যবহার করতে পারব।

এইবার চারপাশ দেখবার অবকাশ হল। আমরা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে রয়েছি। বহু দূরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে তিনদিকে। তৃণলেশহীন, একটা গাছ নেই কোথাও, নিরলংকার, চরাচরে অপার বৈরাগ্যের চেহারা। তার সঙ্গে প্রায় বেমানান পরমাশ্চর্য নীল আকাশ। সমস্ত রাস্তায়, আধঘণ্টার, বিশেষ বাড়িঘরও নেই, কয়েকটা অফিসবাড়ি, একটা ছোট কারখানা। বৃক্ষহীন প্রান্তরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পথ জনহীন। কদাচ, দুয়েকটা গাড়ি বিপরীতমুখী। সব জানালা বন্ধ, আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না। একটা নদী পেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষাকৃত ঘন বসতি দেখা গেল। তারপর, আবার এক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এসে নিঃসঙ্গ দুটি বারোতলা বাড়ি দেখতে পেলাম। এই দুই বাড়ি নিয়ে আমাদের হোটেল বায়ানগোল। হাওয়া দিচ্ছে শনশন, অতি শীতল হাওয়া।

এই যে এখন শীতের প্রারম্ভে দিগন্তব্যাপী ধূসর রিক্ত ছবি, এমন চলবে মে মাস পর্যন্ত। তার আগেই জমিতে রং ধরতে শুরু করবে। কল্পনা করছিলাম, আদিগন্ত নির্বাধ সবুজ, যত দূর চোখ যায়, না জানি কী অপূর্ব রূপ হবে তখন। এই হল মোঙ্গোলিয়া। বছরে নমাস শীত, তিনমাস গ্রীষ্ম। সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে, পুবে ও পশ্চিমে চিন।

দোভাষী মেয়েটির কেন দরকার, প্রত্যহ ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে, ক্রমশ বুঝতে পারছি।

বড় হোটেলের মধ্যে বায়ানগোল দ্বিতীয়। বিদেশিদের বেশ যাতায়াত আছে। এখানেও কেউ ইংরিজি বলে না। যারা হোটেলের অভ্যর্থনার কাউন্টারে, তারাও ভাঙা ইংরিজির বেশি বলতে পারে না। সব কথা, অন্তত আমাদের উচ্চারণে, বুঝতেও পারে না। বুঝতে পারলাম দোভাষী না পেলে এই তৃণহীন, বৃক্ষহীন দেশে বাকাহীন থাকতে হত।

আমাদের হোটেলটি ভালো। দুজনের জন্য দৈনিক একশো ডলার। শ্রেষ্ঠ হোটেলটি খুবই ভালো। দাম কিছু বেশি। এখানে সব ভালো জিনিসেই চেঙ্গিসের নাম। বড় হোটেলের নাম চেঙ্গিস হোটেল, শ্রেষ্ঠ ভদকার নাম চেঙ্গিস ভদকা। বৃহত্তম রাস্তার নাম চেঙ্গিস অ্যাভেনিউ। হোটেলের লাউঞ্জ ছোট। কিন্তু বাসকক্ষ প্রশস্ত। সুখের সব উপকরণ মজুত। এমনকী, এখন যা সর্বত্র প্রচলিত, ঘরে একটি ইলেক্ট্রিক কেটলিও আছে। নিজের চা তৈরি করে নেবার জন্য।

হোটেলের ভোজনশালায় সেদিন দ্বিপ্রহরে লাঞ্চ করে দোভাষীকে ছেড়ে দিলাম। একটু বিশ্রামের দরকার। সে আমাকে একটা প্রোগ্রাম ধরিয়ে দিয়ে গেল। শ্রীমতী নারানজারগাল আমাদের জন্য সাতদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম করে দিয়ে গিয়েছেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চা করতে গিয়ে আমার স্ত্রী আবিষ্কার করলেন দুধ, চিনি ও কফির ছোট ছোট প্যাকেট আছে, চা নেই। অনুমান করলাম চায়ের প্যাকেট রাখতে ভুলে গিয়েছে। নীচে রিসেপশনে টেলিফোন করে অনুযোগ বোঝাতে অনেক সময় লাগল। রিসেপশনের মেয়েটি সব কথার শেষে খালি

এতক্ষণে শেষ দর্শকও চলে গেল, অপেরা হাউসের মস্ত বড় বড় দরজা খুব শব্দ করে বন্ধ হয়ে জায়গাটা নিথর নিঝুম। তারমধ্যে আমি শীতে কাঁপছি। আমাদের মাথার ওপর আলো জ্বলছে, কিন্তু সামনেটা নিরেট অন্ধকার। এবারে সে আলোও নিভে গেল, দুটি ছোট আলো ছাড়া। ইয়া বলল, আরেকবার ড্রাইভারকে খুঁজে আসি। কোথায় যেতে পারে? চলে যেতেই আমার শীতের কাঁপুনি আরও বাড়ল। অচেনা দেশে, জনহীন প্রান্তরের অন্ধকারে, বিশাল অট্টালিকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি নানা দুর্বিপাকের কল্পনা করতে লাগলাম।

বলে, নীচে আসুন, এখানে পাবেন।

নীচেই যেতে হল শেষপর্যন্ত। মেয়েটি বোঝাল এই হোটেলে চায়ের প্যাকেট দেওয়া হয় না। আমরা যদি চাই, তাহলে বাইরে প্রায় দুটো ফুটবল মাঠ পার হয়ে যে কয়েকটি দোকান দেখা যাচ্ছে সেখানে পেতে পারি। তখনও বেশ রোদ রয়েছে, যদিও হিমশীতল হাওয়া বইছে শনশন করে।

মস্ত বড় মাঠের মধ্যে পাঁচ-ছটি স্বতন্ত্র ছোট ছোট দোকান। কাঠের ঘর। কেবিন বা কিয়স্ক বলা যায়। হাড় জমানো হাওয়ার প্রকোপে দোকানদার ছোট্ট একটা ফোকরের ওপর কাচ নামিয়ে দিয়ে কেবিনের ভেতরে বসে। খদ্দের এলে কাচ তুলছে। বাইরের শোকেস দেখে অনুমান করতে হয় কিসের দোকান। আমরা একটা দোকানের মানুষটিকে আমাদের প্রয়োজনের কথা বললাম। সে নির্বিকার তাকিয়ে থাকল। অনেক চেষ্টা করলাম বোঝাবার, কিন্তু কিছুই হল না। দ্বিতীয় দোকানেও ব্যর্থ হলাম। তৃতীয় দোকানের বিক্রেতাও আমাদের হাঁকিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেলাম ভেতরের শেলফে লিপটন ছাপ মারা প্যাকেট। টি ব্যাগ। এক বাক্স কিনে হোটেলে ফেরবার আগে জলও দু বোতল নেওয়া হল। এক বোতল জলের দাম পনেরোশো তুগরুক, অর্থাৎ প্রায় দু ডলার। ভেবে আশ্বস্ত হলাম এই ঠান্ডার দেশে বেশি জল খাবার প্রয়োজন হবে না।

মোঙ্গোলিয়ার জল যে নির্ভয়ে পান করা যায় না, সোল থেকে প্লেনে আসবার সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম। প্লেনে প্রত্যেক আসনের সামনের পকেটে, এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল, এক বোতল মিনারেল ওয়াটার। জিজ্ঞাসা করতে এয়ারহোস্টেস বলেছিল, মোঙ্গোলিয়ার জল না খাওয়াই ভালো।

আসলে মোঙ্গোলিয়ায় জল খাবার রেওয়াজ নেই। অন্যতম পানীয় হল ভদকা। তাছাড়া বিয়ার এবং স্থানীয় সস্তার মদ্য এদের পিপাসা নিবারণের পানীয়। ঘোড়ার দুধ থেকে চোলাই করা মদ কুমিস সাধারণ মানুয়ের প্রিয় পানীয়।

আমরা আটদিন থাকব এদেশে। প্রথমদিনটা তো কেটেই গেল। দ্বিতীয়দিন থেকে আমাদের প্রোগ্রামের শুরু।

নিজের ঘরের উষ্ণ পরিবেশ ছেড়ে সন্ধ্যার পর আর কোথাও যেতে মন চাইল না। হোটেলের ভোজনশালাতেই ডিনার সম্পন্ন করা গেল। সেই বিনা মশলার ইউরোপীয় খাদ্য। স্বাদ চেনা, নামও চেনা। আশ্চর্য, হোটেলে কোনও মোঙ্গোলিয়ান খাবার পরিবেশিত হয় না। ভোজনকক্ষের পরিচারক ইংরিজি বুঝতে পারে। কিছু বলতেও পারে। বলল, মোঙ্গোলিয়ান পদ চাইলে নীচের বায়ানগোল রেস্টুরেন্টে যেতে হবে। এই বিশাল রেস্টুরেন্ট সম্পূর্ণ গোলাকার ছাদের নীচে, হোটেলের দুই বাড়ির মাঝখানে। গোলাকার ভোজনশালা বলে নাম বায়ানগোল, তা কিন্তু নয়। বায়ান মানে ঐশ্বর্যময়ী, গোল মানে নদী। আমাদের হোটেলের ইংরিজি নাম হতে পারত রিচ রিভার।

বায়ানগোল রেস্টুরেন্টে পরে অনেকবারই গিয়েছি। সেখানেও মোঙ্গোলদের নিজস্ব ভোজ্যের সংখ্যা নগণ্য। আসলে, সম্পূর্ণ মেনু কার্ডটিই ছোট। বেশি পদের আয়োজন নেই।

যেহেতু আমি খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত, অমরেন্দ্রর বন্ধু তাই আমার জন্য যে প্রোগ্রাম করেছেন তাতে সংবাদপত্র অফিস পরিদর্শনের প্রাধান্য। ভদ্রমহিলা নিজেও পরোক্ষে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত। তাঁর একটি বড় ছাপাখানা আছে। সেখানে পাঁচ-ছটি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র ছাপা হয়। সর্বপ্রথম তাই দেখতে গেলাম দ্বিতীয়দিন সকালে।

মোঙ্গোলীয়রা সাজসজ্জা ভালোবাসে। মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক গোলাপি রঙের ওপরও রং চড়ায়। মেয়েদের চুল দীর্ঘ এবং নিকষ কালো। এখন শীত পড়েছে, স্ত্রী-পুরুষ সবাই গামবুটের মতো জুতো পরেছেন। এখানে চামড়া সহজলভ্য এবং সস্তা, তাই ভালো জুতো পরার বিলাসিতা এদের ছাড়তে হয় না।

নটার সময় প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আটটা না বাজতেই দোভাষী পৌঁছে গেল। মেয়েটির চেহারা সাধারণ মোঙ্গোলিয়ানদের সঙ্গে মেলে না। ছোট হালকা শরীর, কচিমুখ। আজ সকালে মাথায় প্লাস্টিকের ফুল। কালো ভারি পশমের জামার ওপর কালো ওভারকোট। আমরা তখনও ব্রেকফাস্টে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। মেয়েটি অধীর পায়চারি করছে। বললাম, এখনও তো অনেক সময় আছে। ইয়াডমটসু বলল, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো, যদি দেরি হয়ে যায়।

দোভাষীর নাম উচ্চারণ করা সহজ নয় বলে, সে নিজেই বলল, নামের প্রথম অংশটা উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ ইয়া। পরে ইয়া নামেই তাকে ডাকা হত।

মেয়েটি ইংরিজি ভালো বলে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর, এক বছর ইংরিজির ক্লাস করেছে। সাধারণ পর্যটকের জন্য তার জ্ঞান যথেষ্ট। কিন্তু আমরা তো সাধারণ নয়। শ্রীমতী নারানজারগাল আমাদের এমন গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমরা গুরুগম্ভীর বাক্যালাপ না করলে তাঁর মান থাকবে না। বিভিন্ন কাগজের অফিসে যাব, সম্পাদকদের সঙ্গে মিটিং হবে, যথার্থ কথা না বলতে পারলে, কঠিন প্রশ্ন না করলে আমার নিজের সম্পাদকত্বই বা থাকবে কোথায়?

প্রথম প্রশ্ন করেই হোঁচট খেতে হল। এখানে সংবাদপত্র কি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন? ইংরিজি প্রশ্নে ফ্রি কথাটি যোগ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ ইয়া বলল, না না আদৌ ফ্রি নয়। সব কাগজের দাম লাগে।

ভুল শোধরাবার জন্য বললাম, সরকারি কোনও বাধানিষেধ নেই? উত্তর শুনলাম, না, যার যেমন ইচ্ছা দাম রাখতে পারে।

অকারণ আর বাক্য বাড়াইনি।

শ্রীমতী নারানজারগালের অফিস খুব বড় কিছু নয়। একটি অফসেট রোটারি আছে। ম্যাগাজিনগুলি মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। নারানজারগাল নিজেও একটি সাপ্তাহিকপত্র শুরু করেছেন, খুব বিক্রি হয় মনে হল না। অফিসের মানুষগুলি ভালো। হাসিমুখে চেয়ে থাকে, কথা হয় না। সমস্ত অফিসে মাত্র একজনই ইংরিজি বলতে পারে। একই বাড়িতে আরও কয়েকটি অফিস। তার মধ্যে একটি হল প্রেস ইনস্টিটিউট। ডিরেক্টর ইংরিজি ভালো বলেন। বিদেশে নানা সেমিনারে গিয়েছেন। পৃথিবীর খোঁজখবর রাখেন। তাঁর কাছে শুনলাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর মোঙ্গোলিয়ার পুনর্জন্ম হয়েছে। দেশে বিশেষ কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। পশুপালন এবং কোনও কোনও অঞ্চলে চাষ-আবাদের ওপর নির্ভর করত মোঙ্গোলিয়ার অর্থনীতি। ১৯৯০ সালে প্রথম সোভিয়েত আওতার বাইরে মোঙ্গোলিয়া স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ঘোষিত হয়। একদলীয় রাজনীতির শেষও হয় তখন। এখন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। বহুদলীয় প্রথম নির্বাচনে পুরাতন কমিউনিস্ট পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ৭৬ সদস্যের পার্লামেন্টে।

তখন কথাটা মনে হয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ৭৬ সদস্যের মধ্যে মাত্র সাতজন মহিলা নিয়েই সন্তুষ্ট মোঙ্গোলিয়ার মানুষ। পরে একজন মহিলা সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি দেশের শাসনব্যবস্থায় মহিলাদের স্থান নেই বলে আক্ষেপ করেছিলেন। তিনিও শতকরা তেত্রিশজন সংরক্ষণের কথা বলেননি। আশ্চর্য এই যে, মোঙ্গোলিয়া প্রায় পূর্ণ সাক্ষর দেশ। কাগজপত্রে দেখেছি, মোঙ্গোলিয়ার সাক্ষরতার হার শতকরা পঁচানব্বই। সংখ্যাটায় কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডেনমার্কের এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এদেশে গ্রামোন্নয়নের কাজ করছিলেন। তিনি বললেন, এদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পঁচানব্বই পারসেন্ট সাক্ষরতা অবাস্তব। আসলে পঁচাশি পারসেন্ট হবে। মেরেকেটে নব্বই।

সাক্ষরতায় যারা এত এগিয়ে সেদেশে খবরের কাগজের প্রসার নেই কেন? ডিরেক্টর বললেন, সেদিন পর্যন্ত সার্বভৌম মোঙ্গোলিয়া

গঠনের পরও কমিউনিস্ট প্রাধান্যে সংবাদপত্রের ওপর নানা বিধিনিষেধ ছিল। সবে দুবছর হল অকমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর খবরের কাগজ সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছে। এখন পঞ্চাশ-ষাটটি সাময়িকপত্রের নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। তার মধ্যে চারটি দৈনিক কাগজ।

এইসব দৈনিকপত্রের অফিসেই আমাকে যেতে হয়েছিল। সাপ্তাহিকেরও কয়েকটি অফিসে গিয়েছি। আমাদের তুলনায় এখানকার পত্রপত্রিকা অতিসাধারণ। বিক্রিও বিশেষ নেই। তার অবশ্য অন্য অন্তরায় আছে। প্রকাণ্ড দেশ, যানবাহন নেই পর্যাপ্ত, বাঁধানো রাস্তাও অল্প। তার ওপর, এক লাখের ওপর জনসংখ্যার শহর মাত্র চারটি। সেখান থেকে দুটি-চারটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। শহরের বাইরে কোনও কাগজের বিক্রি নেই বললেই চলে। উলানবাটোরের নিকটতম বড় শহর দুশো কিলোমিটার দূর।

সেদিন দ্বিপ্রহরের ভোজন হল নারানজারগালের অফিসের ক্যান্টিনে। মোট ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন কর্মীর জন্য ক্যান্টিন। আহারাদির ঘটা নেই। সবাই এক বাটি নুডল খাচ্ছেন। নুডলে ছোট মাংসখণ্ড এবং কিছু সবজি মেশানো। আমাদের জন্য বিশেষ খাবার, ফ্রায়েড রাইস এবং মাংসের কাবাব। ফ্রায়েড রাইস চলনসই। বিনি মশলার ভোজ্যে যেমন স্বাদ হবে কাবাবের স্বাদ তেমনই। তবে ঝলসানোর সুগন্ধ ছিল। জলের বদলে আমাদের জন্য স্প্রাইট বা কোকাকোলা। ভোজনান্তে মস্ত বড় বাটিতে করে সুপের ধরনের কিছু এল। নাম শুনলাম সুখে ছ্যা। অর্থাৎ দুধের চা। ছ্যা শব্দটা জানা ছিল না বলে কাল চা কিনতে গিয়ে এত হেনস্থা। সুখে ছ্যা-ও আমাদের অন্যভাবে হেনস্থা করেছিল। চা-এ চিনির বদলে নুন দেওয়া। শুনেছিলাম তিব্বতিরাও নাকি নুন-যুক্ত চা পান করে। তারা আরও একটু বেশি, দুধের বদলে মাখন যুক্ত হয় চা-এ। দুপুরটা আমাদের ছুটি। সকালে কিছুক্ষণ উলানবাটোরের ম্যাপ দেখেছিলাম। খুব ছড়ানো শহর, জনসংখ্যার পক্ষে। বাস চলাচল করে ঘনঘন। একদা-অশ্বারোহীদের কাউকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখলাম না। এমনিতে অফিস অঞ্চল ছাড়া, সর্বত্র মানুষজন কম।

নারানজারগালের গাড়ি ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়ে আমাদের ভারি সুবিধা হয়েছিল। ক্যামেরার জন্য ব্যাটারি কোথায় পাওয়া যাবে দোভাষী বলতে পারলেন না। ড্রাইভার বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে একটা মস্ত দোকানে নিয়ে গেল। মূল্যবান ক্যামেরা, ভিডিওর যন্ত্রাদি, সাউন্ড সিস্টেম, কী নেই। দোকানটা যেন উলানবাটোরের সঙ্গে মেলে না। একেবারে

উলানবাটোরে যুদ্ধের শহিদস্মারক

সর্বাধুনিক। কেনাকাটাও হচ্ছে খুব। রাতে আমাদের অপেরা দেখবার প্রোগ্রাম। পাঁচটার সময় এসে ইয়া আমাদের নিয়ে গেল।

মনে করেছিলাম অনেক দূরে যেতে হবে। তা নয়। সুখবাটার স্কোয়্যারের পিছন দিকে। মিনিটদশেক লাগল। শো আরম্ভ হবে ছটায়। তাহলে এত তাড়াতাড়ি এলাম কেন? ইয়া বলল, যদি দেরি হয়ে যায়, তাই। তখনই অবশ্য অনেকে আসতে আরম্ভ করেছে। অপেরা বাড়িটার বাইরের বারান্দায় এক সার গ্রিক করিন্থিয়ান স্তম্ভ। তারপর চওড়া বারান্দা পার হয়ে প্রবেশদ্বার। এটি জাতীয় সম্পত্তি। অপেরা এবং ব্যালে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রত্যহই কিছু না কিছু অনুষ্ঠান থাকে। ভেতরটাও বেশ মনোজ্ঞ। ইউরোপিয়ান অপেরা হাউসের মতো লাল ভেলভেটে মোড়া নয়। পিছনের অংশ দোতলা। আমরা বিশিষ্ট আসন পেয়েছি, আমাদের জন্য বক্স। বক্সে আসীন হয়ে নীচে দর্শকদের আনাগোনা দেখছি। সবাই বেশ সাজগোজ করে এসেছেন। অনেকের আপাদমস্তক চামড়ার জামা। মেয়েদের সুগৌর বর্ণে লালের ছোঁয়া, মাথাভর্তি ঘন কালো চুল। সবার পায়েই গামবুট।

ইতিমধ্যে আমার শীত করতে আরম্ভ করেছে। বুঝতে পারলাম প্রেক্ষাগৃহে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। ওভারকোট বাইরে রেখে আসা ভুল হয়েছে। আমাদের বক্সের তিনটি খালি চেয়ারে এবারে দুজন অনুচর নিয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসন নিলেন। তাঁর গায়ে আজানুলম্বিত ওভারকোট। আমি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। তিনি মনে করলেন কথা বলতে চাইছি। তিনিও অনেক কথা বললেন, যার বিন্দুবিসর্গ আমরা বুঝতে পারলাম না। আমাদের দোভাষী তাঁকে কী বলার পর তিনি কথোপকথনে নিরস্ত হলেন। ইতিমধ্যে অপেরা শুরু হবার আগে অর্কেস্ট্রা

শুরু হয়েছে। এই দৃশ্যটা বড় সুন্দর। সুন্দর পোশাকে কন্সার্টের প্রত্যেকটি শিল্পী সুসজ্জিত। কন্ডাক্টারের হাত ও মাথা নাড়ার সঙ্গে বাজনা বাড়ছে, আবার কখনও কানে কানে কথা বলার মতো একান্ত হয়ে উঠছে।

অপেরার কাহিনী ইয়ার কাছে আগেই শুনে নিয়েছিলাম। প্রণয়ীযুগল যখন সুখের সপ্তম স্বর্গে, তখনই মঞ্চে আবির্ভাব অত্যাচারী শাসকের। লুণ্ঠিতা নায়িকার সন্ধানে প্রণয়ী অরণ্য, মরুপ্রান্তর পার হয়ে পাপিষ্ঠ শাসককে হত্যা করে প্রেমিকাকে উদ্ধার করলেন। যতক্ষণ নৃত্যগীত চলছিল, শীতের প্রকোপ ভুলে ছিলাম। অনুষ্ঠান শেষ হতেই শীত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। প্রেক্ষাগৃহ এত ঠান্ডা? অথচ অন্য কারও সামান্যতম কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না। আমার পাশের দীর্ঘ ওভারকোট পরা পদাধিকারী উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বিদায় নিলেন। আমি কাঁপতে লাগলাম। দরজার সামনে ভিড়, উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছে, মানুষের চোখমুখে প্রশংসার আলো। ভিড় আর এগুতেই চায় না। আমি ওভারকোটের কাছে পৌঁছবার জন্য ব্যাকুল। অবশেষে ওভারকোট পাওয়া গেল। যেন পরশমণি পেলাম। ওভারকোটের উত্তাপ প্রাণমন দিয়ে সেবন করতে করতে ভেতরের বারান্দা পার হয়ে বাইরের বারান্দায় পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল বাতাস যেন ধাক্কা দিয়ে তার উপস্থিতি আমার হাড়ে হাড়ে পৌঁছে দিল। তখনও জানি না আর কত কষ্ট বাকি আছে।

ক্রমে ভিড় কমে এল। ইয়া আমাদের গাড়ি ও ড্রাইভার ডাকতে গেল। সামনে যে চার-ছটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেগুলি যাত্রী নিয়ে চলে গেল।

ইয়া ফিরে এসে বলল, ড্রাইভারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, গাড়িও নেই। হয়তো কিছু খেতে গিয়েছে, অথবা...। এতক্ষণে শেষ দর্শকও চলে গেল, অপেরা হাউসের মস্ত বড় বড় দরজা খুব শব্দ করে বন্ধ হয়ে জায়গাটা নিথর নিঝুম। তারমধ্যে আমি শীতে কাঁপছি। আমাদের মাথার ওপর আলো জ্বলছে, কিন্তু সামনেটা নিরেট অন্ধকার। এবারে সে আলোও নিভে গেল, দুটি ছোট আলো ছাড়া। ইয়া বলল, আরেকবার ড্রাইভারকে খুঁজে আসি। কোথায় যেতে পারে?

চলে যেতেই আমার শীতের কাঁপুনি আরও বাড়ল। অচেনা দেশে, জনহীন প্রান্তরের অন্ধকারে, বিশাল অট্টালিকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি নানা দুর্বিপাকের কল্পনা করতে লাগলাম।

ইয়া আর আসে না। কতক্ষণ কেটে গিয়েছে কে জানে, ইয়া এসে বলল, ড্রাইভারকে পাওয়া গেল না।

তাহলে উপায়? ইয়া বলল, একটু যদি হাঁটতে পারেন ওই দূরের রাস্তার আলোর দিকে কিছু উপায় হবে। আমরা তৎক্ষণাৎ রাজি। হাঁটতে আরম্ভ করলাম অন্ধকারে। ক্রমে সামনে একটা বড় রাস্তা স্পষ্ট হল, সেখানে দুদিকের গাড়ি চলেছে। আমরা রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমি দুচোখ জ্বেলে ট্যাক্সি খুঁজছি, ইয়া হঠাৎ একটা গাড়ি থামাল হাত তুলে। ড্রাইভারের সঙ্গে কী কথা বলে বলল, আসুন, উঠে পড়ুন। কার গাড়ি, কোথায় যাচ্ছি, এসব ভাবনা ছিল না তখন। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের হোটেলের দরজায় পৌঁছে গেলাম। ইয়া আমাকে আর কথা বলার অবসর না দিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে শুনলাম, উলানবাটোরে ট্যাক্সি সংখ্যায় কম বলে সব গাড়িই খালি থাকলে ট্যাক্সির কাজ করে। ভাড়াও বাঁধা, প্রতি কিলোমিটার ২০০ তুগরুক, অর্থাৎ ছ-সাত টাকা। পরে আমরাও রাস্তায় এমন চলন্ত গাড়ি থামিয়ে ব্যবহার করেছি।

রীতিটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। কত সহজে কঠিন সমস্যার সমাধান হয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমাদের ড্রাইভারও এমনই কোনও সওয়ারি নিয়ে সে রাতে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ইয়াকে প্রশ্ন করে বিব্রত করতে ইচ্ছা হল না।

প্রত্যহ একটি দুটি খবরের কাগজের অফিস দেখে বেড়াচ্ছি। এদেশ এখনও সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে নিতান্ত নাবালক। বিক্রি সামান্য হয়, তার মধ্যে মোঙ্গোলিয়ান ভাষার সরকারি দৈনিকটির বিক্রি শুনলাম পঞ্চাশ হাজারের ওপর। বিপক্ষদলের একটি কাগজ আছে, সেটি সন্ধ্যায় সরকারি খবরের কাগজের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। বিলি হয় পরের দিন। নতুনত্বের মধ্যে মোঙ্গোলিয়ান পার্লামেন্টের একটি খবরের কাগজ আছে। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের আগে নাকি পুলিশের একটা দৈনিক কাগজ ছিল।

শহরে সংবাদপত্রের বিতরণ হয় পোস্ট অফিস মারফত। চিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নেও একদা এই ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক পালাবদল হবার পর, মোঙ্গোলিয়ার ডাকব্যবস্থা এখন বেসরকারি পরিচালনাধীন। খবরের কাগজ বিক্রির স্টলও দেখেছি উলানবাটোরে, সংখ্যায় বেশি নয়।

মোঙ্গোলিয়ার যে ছবি আমার মনে উৎকীর্ণ ছিল, তার সামান্যই দেখছি উলানবাটোরে। আধুনিক রীতির কিছু অ্যাপার্টমেন্ট হাউস দেখেছি, কিন্তু যে যাযাবর জাতি তাঁবুতে বাস করে, ঘোড়া যাদের প্রধান বাহন তাদের দেখছি না। ইয়া বলল, এখন শহরের মধ্যে তাঁবুতে বাস কমে গিয়েছে। বড় বাড়িতে ফ্ল্যাট পাবার পর অনেকেই তাঁবু ছেড়ে বাড়িতে উঠে এসেছে। আবার এমনও আছে, চার দেওয়ালের বন্দিত্ব অসহনীয় বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে কেউ কেউ তাঁবুতে ফিরে গেছেন। আর, অশ্বারোহী? তাদের দেখা

পরিচারিকার সাজ বড় সুন্দর ছিল, সাবেকি মোঙ্গোলীয় পোশাক। মেয়েটিও সুন্দরী। তারই পরামর্শে, অর্থাৎ অসম ভাষার দ্বৈরথে যতটুকু পরামর্শ করা সম্ভব, সিদ্ধান্ত হল আমরা হরহখ ভোজন করব। ভোজ্য আসতে বুঝতে পারলাম হরহখ মানে মেষমাংসের গ্রিল। ঝলসে নেওয়া মাটন বলা যায়। কিছু সবজি সহযোগে ভালো লেগেছিল।

যাবে শহরের বাইরে। তাও বেশি নয়।

শহরের এক প্রান্তে টেলিভিশন স্টুডিওতে যাবার পথে তাঁবু দেখলাম। অস্থায়ী বেড়া দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গায় কয়েকটি কাঠের ও টিনের বাড়ি, তারই মধ্যে দশ-পনেরোটি গোল সাদা তাঁবু। মাথাটা চূড়ার ধরনে, সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এই হল মোঙ্গোলীয়দের স্বাভাবিক বাসস্থান। ক্রমশ আরও কিছু তাঁবু দেখলাম শহরের নানা অঞ্চলে। বোঝাই যায় তাঁবুর সংখ্যা কমে আসছে। মানুষ ক্রমশ সভ্যতার আশ্রয় অ্যাপার্টমেন্টে উঠে আসছে।

এখনও প্রয়োজনের অনুরূপ বাসস্থান নির্মিত হয়নি। তাই অনেককেই একটি দুটি ঘর নিয়ে থাকতে হয়। বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে, তাই শহরের অনেক স্থানেই নির্মাণকার্য দেখা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব অঙ্গদেশে গিয়েছি, বড় বড় বাড়ি তৈরির কাজ দেখেছি। শাসকদল প্রাসাদোপম অট্টালিকা পছন্দ করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব দেশেই জাতীয় সৌধগুলি চমকপ্রদ। মোঙ্গোলিয়াতেও তার পর্যাপ্ত নিদর্শন। আরও একটা বিশেষ নজর ছিল সেকালীন শাসকদের, দেশে সাক্ষরতার বিস্তার করা।

আসতে যেতে আমাদের পথে বিশাল একটা বাঁধানো চত্বর পড়ে। সুখবাটার স্কোয়্যার। সুখবাটার মোঙ্গোলিয়ার জাতীয় হিরো। মোঙ্গোলিয়ার পরিবর্তন আনার ভগীরথ। রাজতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে মোঙ্গোলিয়াতে জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতা। সুখবাটারের উদ্যোগে ১৯২৪ সালে মোঙ্গোলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্ত হয়। স্কোয়্যারের মাঝখানে অশ্বারোহী সুখবাটারের মূর্তি। স্কোয়্যারের একদিকে পার্লামেন্ট ভবন, আরেকদিকে অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার। দুটিই বিশাল এবং বিশিষ্ট সৌধ। সকালে বিকেলে অনেক মানুষ এই স্কোয়্যারে বেড়াতে আসে। মস্কোর রেড স্কোয়্যার বা বেজিংয়ের তিয়েন আন মেন স্কোয়্যারের মতো বিরাট না হলেও সুখবাটার স্কোয়্যার গুরুত্বে কম নয়। এক রবিবার সকালে দেখলাম বিয়ের পর নবদম্পতি সুখবাটারের মূর্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে। সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষ, চঞ্চল শিশুর দল স্থানটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল।

স্কোয়্যারের নানা স্থানে দলে দলে শিশুরা খেলা করছে, মা-বাবারা অলস ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বয়স্করা বেঞ্চে বসে বিদায়ী সূর্যের উষ্ণতায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, প্রত্যহ বিকেলেই এই দৃশ্য দেখতাম। সূর্যাস্তের পর প্রবলতর শীতে কী হত এখানে আমাদের দেখবার সাহস হয়নি।

উলানবাটোর ছড়ানো শহর বলে কোথাও ভিড় নেই। গাড়ি চলাচল হয় সমান গতিতে, যানজটে আটকে পড়িনি। ইয়ার সঙ্গে সরকারি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়েছিলাম। উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখলাম না। সাধারণ জামাকাপড়, চামড়ার কম দামের জ্যাকেট, টপ বুট। হাতের কাজ প্রায় কিছুই নেই বললে চলে। দুটি মোঙ্গোলীয় পোশাকে সজ্জিত ছোট পুতুল কেনা হল। মনে হচ্ছে দাম অনুচিত বেশি ছিল। আমাদের হোটেলের কাছে এবং অন্যত্র দুয়েকটি ছোট বুটিক জাতীয় দোকান ছিল। সেখানে প্রধানত মোঙ্গোলীয় পুতুল, জলরঙে আঁকা মোঙ্গোলিয়ার ল্যান্ডস্কেপ, মেয়েদের স্টোল। সবই বড় বেশি দাম। মনে হল বিদেশিদের কাছ থেকে যৎপরোনাস্তি ডলার সংগ্রহের চেষ্টা সর্বত্র।

বড় দোকান যে নেই তা নয়। একটি বড় সুপার মার্কেটে গিয়েছিলাম। বিদেশি চিজ মাখন জ্যাম সস ড্রেসিং ফ্রুটজুস কী নেই সেখানে? ডেনমার্কের হ্যাম, জার্মানির সসেজ, ইটালির সালামি, যা চাই। নানাবিধ সবজিও ছিল। এবং ফল। তারও কিছু কিছু বিদেশ থেকে আমদানি করা। বিদেশি পানীয় জল, যা সত্যিই মিনারেল ওয়াটার, তারও উচ্চমূল্যের বোতল। মাছ-মাংসের কাউন্টারগুলিও দেখবার মতো। টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, ক্রিম, শ্যাম্পু, ময়শ্চারাইজার সব বিদেশ থেকে আমদানি করা। দাম যথেষ্ট বেশি, অন্তত টাকার হিসাবে। সম্ভ্রান্ত বিদেশিদের তৃপ্তি ও পরম আরামে রাখবার ব্যবস্থা।

বলা বাহুল্য, এ দোকান সাধারণ মোঙ্গোলীয়ের জন্য নয়। তাদের প্রধান আহার গম এবং মাংস। ছাগ বা মেষমাংসের দাম খুব কম, প্রতি কেজি ৮০০ তুগরুক। বিফের দাম বেশির দিকে, এখানে বিফের চল নেই তেমন। মুরগির দাম চড়া। দেশে হাঁস-মুরগি পালন উন্নত স্তরের নয়, তাই সরবরাহ কম।

আমাদের ভোজনের অসুবিধা হচ্ছিল না। রকমারি পদ নেই সত্যি, কিন্তু সাধারণ খাবার হিসাবে খারাপ নয়। প্রাতরাশ তো পূর্ব এশিয়া বাদ দিয়ে সর্বত্র এক হয়ে গিয়েছে। ডিম, পাউরুটি, চা-কফি। অথবা তার রকমফের। পূর্ব এশিয়াতে নানা রূপে ভাত থাকে প্রাতরাশ টেবিলে।

উলানবাটোরে আমাদের প্রধান দুটি ভোজনে, গ্রিলড ল্যাম বা চিকেন, ল্যাম স্টু, ল্যাম স্নিটশেল অথবা চিকেনের ওই পদগুলি। মিষ্টান্নে ক্যারামেল কাস্টার্ডের বাইরে যেতে পারিনি। হোটেলের ভোজনশালার খাদ্যতালিকা অতি সংক্ষিপ্ত বলে আমরা প্রায়ই বায়ানগোল রেস্টুরেন্টে যেতাম। হোটেলের দুই বাড়ির মাঝখানে বিশাল রেস্টুরেন্ট— শ-তিনেক আসন আছে। পঞ্চাশ-ষাটজনের বেশি অতিথি থাকত না। এক রাতে দেখি বেশ ভিড়, সামান্য কটি টেবিল খালি আছে। আমরা আসন নিয়ে আমাদের প্রয়োজন বললাম। সাধারণত ঠান্ডা পানীয় বা ফলের রস নেওয়া হত। কদাচিৎ ভদকা বা ওয়াইন। আট-দশ ডলারে দুজনের পূর্ণ ভোজন। প্রত্যাশা করিনি, হঠাৎ একজন আপাদমস্তক ভারতীয় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দক্ষিণী উচ্চারণে ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথা থেকে আসছি। আলাপ জমতে দেরি হল না। তাঁর এক সহকর্মীও ছিলেন। আমরা চারজন এক টেবিলে বসলাম। প্রথম ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতের। বিলেতের ইউনিলিভারের এজেন্টের কর্মচারী। সানলাইট সোপ থেকে ডাভ, ক্লোজআপ বিক্রি করেন। এখানে পরিবার নিয়ে আছেন, স্ত্রী এবং শিশুকন্যা। দুবছর হয়ে গিয়েছে। শীতকালে সত্যিই নির্বাসিত মনে হয়। অন্য সময় কষ্ট হয় না। বরফ পড়ে না উলানবাটোরে। কিন্তু ঠান্ডা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে নেমে যেতে পারে। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কুড়ি ডিগ্রির ওপরে ওঠে না। ভদ্রলোক আরও বললেন, শহরটা শান্ত, মানুষেরা নির্বিবাদী। এখানে রাতে পথ চলাচল নিরাপদ।

তাঁর সঙ্গী হংকং থেকে কদিনের জন্য এসেছেন। তাঁদের হংকং অফিস থেকে চার-ছ মাস অন্তর কেউ না কেউ আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য, মশলা ইত্যাদি, তাই খাওয়াদাওয়ার কোনও কষ্ট নেই। রাত্রি হয়েছিল, আমাদের এবার উঠতে হবে, পরশুদিন আমরা চলেও যাব, তাই আর দেখা হবে না। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, আপনারা আসাতে উলানবাটোরে ভারতীয়ের সংখ্যা বেড়ে একডজন হয়েছিল। তাঁর সহকর্মী ফিরে গেলে আবার নজন হয়ে যাবে, যার মধ্যে দূতাবাসের পাঁচজন।

নতুন দেশে ভোজনের নতুনত্ব হচ্ছে না বলে আমরা ইয়াকে আমাদের কোনও মোঙ্গোলীয় রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে বলি প্রায়ই। ইয়া হোটেলের সংযুক্ত রেস্টুরেন্টগুলি দেখিয়ে দেয়। মোঙ্গোলীয় খাবার কোথায় পাব তার হদিশ পাই না।

আমাদের হোটেলের সামনে যে চত্বর, সেখানে চার-ছটি কিয়স্কে দোকান, সেখানে একটি ছোট চালাতে খাবার বিক্রি হয় দেখেছি। দুপুরবেলা স্কুলের ছেলেমেয়েরা বোধহয় টিফিনের ছুটিতে সেখানে ভিড় করে। কাগজের বাক্সে নুডল জাতীয় কিছু কিনে খায়। সেই দোকানেও আমাদের প্রয়োজন বোঝাতে পারি না। স্কুলের একটি ছাত্র সামান্য ইংরিজি বোঝে, তাই দু বাক্স নুডল, মাংসখণ্ড সহযোগে নেওয়া গেল এবং দু বোতল বিয়ার পাশের দোকান থেকে। হোটেলের ঘরে বসে আপাত-মোঙ্গোলীয় সেই খাবার খারাপ লাগল না। কিন্তু কোনও নতুনত্ব নেই। অন্য এক খাবারের

উলানবাটোরে বুদ্ধমূর্তি

দোকানে দেখলাম, পাউরুটির মাঝখানে মাংসখণ্ড দিয়ে বার্গার জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছিল। আর দেখলাম আমাদের মাছের ফ্রাইয়ের আকারে অথবা বলতে পারি চ্যাপ্টা সিঙাড়ার আকারে কিছু বিক্রি হচ্ছে। এই পদটির নাম পরে দোভাষীর কাছে জেনেছি, খুরুস। খুরুস ময়দার খোলে কিমা ভরে ভাজা। ভালো লেগেছিল। এটি প্রকৃতই মোঙ্গোলীয় পদ।

ইংরিজি সাপ্তাহিক উলানবাটোর নিউজে একটা বিজ্ঞাপনে দেখি, মোঙ্গোলীয়দের সনাতন তাঁবুর ছবি, তলায় লেখা ঘের রেস্টুরেন্ট। আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম। ইয়া কোনওদিনই আমাদের সঙ্গে খায় না। হোটেলের রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করে আমরা দুজনে এক দুপুরে সেখানে রওনা হলাম। রিসেপশনই বলে দিল, ঘের রেস্টুরেন্ট হাঁটাপথ, হোটেলের পিছনদিকে।

দুপুরবেলা, আকাশে যেমন রৌদ্র, বাতাসে তেমনই ঠান্ডা। খুঁজে খুঁজে হয়রান, ঘের রেস্টুরেন্টে আর পৌঁছতে পারি না। কাকে জিজ্ঞাসা করব, এই অঞ্চলটায় বিশেষ মানুষজন নেই পথে, একদিকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি, সেখানে গিয়ে কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে কিনা ভাবছি, এমন সময় এক মধ্যবয়স্কা মহিলাকে আসতে দেখা গেল। ভাষায়, ইঙ্গিতে অনেক বোঝাতে হল। বারবার ঘের শব্দটা উচ্চারণ করতে লাগলাম এবং ভোজনের মুদ্রা দেখাতে তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন। কথা না বলে আমাদের হাত ধরে তাঁর যাবার পথের বিপরীত দিকে অনেকখানি নিয়ে গেলেন। আমরা বুঝতে পারছি না তিনি আদৌ আমাদের অভিলাষ বুঝেছেন কিনা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের পিছনে একটি সাদা ক্যানভাসের ঘের দেখা গেল। আমাদের তার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে মহিলা আবার ফিরে গেলেন। ঘেরের দরজায় সাবেকি পোশাকে এক তরুণী আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু সেদিন ওখানে ভোজন হল না। একটা বড় আমেরিকান দল সব আসন দখল করে লাঞ্চ খাচ্ছেন তখন।

দ্বিতীয়দিন আবার গিয়ে দেখি জনপ্রাণী নেই ভোজনকক্ষে অর্থাৎ ঘেরের মধ্যে। যথারীতি উষ্ণ অভ্যর্থনা হল। আমরা দুজন, একচ্ছত্র দম্পতি সমস্ত ঘের অধিকার করে বসলাম। পরিচারিকার সাজ বড় সুন্দর ছিল, সাবেকি মোঙ্গোলীয় পোশাক। মেয়েটিও সুন্দরী। তারই পরামর্শে, অর্থাৎ অসম ভাষার দ্বৈরথে যতটুকু পরামর্শ করা সম্ভব, সিদ্ধান্ত হল আমরা হরহখ ভোজন করব। ভোজ্য আসতে বুঝতে পারলাম হরহখ মানে মেষমাংসের গ্রিল। ঝলসে নেওয়া মাটন বলা যায়। কিছু সবজি সহযোগে ভালো লেগেছিল। ঘেরের ভেতরটা চমকপ্রদ। সেখানে বসে সবকিছুই বুঝি ভালো লাগবে। বৃত্তাকার তাঁবুটির ব্যাস হবে কুড়ি ফুট বা সামান্য বেশি। সমস্ত মেঝে পুরু কার্পেটে মোড়া, দেওয়ালেও কার্পেট টাঙানো আর মাঝে মাঝে কোনও লোমশ প্রাণীর চামড়া। মাথার ওপরেও রঙের বাহার। ঘেরের মাঝখানে একটি ঢাকা লোহার বাক্সের মধ্যে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার নল ধোঁয়া নিষ্কাশনের জন্য তাঁবুর চূড়া দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের বাসের ঘেরও এই ধরনের, সাজসজ্জা থাকে না অবশ্য। কিন্তু এমনই ফেল্টের তৈরি, শীত নিবারণের জন্য। মাঝের আগুন জ্বালাবার বাক্সটি ঘেরকে উত্তপ্ত রাখে, ওখানেই রান্নাবাড়া হয়। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ঘের শুধুই ভোজনকক্ষের কাজ করছে। রান্না হচ্ছে বাইরে অন্যত্র। টেবিল-চেয়ারের বদলে কাঠের শয্যা, আর বিশেষ কোনও আসবাব থাকে না।

জায়গাটা ভালো লেগেছিল, সেই দ্বিপ্রহরে শুধুমাত্র আমাদের দখলে বলে আরও। দুপাত্র ভদকা আদেশ করলাম। বললাম, ছোট। পরিচারিকা বাইরে থেকে ফিরে এসে বলল, ছোট ভদকা নেই। তখনই আমার খটকা লাগা উচিত ছিল। ছোট ভদকা নেই মানে কী? অল্প পরিমাণ ভদকা যদি না থাকে বড় ভদকা কী করে দেবে। এসব কথা আমার কিছু মনে হল না। বললাম, বেশ তো বড় ভদকা দাও। মেয়েটি চেঙ্গিস খান ভদকার বড় নতুন বোতল খুলে আমাদের দুপাত্র ভদকা পরিবেশন করল। পরিবেশ পছন্দের, ঘেরের উষ্ণতা সুখের, আমরা ধীরেসুস্থে ভদকা সেবন করে হরহখে মনোনিবেশ করলাম। মাংসখণ্ডগুলি সুপক্ব, সদ্যরন্ধনের সৌরভ— আয়োজন সামান্য হলেও সুন্দরী পরিচারিকার হাসিমুখ যুক্ত হয়ে দুপুর ভালোই কাটল। বিল চাইলাম।

বিল হাতে নিয়ে একটু আশ্চর্য হলাম। মূল ভোজ্যের দাম সাত ডলার, তার ওপরে সালাদ ইত্যাদির সামান্য দু-এক ডলার, আর ভদকার দাম কুড়ি ডলার। দুই বড় পেগ ভদকার দাম কুড়ি ডলার! একটু সময় লাগল বুঝতে। কেন বলেছিল ছোট ভদকা নেই তাও স্পষ্ট হয়ে গেল। এখানে বোধহয় মদ্য পরিবেশনের রীতি

নেই। অতিথি চেয়েছেন বলে তাঁর জন্য এক বোতল ভদকা দিতে হল। এবং ছোট বোতল ছিল না বলে বড়।

বিল চুকিয়ে বড় বোতলসুদ্ধ চেঙ্গিস খান ভদকা নিয়ে হোটেলে ফিরেছিলাম।

শ্রীমতী নারানের ব্যবস্থায় এক মোঙ্গোলীয় যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নাম ওডজারগাল। চল্লিশের নীচে বয়স। নানারকম ব্যবসা করেন। সফল মানুষ। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন। এখন দেশে বেসরকারিকরণের হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েছেন। অফিস দেখলেই তাঁর উন্নতি বোঝা যায়। আমেরিকান কায়দায় সাজানো অফিস। সব কাজে কম্পিউটার। এখন একটা বিজ্ঞাপন এজেন্সি খোলার ইচ্ছা। তাই নারানের উদ্যোগে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিপ্রহরে একটি সুন্দর রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। ইউরোপের যে-কোনও অভিজাত ভোজনশালার সমকক্ষ। আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে মোঙ্গোলিয়ান খাদ্য চেয়েছিলাম। বললাম, বেজিংয়ে একটা পদ খেয়েছিলাম, মোঙ্গোলিয়ান হটপট। অত্যন্ত পাতলা করে কাটা ছাগ মাংসখণ্ড ক্ষণিক ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে নানাবিধ সস সহযোগে গ্রহণ করা হয়। ওডজারগাল এমন কোনও পদের নাম শুনেছেন বলে মনে হল না। বললেন, মোঙ্গোলিয়ান পট আমাদের বিশিষ্ট স্যুপ। সেটা পরখ করে দেখতে পারেন। তিনিই আমাদের জন্য খাবার নির্বাচন করে দিলেন, লুলিয়া কাবাব। এখানেও মশলা প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু ছাগমাংস কোনও প্রক্রিয়ায় অতি কোমল এবং পরম সুস্বাদ। মনে হয়েছিল সামান্য রসুনের স্পর্শ আছে।

এসেছিলেন মার্সিডিজ গাড়ি চালিয়ে। আমাদের ফেরত নিয়ে এলেন তাঁর সহকারী আরেকটি মার্সিডিজে। অফিসের সামনে আরও একটি মার্সিডিজ দাঁড়িয়েছিল দেখেছি। ওডজারগালের সাফল্য ও সম্পদ বুঝতে দেরি হল না।

অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে ওই মার্সিডিজ গাড়িগুলি এদেশে এসেছে। অত্যন্ত উচ্চমূল্যের গাড়ি। সাধারণের অগম্য। জার্মানির কোনও বন্দর থেকে জাহাজে করে গাড়িগুলি এসেছে চিনের বন্দর সাংহাইতে, তারপর সেখান থেকে দীর্ঘ দুর্গম স্থলপথে উলানবাটোর। মোঙ্গোলিয়া স্থলভূমিতে ঘেরা।

ওডজারগালের অতিপূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান কী করে এই দুস্তর দূরত্ব পার হয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজকের সহজ ভ্রমণের যুগেও কল্পনা করা কঠিন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চেঙ্গিস যাযাবর এক মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। মোঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীকে একত্রিত করে তাদের অভিষিক্ত দলপতি চেঙ্গিস খান রাজ্য আহরণে বেরিয়েছিলেন। তখনও কামান গোলাবারুদের আবিষ্কার হয়নি। সত্যিকার মরু গিরি নদী কান্তার পার হয়ে, প্রতিকূল নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে চেঙ্গিস এবং তাঁর পরে তাঁর পৌত্র কুবলাই খান যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইয়েলো রিভার থেকে ইউরোপের কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সাম্রাজ্যের মতো বড় সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। অশ্ব ছাড়া বাহন ছিল না। অথচ কত দুস্তর দূরত্ব অবহেলায় পার হয়েছিলেন তাঁরা। চেঙ্গিস ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন। কঠোরপ্রকৃতির মানুষ এই খানেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, বলা যেতে পারে পৈশাচিক। যেখানে গিয়েছেন দৈব অভিশাপ মনে করেছে পরাভূত মানুষ। লুণ্ঠন ও হত্যালীলার এমন উদাহরণও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

কুবলাই বুঝে গিয়েছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে দেশ জয় করা যায়, কিন্তু রাজ্য শাসন করা যায় না। তিনি তাঁর নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন সেই স্থানে যেখানে আজকের বেজিং। সমগ্র চিন তখন তাঁর পদানত। কুবলাই খান চিনে নতুন রাজবংশের পত্তন করলেন, ইউয়ান রাজবংশ। কুবলাই খানের মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষদের স্থান হয়েছিল। বিশ্রুত ইটালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো কিছুকাল কুবলাইয়ের সভাসদ ছিলেন।

কুবলাই খান চিনা বিদ্বানদের সহযোগিতায় প্রথম মোঙ্গোলীয় লিপির প্রবর্তন করেছিলেন। সাতশো বছর পরে রাশিয়ান প্রভুরা মোঙ্গোলীয় লিপির পরিবর্তে রাশিয়ান সেরেলিক লিপি প্রবর্তন করেন মোঙ্গোলীয় ভাষা লেখবার জন্য। প্রকৃতিতে যতই নিষ্ঠুর হন, কুবলাইয়ের চরিত্রে মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত বিচক্ষণতা ছিল।

কুবলাইয়ের ইউয়ান রাজবংশ চিনের ওপর বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেনি। একশো বছর পরে ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়ে চিন মোঙ্গোলিয়া অধিকার করল। চিনের সে রাজত্ব চলল ২০০ বছর। ১৯১১ সালে মোঙ্গোলিয়া স্বাধীন হল। কিন্তু সেও স্বল্পকালের জন্য। শেষ খানকে সিংহাসনচ্যুত করে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম গণতন্ত্র হল মোঙ্গোলিয়া। তারপরের ইতিহাস আমাদের জানা।

মোঙ্গোলিয়ার শেষ খান বোগড খানের শীতকালীন প্রাসাদ ও মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। শহরের উপকণ্ঠে এই মিউজিয়াম অন্যতম দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে। প্রাসাদের সবই এই শতাব্দীর প্রথমভাগের। মিউজিয়ামেরও প্রায় তাই। বিশেষ প্রাচীন কিছু

জুমোড থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে পাঁচ-ছ কিলোমিটার গেলে মন্‌জশির মনাস্ট্রি এবং মিউজিয়াম। মন্‌জশিরের অবস্থান বড় সুন্দর। তিনদিকে পাইন ফার বার্চ গাছের জঙ্গল। তাদের পিছনে গাছের মাথা ছাড়িয়ে নগ্ন গ্র্যানাইটের পাহাড়। আদি মনাস্ট্রি তৈরি হয়েছিল ১৭৩৩ সালে। কালে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান বাড়িটি মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে। আদি মনাস্ট্রির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত দেখা যায়। মনাস্ট্রির সমসাময়িক ব্রোঞ্জের একটি বড় হাঁড়ি এখনও অক্ষত আছে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলল, এখানে এক হাজার মানুষের জন্য রান্না করা যায়।

প্রায় দেখাই যায় না মোঙ্গোলিয়াতে। এক ডাইনোসর ছাড়া। ছ কোটি বছর পূর্বের এই অতিকায় প্রাণীগুলির একদা উপস্থিতি নিয়ে মোঙ্গোলিয়ার গর্বের অন্ত নেই।

কোথাও পড়েছি পৃথিবীর নানা স্থানে যত ডাইনোসরের অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে মোঙ্গোলিয়া দ্বিতীয়। শুনলাম মোঙ্গোলিয়ার দক্ষিণাংশে গোবি মরুভূমিতে তল্লাশ করলে এখনও কিছু অস্থি এবং ডিম পাওয়া আশ্চর্য নয়। জাতীয় সংগ্রহশালায়, প্রাপ্ত অস্থি দিয়ে ডাইনোসরের পুনর্গঠিত পূর্ণ কঙ্কাল দেখলে শিউরে উঠতে হয়। অনেকগুলি নানা মাপের প্রস্তরীভূত ডিমও আছে। এই মিউজিয়ামটিতে ডাইনোসরের কঙ্কাল ছাড়াও দেখবার মতো অনেক জিনিস ছিল।

ফাইন আর্ট মিউজিয়াম আমাদের দেখা হল না। মোঙ্গোলিয়ানদের জন্য সামান্য প্রবেশমূল্য, আর বহিরাগতদের জন্য পাঁচ ডলার বা তার বেশি।

প্রত্যহ সকালে নটার মধ্যে বেরোতে হয়। ইয়া তার ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছে যায়। তাকে কিছুতে বোঝানো যাচ্ছে না যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবার জন্য অত আগে বেরোবার দরকার নেই।

মাঝে একদিন কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না। দশটা নাগাদ বেরোবার কথা, গ্রামাঞ্চল দেখতে যাব। গ্রাম মানে তো দশ-পনেরোটা তাঁবুর জটলা। সেদিনও ইয়া সকাল আটটাতেই হাজির। ছুটির সকালে মন্থরে তৈরি হব, তার উপায় নেই। বেরিয়ে পড়তে হল। আমাদের গন্তব্য শহরের পুবদিকে টেরিল্‌জ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ষাট কিলোমিটার দূরে। শহর ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা। মাঝে মাঝে পাহাড়, আর না হলে অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত তৃণহীন গৈরিক সমতল। কোনও পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ সবুজ পাইন গাছের ঘন অরণ্য। পাশের পাহাড়টা হয়তো সম্পূর্ণ রিক্ত। কদাচ দুয়েকটি ঘের অর্থাৎ বাসের তাঁবু দেখা যাচ্ছে। অব্যর্থ সাদা রঙের। কখনও এক দুজন মোঙ্গোলীয় স্ত্রী-পুরুষ, সারা পথে দশটির বেশি অশ্বারোহী দেখিনি। ওই শুষ্ক প্রান্তরে দূর থেকে সাদা তুলোর মতো ভেড়ার পাল। শুষ্ক পৃথিবী থেকে তারা কী পুষ্টি সংগ্রহ করছে কে জানে। দু-চারটে ছোট পাহাড়ও পার হলাম, পথ উঁচু-নিচু, সর্বত্র সমতল নয়। চেকপোস্টে এক সৈন্য গেট খুলে আমাদের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিল। এবারে কিছু বড় গাছ, পাইন, ফারও আছে। তৃণহীন পাথুরে পাহাড়গুলোর চেহারা বিচিত্র, যেন কোনও উন্মাদ ভাস্করের রচনা। আলাদা আলাদা বিশাল গ্র্যানাইটের খণ্ড ওপরে-নীচে, পাশাপাশি সাজানো। এতক্ষণে দুটি বাস দেখলাম। পর্যটক দল নিয়ে এসেছে। বড় রাস্তা থেকে বাঁদিকে একটু নেমে বড় শুষ্ক মাঠের ওপর যেন এক অতিকায় কচ্ছপ, গ্র্যানাইটের। কারও তৈরি করা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে ঝড়-বৃষ্টি-বরফে পাহাড়টা এই বিচিত্র রূপ পেয়েছে। আমরা এগিয়ে চললাম। এখানে উন্মুক্ত প্রান্তর নেই, আমরা পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকা দিয়ে চলেছি, কোথাও সংকীর্ণ কোথাও প্রসারিত।

টেরিল্‌জ রিসর্টে মস্ত খোলা জায়গায় একটি ত্রিতল বাড়ি। হোটেল। যাঁরা বাড়িতে থাকতে চান না তাঁদের জন্য কম্পাউন্ডের মধ্যে পাশাপাশি ছটি ঘের। একটি ঘেরের ভেতরে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখা ঘের রেস্টুরেন্টের মতো, সাজসজ্জা কিছু কম। চেয়ার-টেবিলের বদলে দুদিকে দুটি শোবার খাট। আরেকদিকে একটি লেখবার টেবিল। তাঁবু গরম রাখবার সেই সনাতন ব্যবস্থা। লোহার বাক্সে আগুন জ্বালানো রয়েছে। ধোঁয়া বেরোবার নল তাঁবুর চূড়া ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। ঘেরের পিছনে পাকা বাড়িতে শৌচাগার।

জায়গাটা মনোরম। পাশে গভীর খাদ। তিনদিকে গাছে ঢাকা পাহাড়। মোঙ্গোলিয়ার এই এক বৈচিত্র্য। তৃণশূন্য প্রান্তরের পাশে পাহাড়ের মাথায় আচমকা সবুজের সমারোহ। উলানবাটোরের কর্মচঞ্চলতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে পর্যটক এখানে আসেন কদিনের জন্য। ত্রিসীমানায় আর কোনও জনবসতির চিহ্ন নেই।

উলানবাটোর শহরের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কোনও নিদর্শন নেই। শহরের বাইরের দিকে গন্ডন টেকচিলেন বৌদ্ধবিহার বিশেষ প্রাচীন নয়। শহরে সব পুরনো মন্দির, বিহার এই শতাব্দীর প্রথমভাগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গন্ডন টেকচিলেন বিহার, তার পাশে আরও একটি এবং লামাদের শিক্ষালয়, এইসব নতুন হলেও স্থানটি সুন্দর। ১৯২১ সালের বিপ্লবের পর এই সৌধগুলি অবহেলায় ও অনাদরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার সংস্কার করে সৌধগুলি এবং সমগ্র চত্বর খুব দেখাশোনা করা হয়। দর্শনার্থীও অনেক আসে। হাওয়া যদি তাড়া না করে বিহারচত্বরে একটা সকাল বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখানে সাবেকি পোশাকে কিছু লামা ও ভক্তদের দেখেছি।

উলানবাটোর ছাড়বার আগের দিন বেশি কোথাও যাবার ছিল না। আমরা ইয়াকে ছুটি দিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার গিয়েছিলাম। শহর থেকে বেরিয়েই একটা ছোট কারখানা, তারপর ইতস্তত ছড়ানো পাহাড় এবং জনহীন প্রান্তর। দশ-পনেরো মাইল যাবার পর ছোট শহর, জুমোড পড়ল। দশ-বিশটা দোকান, একটা বড় অফিসবাড়ি, কিছু বাসের তাঁবু, টিনের, কাঠের বাসস্থান এবং কয়েকটি মাথা উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। শহর ছেড়ে আবার একই নিসর্গ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালেও মাথায় পাইন পপলার গাছের ছোট জঙ্গল। দুয়েকজন অশ্বারোহী, নিঃসঙ্গ ঘের মাঝে মাঝে, আর শুষ্ক চারণভূমিতে আহাররত মেষের দল। আমরা চলেছি মন্‌জশির বিহার, প্রাচীন বুদ্ধমন্দিরে। আমাদের পথ খেন্তি গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে। একপাশে বোগড খান উল, পবিত্র বোগড খান শিখর। বোগড খান শুধু রাজা নন, তিনি ধর্মীয় প্রধানও ছিলেন। এদেশের বৌদ্ধেরা লামাবাদী।

জুমোড থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে পাঁচ-ছ কিলোমিটার গেলে মন্‌জশির মনাস্ট্রি এবং মিউজিয়াম। মন্‌জশিরের অবস্থান বড় সুন্দর। তিনদিকে পাইন ফার বার্চ গাছের জঙ্গল। তাদের পিছনে গাছের মাথা ছাড়িয়ে নগ্ন গ্র্যানাইটের পাহাড়। আদি মনাস্ট্রি তৈরি হয়েছিল ১৭৩৩ সালে। কালে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান বাড়িটি মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে। আদি মনাস্ট্রির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত দেখা যায়। মনাস্ট্রির সমসাময়িক ব্রোঞ্জের একটি বড় হাঁড়ি এখনও অক্ষত আছে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলল, এখানে এক হাজার মানুষের জন্য রান্না করা যায়।

উলানবাটোরে পৌঁছে মনে হয়েছিল এখানে আটদিন কী করে কাটাব। আশ্চর্য, সাতদিন রীতিমতো ব্যস্ততার সঙ্গে কেটে গিয়েছে। কাল আমাদের ফেরার দিন। বুঝতে পারছি মোঙ্গোলিয়ার সামান্যই দেখা হল। সময় থাকলে এবং আরেকটু তৎপর হলে একদিন গোবি মরুভূমির প্রান্ত থেকে ঘুরে আসা যেত। এই দেশের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে গোবি মরুভূমি। সব দিন প্লেন যায় না উলানবাটোর থেকে। গাড়ি করে গেলে সারাদিন লেগে যেত। গোবির এক তৃতীয়াংশ বালির পাহাড় আর মরুভূমি। বাকি অংশে মাঝে মাঝে তৃণভূমি আর মরূদ্যান। উঁচু-নিচু পাহাড়ও আছে গোবির অনেকখানি জুড়ে।

সোল থেকে উত্তরে গোবি পার হয়ে উলানবাটোর পৌঁছেছিলাম। ফেরার পথ ভিন্ন। আমরা বেজিং হয়ে সোল যাব। মোঙ্গোলিয়ার যে অংশ ইনার মোঙ্গোলিয়া, তার ওপর দিয়ে বেজিং যেতে হবে।

ইরকুটসক না যাবার দুঃখ থেকে গেল। মোঙ্গোলিয়ার উত্তর সীমান্ত জুড়ে বৈকাল হ্রদ। ইরকুটসক থেকে বৈকাল যেতে হয়। রাশিয়ান ভিসা করানো হয়নি, তাই ইরকুটসক যাওয়া সম্ভব ছিল না।

'ভ্রমণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত
ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী 'কালের কষ্টিপাথর'-এ পুনর্মুদ্রণের সময় সংযোজিত

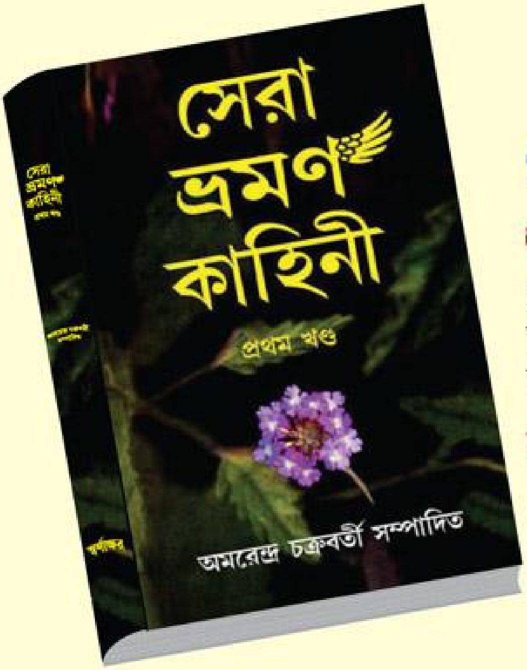

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার**
গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in
অনলাইনেও পাবেন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ভ্রমণ the most read travel magazine in India*
now brings you

BHRAMAN Traveller

A monthly travel magazine in English

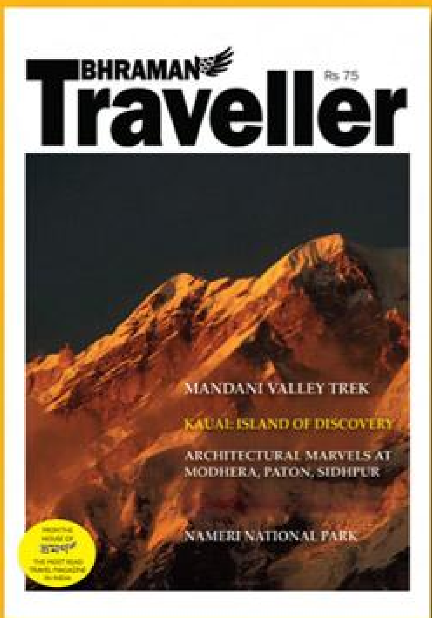

Email: bhramantraveller@gmail.com

To buy the first issue, please send ₹75 by cheque/money order in favour of

Swarnakshar Prakasani Private Limited

and mail to:
Swarnakshar Prakasani Pvt Ltd
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane,
Kolkata 700 019

Please provide your name, complete postal address and mobile/landline number

To subscribe online:
www.swarnakshar.in

Get your copy delivered at your doorstep. No courier charges

You may also visit
www.bhraman.com
www.ebhraman.com

***INDIAN READERSHIP SURVEY Q4, 2011: AVERAGE READERSHIP OF 3,16,000 PER ISSUE**

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 1 No. 1 □ 2 July 2012 □ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC □ Declaration No. 111 dt. 06/06/12

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

Buy Online
www.swarnakshar.in
Buy Online

*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2011 Q4

Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com